প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণের লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

একাদশ পুনর্মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ শিক্ষা **স্নাতকোত্তর স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায়

PG Education : 01 : 1 & 2

	রচনা	**সম্পাদনা**
পর্যায়—1	অধ্যাপক প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়	অধ্যাপক নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য
পর্যায়—2	অধ্যাপক সুব্রত সাহা	অধ্যাপক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Education : 01

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় 1

একক	1	দর্শন ও শিক্ষা-শিক্ষার লক্ষ্য	7–26
একক	2	পাশ্চাত্য দর্শনের শাখাসমূহ	27–55
একক	3	প্রাচ্য দর্শনের শাখাসমূহ	56–77
একক	4	মহান শিক্ষাবিদগণের শিক্ষাদর্শন	78–128
একক	5	শিক্ষা সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয়	129–142

পর্যায় 2

একক	6	বৈদিক যুগ এবং বেদ পরবর্তী যুগ বা ব্রাহ্মণ্য যুগ	143–155
একক	7	বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ও মধ্য যুগের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা	156–165
একক	8	ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রচেষ্টা	166–185
একক	9	স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রচেষ্টা	186–209
একক	10	ভারতীয় শিক্ষার কয়েকটি দিক	210–226

একক ১ ❑ দর্শন ও শিক্ষা-শিক্ষার লক্ষ্য (Philosophy and Education-Aims of Education)

গঠন

১.১ দর্শন কি?

১.২ দর্শনের প্রকৃতি ও কাজ

১.৩ শিক্ষা কি?

১.৪ দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক

১.৫ শিক্ষার লক্ষ্য

১.৫.১ শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা

১.৫.২ শিক্ষার চরম ও আপাত লক্ষ্য

১.৫.৩ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বিভিন্নতা

১.৫.৪ শিক্ষার লক্ষ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

১.৫.৫ শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞানার্জন

১.৫.৬ শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য

১.৫.৭ শিক্ষার কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য

১.৫.৮ শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য - চরিত্র গঠন

১.৫.৯ শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য

১.৫.১০ শিক্ষার লক্ষ্য পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান

১.৫.১১ শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির বিকাশ

১.৫.১২ শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য

১.৫.১৩ ব্যক্তিক লক্ষ্য বনাম সামাজিক লক্ষ্য সমন্বয়

১.৫.১৪ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ জীবনযাপন

১.৬ অনুশীলনী

১.১ দর্শন কী? (What is philosophy?)

মানুষ জীবকুলে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে বিবেচিত। কারণ তার মন আছে, চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। এই মননশীলতা তাকে উজ্জীবিত করে। তার মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয় - জীবন কী? জীবন লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? লক্ষ্যে পৌছানোর উপায় কী? চিন্তা প্রক্রিয়া চলতে থাকে জিজ্ঞাসার উত্তর নির্ধারণে। মানুষ ধারণা আর চিন্তার জগতে বাস করে, জীবনে পথ সম্পর্কে বিশ্বাস গড়ে তোলে এবং সে অনুযায়ী জীবনাদর্শকে তুলে ধরে। দর্শন জীবনের লক্ষ্যপথ নির্ধারণ করে। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস মনে করেন, দার্শনিকগণ সত্যের পূজারি। দর্শনের ইংরেজি অর্থ philosophy যা উদ্ভূত হয়েছে 'philo' (Love) এবং 'Sophia' (Wisdom, truth) এই দুটি গ্রিক শব্দ থেকে। অর্থাৎ 'Philosophy' র মানে দাঁড়ায় 'love of wisdom' বা 'Search for truth'। সুতরাং দর্শন বলতে আমরা বুঝি প্রজ্ঞা (বিশেষ ধারণা, Wisdom) নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান বা সত্যানুসন্ধান। মানুষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানে, মননের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এবং যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ ধারণা গড়ে তোলে। এই প্রজ্ঞার সৃষ্টি যাকে 'প্রমা' বলা যায় তা দর্শনের অবদান।

ভারতীয় মতে 'দর্শন' শব্দটি 'দৃশ' ধাতু উদ্ভুত যার অর্থ হচ্ছে 'দেখা' (to see)। দার্শনিক মত অনুযায়ী এই দেখা কোনো বিষয়কে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করা নয়। তাকে অন্তদৃষ্টি ও মনন সহযোগে উপলব্ধি করা (Intution)। ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্ত মত অনুযায়ী দর্শন হচ্ছে 'আত্মা'কে উপলব্ধি করা এবং চরম ঐশ্বরিক সত্যে পৌছানো। তবেই আসবে মুক্তি (Iiberation)। এই মুক্তি হচ্ছে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি। এই দর্শন শাস্ত্রকে ভারতীয়রা বলেন মোক্ষ শাস্ত্র (moksa-sastra)।

দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত (Different vievs of different persons of philosophy)

জার্মান দার্শনিক সোপেন হাওয়ার (Schopen hauer) বলেছেন—"প্রতি মানুষই জন্মগতভাবে দার্শনিক" ("Every man is a born philosophr")।

অ্যালডুয়াস হাক্সলে (Aldous Huxley) র মত অনুযায়ী—'মানুষ নিজস্ব জীবন দর্শন এবং নিজের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী বাঁচতে চায়। একথা একেবারে চিন্তাশূণ্য ব্যক্তি বিষয় ও সত্য। তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) র জগৎ ছাড়া বাঁচা যায় না" ("Men live in accordancc with their Philosophy of life, their conception of the world. their conception of the world. This is ture even of the most thoughtless. It is impossible to live wothout a metaphysic")।

রেমন্ট (Raymont) মনে করেন—"দর্শন ছাড়া নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর পেছনে যে সাধারণ সত্য আছে তার মর্ম অনুধাবনার করার নিরন্তন প্রচেষ্টা" (Philosophy is unceasing effort to discern the general truth that lies behind the particular facts, to discern also the reality that lies behind the appearances")।

ড. **রাধাকৃষ্ণন** (Radhakrishnan) বলেন— "বাস্তবতার জগত সম্পর্কে যুক্তি সম্মত জিজ্ঞাসাই হল দর্শন" ("Philosophy is a logical enquiry into the nature of reality").

থমপসন (Thompson) মনে করেন—"দর্শন হচ্ছে অতি সরলীকরণ না করে এবং সীমা বেঁধে না দিয়ে একটি প্রশ্নকে মীমাংসার জন্য সর্বতোভাবে দেখা, একেবারে শেষ দেখা এবং উদ্দেশ্যগুলি যাচাই করা। দর্শন কেবল মীমাংসার উপায় এবং নিয়মপালনগুলি চিহ্নিত করা নয়"("Philosophy means looking at the whole of a question, without restrictions of simplifications, looking at ends and purposes not merely at methods and means")।

কোনারের (D. J. O'Connor) মতে — "দর্শন সাধারণ অর্থে জ্ঞানভাণ্ডারকে বোঝায় না, পরন্তু দর্শন বলতে আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে প্রশ্নের স্পষ্টতা প্রাপ্তির কাজকে বোঝায়" (Philosophy is not in the ordinary sense of the phrase a body of knowledge but rether an activity of criticism and clarification")।

ড. এইচ স্টিফেন (Dr. H. Stephen) মনে করেন — "দর্শন হচ্ছে পার্থিব জগতের স্পষ্ট এবং সংহত ধারণায় পৌঁছানোর জন্য যুক্তিবাদী মানুষের এক যুক্তিসংগত প্রচেষ্টা - বিশ্বজগতের এক উপাদান স্বরূপ সার্বিক জগতের সঙ্গে নিজের সৃষ্টি, কাজ, ভাগ্য ও লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক নির্ধারণের প্রচেষ্টা" ("Philosophy is the sustained effort of man as a retional being to attain a clear and consistent conception of the world system, i.e. the Universe as a whole and of men's relation to it, his origin, function, desting and end as a factor of the world - system")।

কেয়ার্ড (Caird) বলেন — "মানুষের অভিজ্ঞতা এবং সার্বিক বিশ্বজগতের কোনো কিছুই দর্শনের আওতার বাইরে থাকতে পারে না"("There is no province of human experience, there is nothing in the whole realm of reality which lies beyond the domain of philosophy")। দর্শন শুধুমাত্র জ্ঞান নয়। দর্শন মনন, যুক্তি, উপলব্ধি সহযোগে বিশেষ জ্ঞানের বিচ্ছুরণ (যাকে আমরা প্রজ্ঞা বা ক্ষমা (Wisdom) বলতে পারি) পৌঁছাতে সাহায্য করে। প্রজ্ঞা মানুষের জীবনবোধ তথা আচরণকে প্রভাবিত করে। দর্শন মানুষের কাছে সর্ব্বোচ্চ হাতিয়ার যার সাহায্যে সে নিজেকে তৈরি ক'রে জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকে এবং নিজের সংস্কৃতি তৈরি করে নেয়।

১.২ দর্শনের প্রকৃতি ও কাজ (Nature and functions of philosophy)

মানুষের বাস শূন্যে নয়। মানুষের বাস একটি স্থানে, একটি গোষ্ঠিতে, সমাজে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নির্দিষ্ট লক্ষপথে সত্যের পথে তাকে এগিয়ে যেতে হয়। এ ব্যাপারে দর্শন তাকে সাহায্য করে। অতীত থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জীবন জিজ্ঞাসার পথে দর্শন বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ হয়ে যায় (১) **পরমার্থিক সত্তা**

সম্পর্কিত বিদ্যা (Ontology), (২) **জ্ঞান তত্ত্ব** (Epistemology), (৩) **পরম কারণ বাদ** (Teleology)।

সত্তাবিদ্যা পরমার্থিক অন্তিম সত্তার প্রকৃতি ও তার ভাবগত অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগায়। মানবজীবনের বিভিন্ন ধারা যেমন—মানসিক, অবয়বগত এবং আধ্যাত্মিক জীবন জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরে। এটা হচ্ছে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অধি বিদ্যা (সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র - Metephysics) মূলক জিজ্ঞাসা।

জ্ঞানতত্ত্ব হচ্ছে জ্ঞানের গঠন, পদ্ধতি এবং যথার্থতা নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক দর্শন।

আর **পরম কারণবাদ** হচ্ছে অধি বিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের কাজে লাগিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের পথে সমস্যাগুলি নিরূপণ করা।

এছাড়া দর্শন বিচার করণের নিয়ম ও কৌশলগুলি বিবৃত করে যাকে বর্লে যুক্তিবিদ্যা (logic) ; ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বিচারের নীতিসমূহ নির্দেশ করে যাকে বলে নীতি শাস্ত্র (Ethies) ; সুন্দর-অসুন্দরের ব্যাখ্যায় নীতি নির্ধারণ করে - যাকে বলে নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics)।

দর্শনের কাজকে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন এর কাজ অনুমাননির্ভর (Speculative)। এখন দর্শন অনুমাননির্ভর। যুক্তি সাপেক্ষে প্রামাণ নির্ভর নয়। এই দর্শন বেশিটাই ব্যক্তিসাপেক্ষ (Subjective), নৈর্ব্যক্তিক (Objective) নয়। আধুনিক দার্শনিকগণ মনে করেন, দর্শন বিশ্লেষণাত্মক (Analytical)। এই মতে বিশ্বাসী কোনার (D. J. O'Connor) এবং এলভিন (Elvin) মনে করেন যে দর্শনের কাজ মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে ধরাছোঁয়া যায় না এমন কিছুর জ্ঞান সরবরাহ করা নয়, এর কাজ সমালোচনা করা ও স্পষ্টতা প্রদান করা।

১.৩ শিক্ষা কী? (What is Education ?)

আমরা শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological meaning) এবং বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত আছি।

Education শব্দটির উৎস কয়েকটি Latin শব্দ। কেউ বলেন শব্দটি লাতিন মূল শব্দ "educere" থেকে উদ্ভূত যার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে 'to lead out'। এই অর্থে শিক্ষা মানে হচ্ছে শিশু বা শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে যে সব মানসিক শক্তি জন্মসূত্রে বিদ্যমান সেগুলিকে বাইরে আনা। অন্য এক মত অনুযায়ী 'education' শব্দটি মূল লাতিন শব্দ 'educare' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'to bring up'—অর্থাৎ লালন পালন করা। এই অর্থে শিক্ষা হচ্ছে কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ সামনে রেখে শিশুকে সঠিকভাবে লালন পালন করার প্রক্রিয়া।

তৃতীয় মত অনুযায়ী 'education' ইংরেজি শব্দটি 'educatum' এই লাতিন শব্দ উদ্ভূত যার অর্থ 'the act of training'। এই মত অনুযায়ী শিক্ষার অর্থ হচ্ছে শিশুদের ভবিষ্যত জীবন উপযোগী কিছু কৌশল আয়ত্ত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

বিভিন্ন ধারণা অনুযায়ী আমরা জেনেছি—শিক্ষা জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া। কারও মতে শিক্ষা হচ্ছে বৃদ্ধি ও

বিকাশমূলক প্রক্রিয়া। কেউ বলেন শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া ; শিক্ষা জীবন যাপনের প্রস্তুতি। আরও এগিয়ে কারও মতে শিক্ষাই জীবন।

১.৪ দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক (Relation between Philosophy and Education)

চিরাচরিত গতানুগতিক ধারণা অনুযায়ী দর্শনকে মনে করা হত এক অতিন্দ্রিয় রহস্যমূলক জগতের চাবিকাঠি। এই জগতের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার যোগ নেই, এই জগৎ তার ধরাছোঁয়ার বইরে।

অন্যদিকে মানুষ মনে করে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের জীবন ও সংগতি বিধানের সমস্যা সংক্রান্ত এক ব্যবহারিক বিদ্যা। এইভাবে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছু বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে দর্শন ও শিক্ষা শুধু পরস্পর সম্পর্কিত নয়, অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দর্শন জীবনের লক্ষ্য নির্দেশ করে। আর শিক্ষা এমন এক ব্যবহারিক বিদ্যা যা বলে দেয় সেই লক্ষ্য পথে কীভাবে পৌছানো যাবে। আমরা জানি দর্শনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসা' (Love of wisdom) বা 'সত্যের জন্য অনুসন্ধান' (Search for truth) দর্শন তাই প্রজ্ঞা অর্জনের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। মানুষকে জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে ব্যবহারিকভাবে সাহায্য করে শিক্ষা। এ-কারণেই বলা হয় দর্শন যদি হয় তত্ত্বকথা তবে শিক্ষা হবে বাস্তবতা শিক্ষা হচ্ছে দর্শনের গতিশীল দিক। বাস্তবে তাই আমরা দেখি দার্শনিক সত্যতা শিক্ষার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে তখনই যখন বাস্তব জীবনে তা শিক্ষার মাধ্যমে চর্চিত হয়। এ কারণেই আমরা দেখি যাঁরা মহান দার্শনিক তাঁরা একাধারে মহান শিক্ষাবিদ হিসাবেও খ্যাত। এ জন্যই প্রাচীন গ্রিস্ দেশের দার্শনিক সক্রেটিস (Socrates), তাঁর ভাব শিষ্য প্লেটো (Plato), ইংরেজ দার্শনিক জন লক, মোরাভিয়ার দার্শনিক কমেনিয়াস্ (Comenius), ফরাসি দার্শনিক রুশো (Rousseau), তার অনুগামী পেস্তালৎসী (Pestalozzi), জার্মান দার্শনিক ফ্রয়েরেল (Froebel), ইতালির চিন্তাবিদ মন্টেসরি (Montessori), আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউই (Dewey), থেকে শুরু করে ভারতীয় দার্শনিক বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী সবাই মহান শিক্ষাবিদ হিসাবেও খ্যাত।

জার্মান দার্শনিক **ফিকটে (Ficute)** র মতে— 'শিক্ষা নাম শিল্পকলা দর্শন ছাড়া কখনই স্পষ্টতা পায় না' ('The art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy.')।

স্যার পারসি নান (Sir Percy Num) বলেন—'শিক্ষা ভিত্তিমূলে দর্শনের ব্যবহারিক দিক হওয়ায় জীবনের প্রতিটি বিন্দু স্পর্শ করে' ('Every Scheme of education being at bottom a practical philosophy to uches lift at every point')।

জেমস্ রস্ (James Ross) বলেন— 'দর্শন ও শিক্ষা একই মুদ্রার দুই দিক, প্রথমটি হল ভাবনার দিক আর পরেরটি হল ভাবনার সক্রিয় বিষয়, ('Philosophy and education are two sides of the same coin, the former is contemplative while the latter is the active side.)'।

জন ডিউই (John Dewey)র মতে— জন ডিউই রসের মতকে সমর্থন করে বলেন 'সাধারণভাবে বলতে

গেলে দর্শন শিক্ষার তত্ত্বের কথা বলে' ('Philosophy is the theory of education in its most general phases.')।

জেন্টাইল (Gentile) এর মতে— 'দর্শন ছাড়া শিক্ষার অর্থ হচ্ছে শিক্ষার যথার্থ প্রকৃতি বুঝতে ব্যর্থ হওয়া' ('Education without philosophy would mean a failure to understand the precese nature of education'.)।

দর্শন ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যখন আমরা দেখি বিভিন্ন দর্শনের শাখা কীভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কে প্রভাবিত করে। এভাবেই শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিদ্যালয় সংগঠন, শিক্ষকের কর্তব্য, শৃঙ্খলার ধারণা ইত্যাদি ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ, মার্কসবাদ প্রভৃতি দর্শন দ্বারা কালে কালে প্রভাবিত হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা জাগ্রত হয়, চরিত্র গঠিত হতে পারে, সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটতে পারে। এর সব কিছুর ব্যাখ্যা আমরা দর্শনের নীতিশাস্ত্র (ethics) এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব (aesthetics)-এর সাহায্যে পেতে পারি। ভারতবর্ষেও সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে পরবর্তী বিভিন্ন যুগে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষা এবং মুসলিম শিক্ষা যথাক্রমে বেদান্ত দর্শন, বৌদ্ধ শিক্ষা এবং ইসলামীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

১.৫ শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

১.৫.১ শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা (Need for Educational Aim)

যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য সামনে সচেতন উদ্দেশ্য থাকা অবশ্যই জরুরি। আমরা যে কোনো কাজ সর্বান্তকরণে শেষ করার চেষ্টা করি, বাঞ্ছিত ফল লাভের উদ্দেশ্যে। এই বাঞ্ছিত ফলকেই লক্ষ্য বলা হয়ে থাকে। এই লক্ষ্য আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

জন ডিউই বলেছেন, "লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ব-দৃষ্ট বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য যা আমাদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা আচরণকে উদ্দীপ্ত করে" ("An aim is a foreseen end that gives direction to an activity or motivates behaviour.")।

প্রত্যেক সচেতন প্রচেষ্টার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। যেহেতু শিক্ষা সচেতন প্রচেষ্টা অতএব শিক্ষারও লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক। Encyclopecdia of Modern Education গ্রন্থে বলা হল 'শিক্ষা হল উদ্দেশ্যমূলক নৈতিক কাজ। সুতরাং লক্ষ্যহীন শিক্ষা চিন্তাই করা যায় না" ("Education is purposeful and ethical activity. Hence it is unthinkable without aims.")।

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের বিকাশকে কার্যকরী এবং ত্বরান্বিত করে তাদের পুর্ণমানুষ করে গড়ে তোলা— যাতে ক'রে, তারা তাদের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে উন্নততর ও সার্থক সংগতিবিধান বা অভিযোজন করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে শিক্ষাকে সৃজনমূলক মহৎ শিল্পকলা (Creative art) বলে চিহ্নিত করা যায়। মহামতি অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, "প্রতিটি মহৎ শিল্পকলার একটি কল্যাণকর মহৎ লক্ষ্য থাকে।" ("Every Art, aims

at some good.'')। শিক্ষা যেহেতু মহৎ শিল্পকলা, সুতরাং এরও একটি কল্যাণকর আদর্শ বা লক্ষ্য থাকে।

কোনো কাজের উদ্দেশ্য জানা না থাকলে কাজটি যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। আর উদ্দেশ্য জানা থাকলে সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তি নিজস্ব বুদ্ধি বা স্বকীয়তা প্রয়োগ করে পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সেখানে অর্থপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৌঁছতে পারে। লক্ষ্য ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই অর্থবহ হয়ে ওঠে। তার শিক্ষার লক্ষ্য থাকা জরুরি।

আধুনিককালের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকে অবশ্যই মানুষের এক সচেতন প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাকে সামগ্রিকভাবে এবং যথাযথভাবে পরিমাপ করতে গেলে পরিমাপক বা শিক্ষকের সামনে একটি তুলনীয় মূল্যমান অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এই মূল্যমান বা লক্ষ্য ছাড়া শিক্ষকের পক্ষে পাঠক্রম এবং পাঠদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা এবং সমস্ত শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যকরী ভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব বা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ কারণেও শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা একান্তই আবশ্যক।

১.৫.২ শিক্ষার চরম ও আপাত লক্ষ্য (Ultimate and Proximate Aims of Education)

শিক্ষা একটি জীবনমুখী, সচেতন, উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া। তাই শিক্ষার লক্ষ্য থাকবেই এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তবে শিক্ষার লক্ষ্য এক নয়, বহু। দেশ, কাল, রাজনীতি, প্রশাসন, পরিকাঠামো, অর্থনীতি, দর্শন, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য বহুবিধ।

এই বহুবিধ লক্ষ্যকে সাধারণভাবে দুটিভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল চরম লক্ষ্য (Ultimate aim), আর অন্যটি হল আপাত লক্ষ্য (Proximate aim)। প্রাচীন ভারতে পরাবিদ্যার মাধ্যমে আত্মমুক্তি এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা ছিল লক্ষ্য। বলা হত—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। আর আপাত লক্ষ্য ছিল অপরা বিদ্যা অর্জন। অপরা বিদ্যার মানুষ বাস্তব জীবনের উপযোগী ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করত। আধুনিক শিক্ষায় বলা হয় 'একজন ব্যক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ—সুষম বিকাশ হল, শিক্ষার চরম লক্ষ্য' (harmonious development of an individual is the ultimate aim of education)।

এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে ব্যক্তির বিকাশ সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক ধাপ বা লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। যেমন ব্যক্তির দেহ, মন, বুদ্ধি, সামাজিক জীবন, বৃত্তিমুলক জীবন, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদির বিকাশ। চরম লক্ষ্য, আপাত লক্ষ্যগুলির ওপর নির্ভরশীল। এই আপাত লক্ষ্যগুলি চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন উপায় মাত্র। এরা পরস্পর বিরোধী তা নয়ই, বরং পরস্পরের সহকারী।

১.৫.৩. শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বিভিন্নতা (Differences in determining the Aims of Education)

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো থেকে আধুনিক যুগের শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে তাদের লক্ষ্য নির্ণয়ে বিভিন্নতা আছে।

দর্শন অনুযায়ী বিভিন্নতা : দর্শন জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করে। জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। পার্সিনান বলেছেন—"শিক্ষা যেহেতু আদতে দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ সেহেতু এটা জীবনের প্রতিটি বিষয়কেই ছুঁয়ে যায় (Every Scheme of education being at battom a practical philosophy, necessarily touches life at every point)। তিনি আরও বলেছেন যেহেতু জীবনের আদর্শ সব সময়ই পরিবর্তনশীল, সেই পরিবর্তনগুলি শিক্ষার তত্ত্ব নির্ধারণেও লক্ষণীয় (As Ideals of life are eternally at variance, their confliect will be reflected in educational theories)। অর্থাৎ আমরা দেখলাম জীবনের লক্ষ্য বা দর্শনের বিভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন হয়। সে কারণেই ভাববাদীরা যখন আত্মোপলব্ধি এবং ব্যক্তিত্বের উন্নয়নকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেন প্রকৃতিবাদীরা তখন বলেন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রকাশ। প্রয়োগবাদীরা বলেন, জীবন অভিজ্ঞতা গঠন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজ নির্দেশিত ক্রমান্বয় বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য।

সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্নতা : কোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হতে পারে। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মন্তব্য করেছেন, 'রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়, এখনই শিক্ষার লক্ষ্যের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্যের নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে' (As te political, social and economic conditions change and new problems arise, it becomes necessary to re-examine carefully and restate elearly the objections which education at definite stage should keep up in the view)। এই পরিবর্তনশীলতা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের পরির্তনের কথা বলতে গিয়ে ব্রাউন (Brown) বলেছেন, 'যে কোনো দেশে সর্বসময়ে শাসকশ্রেণির মূল্যমান শিক্ষায় প্রতিফলিত হয়' ('Education in any country and at all periods reflects value of the ruling class')। গণতান্ত্রিক সরকার, ফ্যাসিবাদী সরকার এবং কমিউনিস্ট সরকারের নির্ধারিত শিক্ষার লক্ষ্য অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হবে।

বিকাশের স্তর অনুযায়ী বিভিন্নতা ঃ বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীর শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য কোনো সময়ই এক হবে না।

শিক্ষার ধরন অনুযায়ী বিভিন্নতা ঃ শিক্ষার ধরন অনুযায়ীও শিক্ষার লক্ষ্য হয় বিভিন্ন। সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন হয়।

মানব প্রকৃতির বিভিন্ন দিক অনুযায়ী বিভিন্নতা ঃ মানব প্রকৃতির বিভিন্ন দিক যেমন শারীরিক, বৌদ্ধিক সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদির বিকাশের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য কিছু না কিছু বিভিন্ন হবে।

পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী পার্থক্য ঃ পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে অভিযোজনের কারণে শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হবে।

১.৫.৪. শিক্ষার লক্ষ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (Historical survey of educational Aims)

শিক্ষার আদিপর্বে আদিম মনুষ্য সমাজে শিক্ষাদান কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না। শিক্ষা ছিল অনিয়ন্ত্রিত।

জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার তাগিদে এবং আত্মসংরক্ষণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে মানুষ আপনা আপনি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করত। তাই ছিল তার শিক্ষা। দল হিসাবে মানুষ যখন বাস করতে আরম্ভ করল, তখন দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সুষ্ঠু' অভিযোজনের প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করা, যাতে করে দলের সঙ্গে সার্থক সংগতি বিধানের মাধ্যমে বেঁচে থাকা যায়। তখন শিক্ষা ধীরে ধীরে সচেতনভাবে লক্ষ্য মুখী হল।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল ধর্মনিয়ন্ত্রিত। বৈদিক দর্শন এবং হিন্দু ধর্মের উপলব্ধি হচ্ছে পরমাত্মা অবিনশ্বর এবং অসীম। ব্যক্তি সেই পরামাত্মার সসীম অংশ এবং নশ্বর। সক্ষম জগৎ পরম ব্রয়ের বিচিত্র প্রকাশ। 'সর্বং খলু ইদং ব্রম্ন'। আত্মোপলব্ধি এবং ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের মাধ্যমে নিজের অন্তরে এই 'পরমাত্মা' বা ব্রয়ের উপলব্ধি এবং সমগ্র বিশ্বজগতের পরম বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এক-কে অনুভব করাই ছিল শিক্ষার পরম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এই শিক্ষা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

পাশ্চাত্যে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতা ছিল। গ্রিস দেশের নগররাষ্ট্রে স্পার্টায় ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো মূল্য ছিল না। এই রাষ্ট্র প্রায়ই বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হত। আত্মরক্ষার তাগিদে সমগ্রজাতিকে যোদ্ধাজাতি রূপে গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা ছিল রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির দৈহিক শক্তি, সাহস, শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। শিক্ষায় ব্যক্তিগত আশা-আকাঙক্ষা চরিতার্থ করার কোনো স্থান ছিল না। সমাজ কল্যাণের কাছে ব্যক্তি কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। এতে জ্ঞানচর্চা ও সৌন্দর্য চর্চার বিশেষ সুযোগ ছিল না।

পাশের নগররাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বার্থকে সমাজের দাবির ওপর স্থান দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির দেহ মনের সুসমঞ্জস্য বিকাশসাধনকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে ধরা হয়েছে। তখন সোফিস্ট নামে একদল শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটল। তাঁরা বললেন, 'ব্যক্তি মানুষই হবে সকল বিষয়ের মাপকাঠি' ('Man is the measure of all things')। ব্যক্তির আত্মোন্নতির বাইরে কোনো শাশ্বত মূল্যবোধ থাকতে পারে না। তাঁরা তাই সমাজের প্রতি দায়িত্বকে প্রায় অস্বীকার করে ব্যক্তিকল্যাণকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করলেন। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রিক মনীষীগণ সোফিস্টদের এই উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করতে পারেন নি। সক্রেটিস বললেন 'নিজেকে জানো' (Know thyself)। এই জানা এবং আত্ম জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। অর্থাৎ শুধু আত্মোন্নতি নয়, এমন আত্মোন্নতি যার ফলে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করা যায়। প্লেটো ব্যক্তির সমস্ত ক্ষমতার সর্বোত্তম প্রকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করে ছিলেন যাতে সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজবিকাশ সংহত হয়।

প্রাচীন রোমান সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক। প্রাচীন রোমকগণ গ্রিকদের মতো চিন্তাশীল, জ্ঞানপিপাসু ও সৌন্দর্যের পূজারি ছিল না। তাঁদের চিন্তাধারা ছিল একেবারে বস্তুতান্ত্রিক। ব্যবহারিক জগতে বাস্তব সাফল্যলাভের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জনই ছিল রোমক শিক্ষার আদর্শ।

মধ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হল। ধর্ম অনুশাসিত শৃঙ্খলার লক্ষ্য হল সর্বাত্মক শৃঙ্খলা। বলা হল ইন্দ্রিয় সুখ বিসর্জন, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, কঠোর কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে অনাগত অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এক কথায় ধর্মের কঠোর অনুশাসনে মানবধর্মের অবলুপ্তি ঘটল। শিক্ষাক্ষেত্রে অনুশাসন, অবদমন প্রাধান্য পেল।

মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে যাজকশ্রেণির আধিপত্যের বিরুদ্ধে, জীবনধর্মের সর্বব্যাপী এই অবদমনের বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহ করল রেনেসাঁ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই নব জাগরণের ফলে যে শিক্ষা-মতবাদের উদ্ভব হল তার নাম মানবতাবাদ (Humanism)। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া যাতে সে সর্বতোমুখী ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশের মাধ্যমে সমকালীন সমাজজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। পরবর্তীকালে অবশ্য মানবতাবাদী এই শিক্ষা একেবারে কৃত্রিম, ভাষাসর্বস্ব, গতানুগতিক, প্রথাগত, রোমান বাগ্মীদের বাকভঙ্গি অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হল। ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানবতাবাদ কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

এই কৃত্রিম শিক্ষার বিরুদ্ধে সতেরো শতকে বেকন, কমেনিয়াস প্রমুখ মনীষীদের নেতৃত্বে শিক্ষায় বাস্তববাদ (Realism) আন্দোলন দেখা দিল। বাস্তববাদীরা বললেন সকল দুর্নীতির মূলে অজ্ঞানতা। তাই শিক্ষার মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে সুসংহত করে বিশ্বজ্ঞানের বিন্যাস ও প্রচার করতে হবে। বলা হল ইন্দ্রিয় পত্যক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা অর্জনই হল শিক্ষার লক্ষ্য।*

আঠারো শতকে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্বোধন হল। শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, প্রয়োজন ও সামর্থ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে ও শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর ওপর সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন ফরাসি চিন্তানায়ক ও দার্শনিক **রুশো (Rousseau)**। তিনি বললেন, "প্রকৃতির স্রষ্টার হাত থেকে যা কিছু আসে তা সব সৎ এবং মঙ্গলময়; কিন্তু মানুষের হাতে পড়ে তাদের বিকৃতি ঘটে" ("Everything is good as it comes from the hands of the Author of nature ; but everything degenerates in the hands of man.")। তাই বয়স্ক পরিকল্পিত কৃত্রিম জ্ঞানের বোঝা বাইরে থেকে শিশুমনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। কৃত্রিমতাবর্জিত নিঃসর্গ পরিবেশে পরিপূর্ণ শিশুসুলভ জীবনযাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে শিশু। প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশই হল প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। এইভাবে শিক্ষাজগতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ঘটল।

রুশের উত্তরসূরি **পেস্টালৎসি (Pestaloziu)** শিক্ষকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করার প্রয়াসী হয়ে বললেন, শিশুর সহজাত শক্তি সম্ভাবনার সামগ্রিক স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণতা লাভই শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

শিক্ষাবিদ্ হাবার্ট (Herbart) ঘোষণা করলে যে, চরিত্র গঠনই শিক্ষার চরম আদর্শ।

---

* "As the naturalism developed against showy education, similarly the realism came into being as a resultant of bookish knowledge full of false and deep rooted adherence to syllebus"—Ross

অধ্যাত্মবাদী ফ্রয়েবেল (Froebel)- এর মতে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে শিশুর আত্মবিকাশ এবং তার মাধ্যমে নিজ অন্তরে আগে থেকেই বর্তমান সুপ্ত পরমাত্মার উপলব্ধি, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অনুভব করাই শিক্ষার চম লক্ষ্য বলে গণ্য করা উচিত।*

হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) বললেন, 'ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতি সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের কাজে লাগে না এমন শিক্ষা শিক্ষাই নয়। তাঁর মতে শিক্ষা হল ব্যক্তিগত বিষয়। এতে রাষ্ট্র ও সমাজের খবরদারি ঠিক নয়। শিশুর রুচি প্রবণতা, আগ্রহকে পূর্বের মতো অবহেলা না করে আত্মসংরক্ষণ, ভবিষ্যতে সুষ্ঠু জীবিকা অর্জন, সন্তান পালন, যোগ্য নাগরিকতা অর্জন, সুষ্ঠু অবসর বিনোদনের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের জন্য সার্থকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তিনি আরও বললেন এর প্রতিটির জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা জরুরি। বলা হয়ে থাকে শিক্ষাক্ষেত্রে জীবনানুগ বিজ্ঞান শিক্ষার কথা তিনিই প্রথম বলেছেন। স্পেনসারের হাত ধরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান স্বীকৃতি লাভ করল।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধারা প্রধানত সমন্বয়ধর্মী। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এবং সামাজিক আচরণ দক্ষতা অর্জনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা আধুনিক শিক্ষার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই সমন্বয়ের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন প্রয়োগবাদী আমেরিকান শিক্ষাবিদ **জন ডিউই (John Dewey)**। তিনি শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, **শিক্ষার লক্ষ্য যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে**। শিক্ষার বহুল প্রচলিত কয়েকটি লক্ষ্যের উল্লেখ করলে এই পরিবর্তনশীলতার ধারণাটি আরও স্পষ্ট হবে।

১.৫.৫. শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞানার্জন (Aim of Education - Acquisition of knowledge)

জ্ঞানার্জনই শিক্ষার লক্ষ্য এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন যে জ্ঞানবৃদ্ধির ওপর মানবিক উন্নতি নির্ভরশীল। **কমেনিয়াস** (Comenius) ও **বেকন** (Bacon) এই মতের ধারক ও বাহক তাঁরা 'সকলের জন্য সর্বজ্ঞান' ('all knowledge for all)-এর কথা বলেন। এই লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষকের কাজ হল অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা এবং বিদ্যালয়ের কাজ হল বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান সার্থকভাবে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সক্রেটিসের মতে 'কোনও কিছু সম্পন্ন করার জন্য জ্ঞানই শক্তি দেয়' (Knowledge is power by which things are done)। যে কোনো পেশা ও বৃত্তিতে সফলতা আনতে সমর্থ হয় এই জ্ঞান। বাস্তবিক বলা যায় যে, দৈহিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য শর্ত (Sine qua non)। তবে এই জ্ঞান হতে হবে কার্যকর, মূল্যবান ও বাস্তবজীবনে ব্যবহারযোগ্য।

আধুনিক শিক্ষাবিদরা মনে করেন জ্ঞানার্জন নিছক শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। এটি অন্য কোনো লক্ষ্যে

---

* All things have come from the divine unity, God, and have their origin in divine unity, in God alone. God is the sole source of all things"—Froebel.

পৌঁছানোর উপায় হিসাবে কাজ করতে পারে যেমন, ব্যক্তির বিকাশ, নাগরিক দক্ষতা অর্জন, অর্থকরী দক্ষতা অর্জন, সম্পূর্ণ উন্নততর জীবনযাপন ইত্যাদি। জ্ঞানার্জন ব্যক্তির সুখশান্তি বিধানে এবং মানবতার কল্যাণসাধনে উপায় হিসাবেই কাজে লাগে।

১.৫.৬. শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য (Vocational aim of Education)

বিজ্ঞানের অগ্রগতি, গণতন্ত্রের বিকাশ মার্কস্‌বাদী দর্শনের ব্যাপক প্রসারের ফলে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ শিক্ষাকে জীবিকা অর্জনের উপযোগী হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য চাই, স্বাচ্ছন্দ্য চাই। আর তার জন্য চাই উপার্জন। আর উপার্জনের জন্য চাই বৃত্তি শিক্ষা (Vocational Education)। জীবিকা উপার্জন ছাড়া ব্যক্তিকে পরনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। সে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না। প্রত্যেক বৃত্তিরই একটি শিক্ষামূলক মূল্য আছে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে প্রথম থেকেই বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া। শিক্ষার এই লক্ষ্যকে বলা হয় শিক্ষার বৃত্তিমুখী লক্ষ্য (Vocational aim of Education)।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা না থাকলে জ্ঞানার্জন অর্থহীন। বৃত্তিশিক্ষা জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার হাতিয়ার। জন ডিউই বলেন, ব্যক্তি কী করতে পারে তা নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করলে এবং কাজে নিযুক্ত করলে সে সুখী হয়। বুদ্ধির দিক থেকে য়ারা দুর্বল তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে।

তবে সম্পূর্ণ বৃত্তিমুখী শিক্ষাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। সার্থক জীবনযাপনের জন্য মানুষের বৌদ্ধিক, সামাজিক, বৈতিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক থেকেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়া দরকার।

১.৫.৭. শিক্ষার কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য (Cultural aim of education)

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য কৃষ্টি লাভ। 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি' একদিনে গড়ে ওঠার বিষয় নয় মানব সমাজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যে সব বিশ্বাস, রীতিনীতি, সংস্কার, আচার-আচরণ অর্জন করেছে বা গড়ে তুলেছে তার সমন্বয়ই সমাজের 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি'।*

এক এক সমাজের সংস্কৃতি এক এক রকম হতেই পারে। এই সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা, উন্নয়ন করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শিক্ষার কাজ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য কৃষ্টিলাভ হচ্ছে সামনে যা কিছু মহৎ সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। সুন্দরকে উপলব্ধি করতে শেখা, মানুষের মনকে ছুঁতে শেখা। এতে ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটে। ব্যক্তিকে কৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয়। গান্ধিজি মনে করেন কৃষ্টি সম্পন্ন মানুষকে তার আচরণ, হাবভাব, কথাবার্তা, পোশাক পরিচ্ছদ, ওঠাবসা, হাঁটা চলার মাধ্যমে চেনা যায়। বলা হয়ে থাকে কৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ সমাজের সম্পদ।

১.৫.৮. শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য - চরিত্র গঠন (Moral aim of education - character building)

---

* "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, *morals law, custom and any other capabilities acquired by man as a member of society"—Tylor.

ব্যক্তিজীবনের নৈতিক মান উন্নয়ন বা ব্যক্তির আদর্শ চরিত্র গঠন করাকে অনেক শিক্ষাবিদ শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে হয় না। এর জন্য শিক্ষার বিশেষ দায়িত্ব আছে।

মনীষীগণ চরিত্রগঠনের সাথে নৈতিক জীবযাপন একার্থবোধক বলে মনে করেন। জন ডিউই বলেছেন, "বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ও শৃঙ্খলা বিধানের সংহত লক্ষ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন"। (Establishing of character is a comprehensive aim of school instruction and discipline")। **জে. এফ. হার্বার্ট** (J. F. Herbart) বলেন, "সমস্ত শিক্ষা সমস্যা একটি কথাতেই প্রকাশ করা যায়— তা হচ্ছে নৈতিকতা" ("The whole problem of education may be comprised in a single concept - morality")।

শিক্ষাবিদ **রেমন্ট** (Rayment) বলেছেন যে, "শিক্ষকের একান্ত কাজের বিষয় হল শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য মাংসপেশি গঠন নয়, মানসিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য জ্ঞানার্জন বা অনুভূতির উৎকর্ষসাধন নয়। কাজ হল শিক্ষার্থীর বলিষ্ঠ ও নির্মল চরিত্র গঠন"। (The teachers' ultimate concern is to cultivate nor wealth of museles, nor fullness of knowledge, nor refinement of feelings, but strength and purity of character")।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে যখন গান্ধিজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, 'শিক্ষার লক্ষ্য হবে চরিত্রগঠন'। তিনি আরও বলেছেন, 'আমি ব্যক্তি জীবনে সাহস, শক্তি, অন্যান্য সদগুণ বিকাশের চেষ্টা করব, যাতে ব্যক্তি মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে নিজের স্বার্থকেও ভুলে যায়' ('Character building is the aim of education'. "I would try to develop courage, strength, virtue, the ability to forget oneself in working towards great aims.")।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চরিত্রকে বলিষ্ঠ ও কর্মঠ করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য"।

শিশু যে সব প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় তার কিছু হচ্ছে আদিম। সমাজবাঞ্ছিত নয়। শিক্ষা সেগুলিকে উদগমনের (Sublimation) মাধ্যমে সমাজবাঞ্ছিত পথে উত্তরিত করতে পারে। পরিবারে পিতামাতা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক তাঁদের আদর্শজীবনকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন।

সমাজের পটভূমিকা ছাড়া মানুষের নীতিবোধ জাগ্রত হয় না। যখন সে একতা থাকে তখন সে যা খুশি করতে পারে। কিন্তু সে যখন দলে বাস করে তখন সে সমাজবাঞ্ছিত পথে তার কাজকে রূপায়িত করতে চায়।

মুদালিয়ার কমিশনও মনে করেন চরিত্রগঠনই শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য এবং চরিত্রগঠনের শিক্ষা সামাজিক শূন্যতায় দৃশ্যমান নয়।

সেজন্য বলা যায় যে শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্যের সামাজিক মূল্যও বিদ্যমান।

১.৫.৯. শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য (Spiritual aim of education)

আদর্শবাদী দার্শনিক তথা শিক্ষাবিদগণ মনে করেন নৈতিকতাকে আরও সূক্ষ্ম ও উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করলেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়। তাঁরা মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা। তাঁদের মতে মানুষের মন— অসীমসত্তা পরম নিরাকার ব্রহ্মের (The Absolute) সসীম অংশ।

আত্মোপলব্ধি, ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন, অন্তর্জগতের বিকাশের মাধ্যমে বুদ্ধির অগম্য ওই অসীম সত্তাকে ধরা যায়, উপলব্ধি করা যায়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে, অন্তর্জগতের বিকাশ, ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক শক্তি (Spiritual force)-র উল্লেখ।

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রসার, বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এই আদর্শ অনেকাংশে লোপ পেলেও রাধাকৃষ্ণণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণ শিক্ষার এই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও উন্নতধরণের জীবনাদর্শ বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তথা শিক্ষাবিদ ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, 'শিক্ষার লক্ষ্য জাতীয় দক্ষতা কিংবা বিশ্বসংহতি নয়, শিক্ষার লক্ষ্য হবে বরং ব্যক্তির অন্তরে এমন এক চেতনার উন্মেষ ঘটানো যা বুদ্ধির অগম্য যাকে আধ্যাত্মিকতা বলে চিহ্নিত করতে পারো।" ("The aim of education is neither national efficiency, nor world solidarity, but making the individual feel that he has within himself something deeper than intellect, call it spirit, if you like")।

ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে ঐশ্বরিক সত্তা এবং নিজস্বতা আছে এবং অল্প হলেও সম্পূর্ণতা ও শক্তির আধার বর্তমান থাকে যাকে ব্যক্তি গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। কাজ হচ্ছে এটিকে খুঁজে বার করা, বিকশিত করা এবং ব্যবহার করা" (Everyman has in him something divine, something his own, a chance of perfection and strength in however small a sphere which God offers him to take or refuse. The task is to find it, develop it and use it.")।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঘৃণাকে ভালোবাসায় স্বার্থপরতাকে আত্মোৎসর্গের মনোভাবে, হিংসাকে অহিংসায় রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। সংক্ষেপে সত্য, সুন্দরের আরাধনা করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা সুখ ও শান্তির মনোভাব জাগাতে সাহায্য করে।

১.৫.১০. শিক্ষার লক্ষ্য পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান (Aim of Education - Adjustment with the environment)

আমরা খুব ভালোভাবেই জানি ব্যক্তি শূন্যস্থানে জন্মগ্রহণ করে না। সে একটি মনুষ্যগঠিত সমাজে, প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। জন্মসূত্রে ব্যক্তি কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। সেজন্য ব্যক্তিকে বাঁচতে গেলে এবং এগিয়ে যেতে গেলে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। তাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি যাতে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করতে পারে তার যোগ্য করে তোলা। জীববিজ্ঞানীরা বলেন, জৈবিক ক্ষমতা অনুযায়ী যে প্রাণী যত বেশি উন্নত সে তত অভিযোজনে সক্ষম। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে অক্ষম প্রাণী একসময় লয় পেতে বাধ্য।

জৈবিক ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষ উন্নততম প্রাণী। তাই, সে পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে এবং নিজের কল্যাণে পরিবেশকে কাজে লাগাতে পারে।

আমরা জানি মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ত্রিবিধ ঃ

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ ;

(২) সামাজিক পরিবেশ; এবং

(৩) অন্তর পরিবেশ বা নৈতিকতার পরিবেশ।

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুকে যোগ্য করে গড়ে তোলা যাতে সে জড় প্রকৃতি, সমাজ ও অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সক্ষম হয়। মানুষের জীবনের পরিসর অত্যন্ত অল্প। এই স্বল্প পরিসরে ক্রমবর্ধমান জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়াতে হয়। এই জটিল কৌশলগুলি আয়ত্ত করিয়ে দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। মানুষ এই লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

১.৫.১১. শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির বিকাশ (Aim of Education - Individual Development)

ব্যক্তি দেহমন নিয়ে একটি বাস্তব সত্য (A body-mind reality)। ব্যক্তির বিকাশ বলতে আমরা বুঝি তার দৈহিক, মানসিক, আবেগমূলক, আধ্যাত্মিক সমস্ত সামর্থ্য ও সম্ভাবনার বিকাশকে। এই বিকাশ হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাধীন পরিবেশে সংঘটিত যার ফলে ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধি (Self realisation) ঘটবে। শিক্ষাই শিশুর সেই সর্বাত্মক বিকাশের ব্যবস্থা করতে পারে।

সেজন্য বলা হয় ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষার কাজ হচ্ছে শিশুর সর্বাঙ্গীন্ ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ (Self expression) এবং আত্ম উপলব্ধি (Self realisation)।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি পৃথক সত্তা। প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতি, প্রবণতা সামর্থ্য নিয়ে জন্মায়। বৈষম্যের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে যাচাই করে তাদের উপরিউক্ত বিষয়গুলির যথোচিত বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রুশো, হবস্ প্রভৃতি চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীগণ ব্যক্তির বিকাশ তথা আত্মোন্নতিকে জীবন তথা শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে, সমাজ অথবা রাষ্ট্র ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট। সর্বোত্তম উপায়ে ব্যক্তিকল্যাণ সাধনের প্রয়াসে ব্যক্তিরা নিমেষের মধ্যে চুক্তিবন্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তুলেছিল। যদি সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির কল্যাণসাধন না করতে পারে তবে তার অস্তিত্ব টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই। প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রুশো তৎকালীন সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্বেষপোষণ করে বলেছেন—"প্রকৃতি প্রদত্ত যা কিছু তাই সৎ এবং মঙ্গলময়। মানুষ তথা সমাজই তাকে কলুষিত করে" ("Everything is good as it comes from the hands of the Author of Nature, but everything degenerates in the hands of man")।

ফ্রয়েবেল (Froebel) ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান করেছেন। তিনি শিশুদের বৃক্ষশিশু অর্থাৎ, চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিক্ষককে তুলনা করেছেন মালির সঙ্গে। ফ্রয়েবেলের মতে প্রত্যেক শিশুকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী বড়ো হতে দিতে হবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে চলবে না।

পারসি নান্ খুব জোরের সঙ্গে ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার সপক্ষে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির মর্যাদার ও সম্ভাবনার কোনো অন্ত নেই এবং নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তারই আছে চরম দায়িত্ব। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে অবাধে বিকাশ লাভ করবার সুযোগ করে দেওয়া। শিক্ষক সেই পরিবেশ রচনা করবেন। তিনি যেন কখনই নিজের ইচ্ছা অনুসারে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সচেষ্ট না হন।*

* The primary aim of educational effort should be to help boys and girls to achieve the highest degree of individual development of which they are capable."—T.P. Nunn.

এ কথাও নান স্বীকার করেছেন যে, ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিপুষ্ট হতে পারে কেবল সামাজিক আবেষ্টনে, সকলের সম্মিলিত আগ্রহ ও কার্যকলাপের সাহায্যে।*

অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে শিশুদের আত্মপ্রকাশে অবাধ স্বাধীনতা দিলে স্বাধীনতার নামে সহজাত আদিম বাসনা কামনার অবাধ প্রকাশ উৎসাহিত হতে পারে। তখন স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীনতার মধ্যে সীমারেখা টানা মুশকিল হতে পারে।

১.৫.১২. শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য ((Social aim of education)

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের ঠিক বিপরীত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। চরম সমাজতন্ত্রবাদী হিসাবে **হেগেল (Hegel) জেন্টিল (Gentile)** প্রমুখ শিক্ষাবিদ তথা মনীষীগণ পরিচিত। এঁদের মতে সমাজ ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। এটি একটি অতি মানবিক সত্তা (Superpersonal entity)। সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ভগবান বা পরমপুরুষ (The Absolute) নিজেকে ব্যক্ত করেন। এই সমাজের জন্যই ব্যক্তি বলি প্রদত্ত, ব্যক্তির জন্য সমাজ নয়। এই লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, আশা-আকাঙক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মূল্য দেওয়ার দরকার নেই। বৈষম্যের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার বিকাশের কোনও প্রয়োজন নেই। কাকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কী শিক্ষা দেওয়া হবে, কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তা ঠিক করবার একমাত্র এবং চরম অধিকার হচ্ছে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষাই ব্যক্তির তথা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যক্তির স্বার্থ যেন কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

প্রাচীনকালে স্পার্টানরা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করত। হিটলারের জার্মানিতে, মুসোলিনির ইটালির আমরা রাষ্ট্রতান্ত্রিক শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করেছি।

হেগেলের মতে চরম সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেছিলেন, 'সমাজ মানুষের সৃষ্টি নয়। অতি মানবীয় স্বর্গীয় সত্তা।' তবে সমাজ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তানায়কগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, মানুষের নিজেদের প্রয়োজনে সমাজ গড়ে ওঠার পর সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজন আছে। এরজন্য দরকার অনুশাসনের এবং নিয়ন্ত্রণের। শিক্ষা এমনই এক সমাজ নিয়ন্ত্রণের উপায় (Education is a means of social control)। শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য হল 'শিক্ষা সমাজসেবার জন্য'। (education for social service) এবং 'সুষ্ঠু নাগরিকতা অর্জনের জন্য' (education for citizenship)। ব্যক্তিগত আশা আকাঙক্ষা এবং নাগরিক হিসাবে সমাজের প্রতি কর্তব্যকর্মের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তখন শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য অনুযায়ী পরেরটির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকগণের কর্তব্য হবে তাঁদের ছাত্রদের আনন্দময় কার্যকরী স্বেচ্ছাসেবার মনোভাবে উদ্দীপ্ত করা।

---

* "Individuality develops only in a social atmosphere where it can feed on common interests and common activities".—Nunn.

১.৫.১৩. ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য বনাম সামাজিক লক্ষ্য সমন্বয় (Individual and Social Aim : the Reconciliation)

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। একে অপরের পরিপূরক।

জীবনকে খণ্ড খণ্ডভাবে বিকার করার ফলে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তিকল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাগীভাবে জড়িত।

অসহায় মানবশিশু জন্মানোর পর কিছুকাল অপরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে। সমাজের প্রগচলিত জীবনধারাকে আশ্রয় করে, সমাজের বিভিন্ন অবদানে নিজের দেহমনকে পুষ্ট করতে করতে মানব হিশু আত্ম বিকাশের পথে অগ্রসর হতে থাকে। জন্মের সময় যে সব অনির্দিষ্ট প্রবণতা নিয়ে জন্মায় সেগুলি সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত ও সমন্বিত হয়ে নির্দিষ্ট আচরণধারায় রূপলাভ করে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে হয় যে, মানব শিশুর বিকাশ সমাজের দ্বারাই অনুবর্তিত হয় এবং মানবিকাশ ও সামাজিকীকরণ সমার্থক। তাই বলা যায় যে, ব্যক্তি নিজস্ব অস্বিত্ব রক্ষা, বিকাশ ও আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি স্তরে সমাজের ওপর নির্ভরশীল।

অপরদিকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সমাজ অলীক কল্পনামাত্র। শুধুমাত্র জড় জগৎ, ইট কাঠ পাথরে সমাজের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চিন্তাভাবনা, কাজের আদান প্রদান ও সহযোগিতামূলক জীবনচর্যার মাধ্যমে সমাজ গড়ে ওঠে, এগিয়ে চলে। সমাজের প্রকৃতি অস্তিত্ব ব্যক্তিমানসে, ব্যক্তির সচেতন অভিজ্ঞতার ও তার সমাজ সচেতনতায়। ব্যক্তি নিজের মনের মধ্যে যদি প্রকৃত সাজ বন্ধন অনুভব করতে পারে, নিজস্ব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজের সঙ্গে সম্পর্কে আবন্ধ হতে পারে তবেই সমাজ বিকশিত হয়। যুগে যুগে ব্যক্তিমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অবদানে সমাজ সমৃন্ধ হয়েছে এবং সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে। স্ফুরণের অবাধ সুযোগ থাকে যে সমাজে সেখানে সমাজের নারী-পুরুষের অবাধ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশোন্মুখ কাজের মাধ্যমেই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়।

প্রতিটি মানুষের যুগপৎ একটি ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তা আছে। মানুষ কোনোটিরই বিলোপ চায় না। একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে মানুষের এই দ্বৈতসত্তাকে শোপেনহওয়ার (Schopenhauer) ব্যাখ্যা করেছেন। অতি প্রচণ্ড শীতে একদল সজারু চলবার সময় শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের নিকট আসতে থাকে পরস্পরের দেহনৈকট্য তাদের শীতের প্রকোপ থেকে একটু কমতে পারে। কিন্তু একজনের কাঁটা অন্যজনের দেহ ছুঁলেই তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। এজন্য তারা এমন এক মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়ে চলতে চায়, যাতে করে শীত থেকে পরিত্রাণও পায় আবার নিজেদের স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। মানুষের দুইসত্তা ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যেই মানুষের মঙ্গল নিহিত থাকে।

ব্যক্তির এই দুইসত্তার সামঞ্জস্য বিধানের দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষার লক্ষ্যও হওয়া উচিত ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সামাজিক বিকাশের সুসামঞ্জস মেলবন্ধন ঘটানো। শিক্ষার লক্ষ্য দ্বিবিধ 'ব্যক্তির সম্পূর্ণতা এবং সমাজের মঙ্গল' (The perfection of the individual and good of the community)। 'সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কল্পনাবিলাস' (Isolated individual is the figment of imagination)। শিক্ষার লক্ষ্য—যুগপৎ সৎ মানুষ এবং সৎ নাগরিক তৈরি করা। হুমায়ুন কবীর বলেন—'একজনকে যদি সমাজের সৃজনশীল সভ্য হয়ে গড়ে উঠতে হয় তবে নিজস্ব

ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রেও তাকে অবদান রাখতে হবে' (If one is to be a creative member of the society, one must not only sustain one's own growth, but contribute something to the growth of the society')।

রাস্কে (Rusk)-র মতে "সমাজপরিবেশ ব্যতীত ব্যক্তির বিকাশ মূল্যহীন, ব্যক্তিত্ব অর্থহীন। আত্মোপলব্ধি সামাজিক যোগ সাধনের মাধ্যমেই সম্ভব এবং সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ আদর্শায়িত ব্যক্তিত্ব সমন্বিত স্বাধীন চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজের দ্বারাই গড়ে ওঠে। সমাজ ও ব্যক্তি সর্বদাই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আবদ্ধ। কোন ব্যক্তি শূন্যস্থানে বিকশিত হতে পারে না। বিকাশমান সমাজেই ব্যক্তি বিকশিত হতে পারে এবং সমাজও বিকশিত ব্যক্তিদের নিয়ে এগিয়ে চলে। বৃত্তকে কখনও ভাঙা যায় না'।

মূলকথা এই যে, ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার সমন্বয়ী লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যাতে একজন ব্যক্তি একজন সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃতী, সমাজের সঙ্গে আপ খাইয়ে চলা সামাজিক ব্যক্তিরূপে গড়ে ওঠে এবং এইভাবে বিকাশ লাভ করে সমাজজীবনকে নিজস্ব অবদানে সমৃদ্ধ করে তোলে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে যেমন সর্বক্ষেত্রে চিন্তার ও কাজের স্বাধীনতা ও বাধাহীন পরিবেশ দিতে হবে, তেমনি দেখতে হবে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা যাতে ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারী না করে তোলে। ব্যক্তি ও সমাজের কেবলমাত্র যে কোনও একটিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উভয়ের বিকাশের পক্ষেই ক্ষতিকর।

১.৫.১৪. শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ জীবনযাপন (Education for complete living)

উপরোক্ত লক্ষ্যগুলির কোনটিই জীবনের সর্বাংশে জোর দেয় না, কোনো একটি দিকের বিকাশের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয় যেমন—ব্যক্তিসত্তার দিক, সমাজসত্তার দিক, আর্থিক, নৈতিক দিক ইত্যাদি। **Horne** বলেন, সমস্ত লক্ষ্যগুলির মধ্যে কিছু না কিছু আছে। কিন্তু কোনোটির মধ্যে সব কিছু নেই।" (There is something in all these aims but not everyhing in any of them.")। **হার্বার্ট স্পেনসর** (Herbart Spencer) অবশ্য এমন একটি লক্ষ্যের কথা বললেন যে জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, সম্পূর্ণ, সংহত এবং সর্বাত্মক। এই লক্ষ্য হচ্ছে "সম্পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা" (Education for complete living)। জীবন বাস্তবিক জটিল এবং জীবন শৈলী (art of live) রপ্ত করা শিক্ষার সর্বোত্তম লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ জীবনে কোন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে পরিবারের সদস্য, কর্মী, নাগরিক ইত্যাদি রূপে। বিভিন্ন রূপে দায়িত্ব পালন করতে গেলে ব্যক্তিকে জানতে হবে তার দৈহিক মানসিক ও অন্যান্য সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা কতখানি এবং সেগুলিকে কত ভালোভাবে কাজে লাগান যায়। শিক্ষা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে।

হার্বার্ট স্পেনসার বলেন, শিক্ষা আমাদের জানিয়ে দেয় "কীভাবে আমাদের দেহ ও মনকে কাজে লাগাতে নয়, কীভাবে আমাদের সমস্ত বিষয়গুলিকে চালনা করতে হয়—কীভাবে আমাদের পরিবার প্রতিপালন করতে হবে, কীভাবে সুনাগরিকের মতো ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণগুলিকে মানবসুখে ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে

সমস্ত, ক্ষমতাগুলিকে আমাদের এবং অপরের সর্বাত্মক সুবিধার্থে ব্যবহার করা যায়।* এটাই সম্পূর্ণ জীবনযাপন এবং এর জন্য জীবন সম্পর্কে জীবনের আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। এর ফলেই ব্যক্তি জীবনে একক বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রশিক্ষিত ও পরিশীলিত করার মাধ্যমে ও দেহ মন ও নৈতিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে মানুষ নিজের সন্তোষ বিধান করতে পারে এবং সুখী হতে পারে।

১.৬ অনুশীলনী

১। দর্শনের সংজ্ঞা দাও। দর্শনের প্রকৃতি ও কাজ ব্যাখ্যা করো।

২। দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

৩। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা কী? শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বিভিন্নতার কারণ কী?

৪। শিক্ষার লক্ষ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করো।

৫। শিক্ষার জ্ঞানমূলক লক্ষ্য, বৃত্তিমূলক লক্ষ্য ও কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬। শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সামাজিক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। এই দুই লক্ষ্যের কীভাবে সমন্বয়সাধন করবে আলোচনা করো।

৮। টীকা লেখো ঃ

(ক) শিক্ষার (এডুকেশন) বুৎপত্তিগত অর্থ।

(খ) শিক্ষার চরম ও আপাত লক্ষ্য।

(গ) শিক্ষার লক্ষ্য পরিবেশে সঙ্গে সঙ্গতিবিধান।

(ঘ) শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ জীবন যাপন।

৯। বিভিন্ন দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতা আলোচনা করো।

১০। সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

(ক) দর্শন শব্দটি 'দৃশ' ধাতু থেকে উৎপন্ন।

—ভারতীয় মতে / জার্মানী মতে / ফরাসি মতে / ইংরেজ মতে

* ("In what way to treat the body; in what way to treat the mind ; in what way to manage our affairs ; in what way to bring up our family ; in what way to behave as a citizen ; in what way to utilise those sources of happinese which Nature Supplis — now to use all faculties to the greatest advantage of ourselves and others")

Spencer Herbert : Education, Cambridge Universitiy Press p. 10

(খ) 'প্রতি মানুষই জন্মগতভাবে দার্শনিক'

—উক্তিটি হাক্সলের / গান্ধিজির / রবীন্দ্রনাথের / সোপেনহাওয়ারের।

(গ) 'তত্ত্ববিদ্যার জগৎ ছাড়া বাঁচা যায় না'

—উক্তিটি হাক্সলের / বিবেকানন্দের / থমপসনের / রেমন্টের।

(ঘ) 'দর্শন হচ্ছে নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর পেছনে যা সাধারণ সত্য আছে এবং কোনো বাহ্যবস্তুর পেছনে যে বাস্তবতা আছে তার মর্ম অনুধাবন করার নিরন্তর প্রচেষ্টা'।

—উক্তিটি লকের / রেমন্টের / রবীন্দ্রনাথের / মন্টেসরির।

(ঙ) 'বাস্তবতার জগৎ সম্পর্কে যুক্তিসম্মত জিজ্ঞাসাই হল দর্শন'

—উক্তিটি রাধাকৃষ্ণাণের / সুভাষচন্দ্রের / নেহেরুর / বিবেকানন্দের।

(চ) যে বিদ্যা ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ বিচারের নীতিসমূহ নির্দেশ করে তাকে বলে—

নন্দনতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, যুক্তি বিদ্যা, বিজ্ঞান

(ছ) 'ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন' শিক্ষার লক্ষ্য

—বলেন, প্রকৃতিবাদীরা / বাস্তববাদীরা / ভাববাদীরা / মার্কস্‌বাদীরা।

(জ) 'নিজেকে জানো'— এই উক্তি সক্রেটিসের / প্লেটোর / ডিউইর / রুশোর।

(ঝ) 'দৈহিক সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য শর্ত'

—এই লক্ষ্যটি বৃত্তিমূলক / জ্ঞানমূলক / কৃষ্টিমূলক / নৈতিক।

১১। কার উক্তি?

(ক) 'শিক্ষা নামক শিল্পকলা দর্শন ছাড়া কখনই স্পষ্টতা পায় না'।

(খ) 'শিক্ষা ভিত্তিমূলে দর্শনের ব্যবহারিক দিক হওয়ায় জীবনের প্রতিটি বিন্দুকে স্পর্শ করে'।

একক ২ ☐ পাশ্চাত্য দর্শনের শাখাসমূহ (Western Schools of Philosophy)

গঠন

২.১ ভাববাদ

২.১.১ ভাববাদ কী?

২.১.২ ভাববাদের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য

২.১.৩ ভাববাদী দার্শনিক

২.১.৪ শিক্ষায় ভাববাদের প্রভাব

২.১.৪.১ ভাববাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য

২.১.৪.২ ভাববাদ ও পাঠক্রম

২.১.৪.৩ ভাববাদ ও শিক্ষাদান প্রন্ধতি

২.১.৪.৪ ভাববাদ ও শৃঙ্খলা

২.১.৪.৫ ভাববাদ ও শিক্ষক

২.২ প্রকৃতিবাদ

২.২.১ প্রকৃতিবাদ কী?

২.২.২ প্রকৃতিবাদের প্রকারভেদ

২.২.২.১ বস্তুজাগতিক প্রকৃতিবাদ

২.২.২.২ জৈবিক প্রকৃতিবাদ

২.২.৩ প্রকৃতিবাদী দার্শনিক

২.২.৪ শিক্ষার প্রকৃতিবাদের প্রভাব

২.২.৪.১ প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য

২.২.৪.২ প্রকৃতিবাদ ও পাঠক্রম

২.২.৪.৩ প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

২.২.৪.৪ প্রকৃতিবাদ ও শৃঙ্খলা

২.২.৪.৫ প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষক

২.৩ প্রয়োগবাদ

২.৩.১ প্রয়োগবাদ কী?

২.৩.২ প্রয়োগবাদের মূলতত্ত্ব

২.৩.৪ শিক্ষায় প্রয়োগবাদের প্রভাব

২.৩.৪.১ প্রয়োগবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য

২.৩.৪.২ প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম

২.৩.৪.৩ প্রয়োগবাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

২.৩.৪.৪ প্রয়োগবাদ ও শৃঙ্খলা

২.৩.৪.৫ প্রয়োগবাদ ও শিক্ষক

২.৪ বাস্তববাদ

২.৪.১ ভূমিকা

২.৪.২ বাস্তববাদের অর্থ

২.৪.৩ বাস্তববাদের মূলতত্ত্ব

২.৪.৪ বাস্তববাদের প্রকারভেদ

২.৪.৪.১ মানবিক বাস্তববাদ

২.৪.৪.২ সামাজিক বাস্তববাদ

২.৪.৪.৩ সংবেদন ভিত্তিক বাস্তববাদ

২.৪.৫ শিক্ষায় বাস্তববাদের প্রভাব

২.৪.৫.১ বাস্তববাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য

২.৪.৫.২ বাস্তববাদ ও পাঠক্রম

২.৪.৫.৩ বাস্তববাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

২.৪.৫.৪ বাস্তববাদ ও শৃঙ্খলা

২.৪.৫.৫ বাস্তববাদ ও শিক্ষক

২.৫ মার্কসবাদ

২.৫.১ মার্কসবাদ কী?

২.৫.১.১ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

২.৫.১.২ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

২.৫.১.৩ শ্রেণিদ্বন্দ্বের ইতিহাস

২.৫.২ মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব

২.৫.৩ মার্কসবাদ ও ভাববাদ বিভিন্নতা

২.৫.৪ মার্কসবাদ ও প্রয়োগবাদ বিভিন্নতা

২.৫.৫ শিক্ষায় মার্কসবাদের প্রভাব

২.৫.৫.১ মার্কসবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য

২.৫.৫.২ মার্কসবাদ ও পাঠক্রম

২.৫.৫.৩ মার্কসবাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

২.৫.৫.৪ মার্কসবাদ ও শৃঙ্খলা

২.৫.৫.৫ মার্কসবাদ ও শিক্ষক

২.৬ অনুশীলনী

২.১ ভাববাদ (Idealism)

২.১.১ ভাববাদ কী? (What is Idealism)

মানুষের জগৎ দুরকমের এক হচ্ছে বস্তুজগত ইট, কাঠ, পাথর, প্রকৃতি, গাছপালা, প্রাণী ইত্যাদি যা ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য, নশ্বর, মূর্ত আর দ্বিতীয় হচ্ছে মন, আত্মা বা ভাবের জগৎ যা ইন্দ্রিয়তীত ভাবনা বা উপলব্ধির জগৎ। যে তত্ত্বে এই অধিগত আত্মা বা ভাবের জগৎকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অধ্যাত্মজীবন বা ভাবের উপলব্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাই হল ভাববাদ।*

প্লেটোর অধিবিদ্যাগত মতানুসারে বলা হয় ভাববাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Idealism' গড়ে উঠেছে 'Idea' (ভাব) এবং 'Ism' (তত্ত্ব বা বাদ) এই দুটি শব্দকে নিয়ে এবং 'I' অক্ষরটি মাঝে বসে পড়েছে অলঙ্করণের জন্য (Idealism is in reality idea-ism with the '' inserted for euphony)। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতে তাই 'ভাবের জগতে সত্যের অধিষ্ঠান' এবং এই ভাব বা সত্য সর্বদাই সার্বজনীন।

ভাববাদীরা মনে করেন জড়বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জগতকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বলা যেতে পারে এই বস্তুনিচয় যা নশ্বর, ভঙ্গুর তা প্রকৃত সত্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশ এবং ক্ষণস্থায়ী। মনোজগতে এগুলি যখন ভাবনা হয়ে বাসা বাঁধে তখন স্থায়িত্ব লাভ করে এবং ব্যক্তি মনের ভাবনার উন্নয়ন ও উৎকর্ষণে আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি। ভাববাদীরা জীবনের চিরন্তন এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এগুলি আগে থেকেই স্থায়ীভাবে বর্তমান থাকে এবং মানুষের সৃষ্ট নয়। মানুষকে এগুলি অর্জন করতে হয়। ভাববাদী প্লেটোর মত অনুযায়ী সত্য, শিব ও সুন্দর (Truth, goodness and beauty) সেই চিরন্তন মূল্যবোধ যা অর্জন করবার জন্য মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে। ভারতীয় প্রাচিন বৈদিক ঋষিগণও এই সর্বোচ্চ মূল্যবোধ হিসাবে 'সত্যম, শিবম, সুন্দরম'কে পাওয়ার কথা বলেছেন।

* "Idealistic philosophy takes many and varied forms, but the postulate underlying all is that mind or spirit is the essential world stuff that the true reality is of a mental character."
—J. S. Ross

ভাববাদীরা মনে করেন, মানুষই পারে এই মূল্যবোধ অর্জন করতে। কারণ মানুষ নিতান্ত পশু নয়। সে স্রষ্টার সর্বোচ্চ সৃষ্টি। অন্যান্য প্রাণীর জীবনযাপনের কতকগুলি ন্যূনতম চাহিদা মিটলেই চলে যায়। কিন্তু মানুষের একটি মুক্ত মন (free mind) আছে। তার বুদ্ধি আছে, সৃজনশীলতা ও গতিশীলতা আছে। এগুলিই মানুষকে ইতরপ্রাণীর থেকে আলাদা করে রেখেছে। এগুলিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ 'সত্য, শিব, ও সন্দুরের' উপাসনা করতে পারে। মানবপ্রকৃতির উন্নয়ন ঘটতে পারে। ভাববাদ রক্ত মাংসের জীবন চাহিদার তৃপ্তির ওপর জোর দেয় না। তারা ব্যক্তি আত্মার উন্নয়নের কথা বলে এবং এই ভাবে ব্যক্তি আত্মা পরম সত্তা বা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে বা ছুঁতে পারে। অতএব ভাববাদীরা মনে করেন মানবাত্মার প্রকৃতি আধ্যাত্মিক।

ভাববাদীরা তাই ব্যক্তিসত্তা বা মানব ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ বা বিকাশকে জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শগত লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেন। রসের (Ross) মত অনুযায়ী "ঈশ্বরের মহোত্তম সৃষ্টি মানব ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ মূল্য আছে" (Human personality is of supreme value and constitutes he noblest work of god)।

২.১.২ ভাববাদের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য (Propositions of Idealism)

উপরের আলোচনা থেকে এবং বহুবিধ সূত্র থেকে সংগ্রহ করে আমরা ভাববাদের মূল কতকগুলি তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য বা স্বতঃসিদ্ধের উল্লেখ করলাম।

(ক) অধ্যাত্মজগৎ বা চিন্তার জগৎ প্রকৃত সত্য। (True reality is spiritual or thought)

(খ) অসীম, পরম মনেই (Absolute Mind) সব কিছু বিধৃত থাকে। সসীম মন এই পরম মনের অংশ বিশেষ।

(গ) যা কিছু পার্থিব জগতে সত্য বলে প্রতিভাত হয় তা মনেরই সৃষ্টি। মনই তাই বাস্তবজগতে প্রক্ষিপ্ত করে।

(ঘ) ধারণা এবং উদ্দেশ্যসমূহের অস্ত্যর্থক বাস্তবতা (realities of existence) আছে।

(ঙ) ব্যক্তিত্ব অখণ্ড সমন্বয়িত সত্তা।

(চ) জ্ঞান এবং মূল্যবোধ সার্বজনীন এবং শাশ্বত মনন অথবা আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে তা অর্জন করা যায়।

(ছ) মনন ও অনুভবের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হল যুক্তিতর্ক ব্যতিরেকে ধ্যান মাধ্যমে তাৎক্ষণিক উপলব্ধি বা স্বজ্ঞা (Intution)।

২.১.৩ ভাববাদী দার্শনিক (The Idealists)

ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে বিখ্যাত হচ্ছেন সক্রেটিস্ প্লেটো, ডেকার্টে, বার্কলে, ফিকটে, হেগেল, কান্ট, শেলিং, বার্গর্স, জেন্টাইল ইত্যাদি মনীষীগণ। কোনো কোনো দার্শনিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্লেটো, পেস্তালৎসি, হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল এবং ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি।

২.১.৪ শিক্ষায় ভাববাদের প্রভাব (Influence of Idealism on Education)

শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় কীভাবে ভাববাদ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হল—

২.১.৪.১ ভাববাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Idealism and Aims of Education)

ভাববাদীরা মনে করেন ব্যক্তি অফুরন্ত সহজাত সম্ভাবনা ও প্রবণতা নিয়ে জন্মায়। তাই তাঁরা আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে এই সহজাত সম্ভাবনার সর্বোত্তম ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করেন। নিজ সম্ভাবনার বিকাশের পথে অন্য ব্যক্তির বিকাশ ব্যাহত করলে চলবে না এবং একাকী স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী থেকে এই বিকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করে এই বিকাশের পথে অগ্রসর হতে হবে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী হতে হবে। সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এসবের জন্য দেহকেও সুস্থ করে গড়ে তুলতে হবে। ভাববাদীরা ব্যক্তির দুধরনের প্রকৃতি আছে বলে মনে করেন। (১) সহজাত স্বভাব প্রকৃতি (Original innate nature) এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতি (Spiritual nature)। তাঁরা আরও মনে করেন— প্রতি ব্যক্তির মধ্যে দেবতাত্মা (divinity)-র অবস্থান। তাকে উপরোক্ত লক্ষ্য পথে শিক্ষিত করে তুললে দেবতাত্মার সর্বাত্মক প্রকাশ ঘটবে, স্বভাব প্রকৃতির উন্নয়ন ঘটবে। ব্যক্তিত্বের সর্বাত্মক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

সেজন্য ভাববাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে—

(১) সুস্থ দেহে সুস্থ মন গড়ে তোলা,

(২) নৈতিকতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ।

(৩) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালন।

(৪) সহজাত সম্ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ।

(৫) ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন।

(৬) সর্বাত্মক আত্মোপলব্ধি।

২.১.৪.২ ভাববাদ ও পাঠক্রম (Idealism and Curriculum)

ভাববাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে, 'সত্য শিব ও সুন্দরকে পাওয়া' (to attain Truth, Happiness and Beauty)। ভাববাদ নৈতিক, সামাজিক, সমন্বয়ী ব্যক্তিত্বের মানুষ গড়ে তুলতে চায়। ভাববাদীরা মনে করেন পার্থিব বস্তু জগৎ, মানবমনের ধারণায় সৃষ্ট। তাই পাঠক্রমে মানববিদ্যার (Humanities) প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৌদ্ধিক, মানসিক ও নৈতিক ও সমন্বয়ী কাজকে মূল্য দেওয়ার ফলে পাঠক্রমে বৌদ্ধিক, নৈতিক, সৌন্দর্যমূলক বিষয়ের পাশাপাশি মানবকল্যাণে কাজে লাগে এরকম বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' তৈরির জন্য শারীর শিক্ষার পাশাপাশি পাঠক্রমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীরতত্ত্ব খেলাধূলা, জিমন্যাসটিক্সে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পাঠক্রম নিম্নরূপ—

বৌদ্ধিক পাঠক্রম—ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

নৈতিক শিক্ষক পাঠক্রম—ধর্মতত্ত্ব নীতিশিক্ষা, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি।

শারীর শিক্ষা—স্বাস্থ্য শিক্ষা, শারীরতত্ত্ব, খেলাধূলা জিমন্যাসটিকস্ ইত্যাদি।

২.১.৪.৩ ভাববাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি (Idealism and Methods of Teaching)

ভাববাদীরা ধারণা (Idea) এবং আদর্শ (Ideals) গঠনের ওপর বেশি জোর দেন। তাই তারা যুক্তিতর্ক পদ্ধতি (Logical method)-র ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। ভাববাদী দর্শন নির্দেশ দেয় জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থ অধ্যায়ন করতে হবে। ওই আহরিত জ্ঞান আত্মীকরণের (assimilation) জন্য সক্রেটিস প্রশ্নকরণ পদ্ধতি (Questioning method)-র কথা বলেন। তিনি বাজারে গিয়ে পথচারী মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন এবং তাদের কাছে তার উত্তর চাইতেন। এরপর আলোচনা (discussion)-র মাধ্যমে তিনি প্রশ্নগুলির উত্তর বার করতেন। এই 'আলোচনা পদ্ধতি' (discussion method) বা 'সক্রেটিক পদ্ধতি' (Socretic method) ভাববাদীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। ভাববাদীরা শেখানোর জন্য অনেক সময় বিতর্ক পদ্ধতিরও (Debate method) আশ্রয় নিতেন। প্লেটো প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির নাম দিয়েছেন কথোপকথন পদ্ধতি (Conversation Method)। গল্পকথন (Storytelling) এবং নাটক (Dramatics)-এর মাধ্যমেও ভাববাদীগণ শিক্ষাদানের ওপর জোর দিয়েছেন। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে 'সহজ থেকে জটিলে' (Simple to complex) এবং 'মূর্ত থেকে বিমূর্ত জ্ঞানে' (concrete to abstract knowledge) যাবার ওপর তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রী অরবিন্দ আবার 'আত্মশিখন' (Self learning)-এর ওপর জোর দিয়েছেন।

২.১.৪.৪. ভাববাদ ও শৃঙ্খলা (Idealism and Discipline) :

ভাববাদী দর্শন কঠোর শৃঙ্খলার (strict disscipline) নির্দেশ দেয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন মনকে শৃঙ্খলায় না বাঁধলে ব্যক্তি 'সত্য শিব সুন্দরর'কে উপলব্ধি করার পথে অগ্রসর হতে পারবে না। তাঁরা শিক্ষার্থীদের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা (Unrestricted freedom)-য় বিশ্বাসী নন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতায় (freedom with the restraint by an authority) বিশ্বাসী। সেজন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের নির্দেশনায় থেকে কতকগুলি অনুশাসন মেনে চলতেই হবে। কঠোর ও কঠিন জীবনচর্যা আয়ত্ত করার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা সহানুভূতি, সহযোগিতা, কর্তব্যপরায়ণতার মতো উচ্চতর মূল্যবোধগুলি আয়ত্ত করতে সমর্থ হবে।

২.১.৪.৫ ভাববাদ ও শিক্ষক (Idealism and Teacher)

ভাববাদী দর্শন শিক্ষার্থীর গড়ে ওঠার পেছনে শিক্ষকের ভূমিকাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। ভাববাদী দার্শনিক অ্যাডামস্ (Adams) শিক্ষাকে এক 'দ্বিমেরু বিশিষ্ট প্রক্রিয়া' (a bi-polar process)* মনে করেন যেখানে শিক্ষক এক মেরুতে অবস্থান করেন এবং শিক্ষার্থীর ওপর নিজস্ব ব্যক্তিগত এবং পুস্তকলব্ধ জ্ঞান সহযোগে প্রভাব বিস্তার করেন। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর কাছে নিজস্ব ব্যক্তিগত এবং পেশাগত গুণাবলি সহযোগে এক উদাহরণ স্বরূপ হয়ে

উঠতে হবে এবং প্রভাব বিস্তার করতে হবে। তাঁর মধ্যে জ্ঞানের শিখা সব সময় দেদীপ্যমান রাখতে হবে এবং মানুষ গড়ার কাজকে এক ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাদানকে কখনই কেবলমাত্র রুটি রুজি অর্জনের উপায় হিসাবে মনে করলে চলবে না। এই চিন্তার ওপরে শিক্ষাদান তাঁর কাছে হয়ে উঠবে পবিত্র কর্তব্য, ব্রত (mission)। রস (Ross) বলছেন "শিক্ষক বিশেষ পরিবেশ তৈরি করবেন যাতে শিশু প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে এবং সে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সম্পূর্ণতার দিকে নির্দশনা পায়"। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষকের সঠিক নির্দেশনা। প্রকৃত অর্থে শিক্ষককে হতে হবে বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক (Friend, Puilosopher and Guide)। জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষক বিদ্যালয় পরিবেশকে উদ্যান (Garden) রূপে গড়ে তুলবেন। নিজে মালীর (Gardener) কাজ করবেন এবং শিশুকে নরম চারাগাছ (tender plant)-এর মতো মনে করে তাকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষা করবেন এবং সম্ভাব্য সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এর জন্য শিক্ষক অবশ্যই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করবেন। তিনি একাধারে নির্দেশনা দেবেন, নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং উদ্দীপনাময় প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। নির্দেশনা প্রয়োজন শিশুকে সঠিক পথে রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণ দরকার অবাঞ্ছিত পথে শিশু যাতে পা না বাড়ায় তার জন্য এবং উদ্দীপনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দরকার শিশুর মধ্যে নতুন জ্ঞান শিক্ষা প্রজ্বলন করার জন্য।

২.২ প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

২.২.১ প্রকৃতিবাদ কী? (Shat is Naturalism)

ভাববাদী দর্শন যেখানে জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য 'অতীন্দ্রীয় সত্তা বা আত্মা' (transcendental self) কে উর্ধ্বে তুলে ধরে প্রকৃতিবাদ সেখানে 'স্বভাবজ ব্যক্তিগত সত্তা বা আত্মা' (Natural self)-র ওপর জোর দেয়। এই দর্শন অনুযায়ী এই আত্মসত্তাকেই প্রকৃতি বিষয় (reality) রূপে ধরা হয়। বিশিষ্ট প্রকৃতিবাদী দার্শনিকগণের মতে মানুষের সহজাত আত্মপ্রকৃতি যা নিয়ে সে জন্মায় এবং তার পারিপার্শ্বিক যে প্রাকৃতিক বা বস্তুজগতে সে জন্মায় তাই একমাত্র সত্য (only reality)।*

প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী 'স্বভাবজ প্রকৃতির সাহায্যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সম্পূর্ণতা উপলব্ধিই মানবজীবনের অন্তিম লক্ষ্য' (Realisation of the perfection of nature through nature is the ultimate goal of human life)। এই বিশ্বজগতের সব কিছুরই অবস্থান 'প্রকৃতি'র মধ্যে। 'প্রকৃতি'র বাইরে 'পরম' বা 'চরম' (Absolute) কোনো সত্তাই অবস্থান করে না। ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক বস্তুজগত (material world)-ই প্রাকৃতিক জগৎ (natural world)। ব্যক্তি মানুষ এই 'প্রাকৃতিক জগৎ' (natural world) তথা বস্তুজগৎ' (material world)-এর অতিচ্ছেদ্য অংশ। এই বস্তুজগৎ কতকগুলি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মানুষকেও এই বস্তুজগতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে এই সব নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। প্রকৃতির রাজ্যের অনেক কিছুই মেনে চলতে হয়।

* "Naturalism is the doctrine which separates nature from God, subordinates spirit to matter and sets up unchange able laws as supreme"—Ward.

প্রকৃতির রাজ্যের অনেক কিছুই প্রাথমিকভাবে মানুষের দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে। মানুষকে তা আবিষ্কার করতে হবে। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মানুষ সম্ভব করে নিজস্ব সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। কারণ মানুষের সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাযুজ্য (association) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

২.২.২ প্রকতিবাদের প্রকারভেদ (Forms of Naturalism)

অতএব দেখা যায় প্রকৃতিবাদ অধ্যাত্মজগৎ নয়, প্রাকৃতিক বস্তুজগৎকে প্রকৃত সত্য বলে মনে করে। দার্শনিক মতবাদ (philosophical doctrive) অনুযায়ী প্রকৃতিবাদের দুটি রকমফের (Forms) লক্ষ্য করা যায়।

(১) বস্তুজাগতিক প্রকৃতিবাদ (Materialistic Naturalism)

(২) জৈবিক প্রকৃতিবাদ (Biological Naturalism)

বস্তুজাগতিক প্রকৃতিবাদ (Materialistic Naturalism)

এই দার্শনিক মতবাদ জড়বিজ্ঞানের দর্শনতত্ত্ব অনুযায়ী সামান্যকরণের (Philoso phical generalisation of Physical Sciences) ফলে সৃষ্ট। বিশ্বজগৎকে এই মতবাদ অনুযায়ী একটি বিরাট যন্ত্র (huge machine) বলে মনে করা হয়। জগতের প্রতিটি বিষয় এবং জীব এই বিরাট যন্ত্রের অংশ বিশেষ এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি প্রাণীই এই বিশ্বজগৎ তথা যান্ত্রিক প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ এবং কতকগুলি শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক নিয়মকানুন (Physio-chemical laws) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিবাদের এই রূপ বিশ্বজগৎকে প্রাধান্য দেয় এবং মানুষকে সর্বোত্তম উপায়ে এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

জৈবিক প্রকৃতিবাদ (Biological Naturalism)

ডারউইন (Darwin)-এর বিবর্তনবাদ তত্ত্বের (Theory of evolution) অনুসরণে এর সৃষ্টি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী জৈবিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষকে সর্বোচ্চ প্রাণী বলে ধরা হয়। মানুষ কখনও যন্ত্র হতে পারে না। সে অন্যান্য সকল ইতরপ্রাণীর মতো সহজাত প্রকৃতি নিয়ে জন্মায়। এই প্রকৃতিতে আদিম বাসনা কামনা প্রবৃত্তি, আকাঙক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ গঠনমূলক প্রবৃত্তি চিন্তা চেতনা ও আশা আকাঙক্ষাও বর্তমান। ডারউইনের মত অনুযায়ী বিবর্তনের তত্ত্বে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে মানুষই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং অন্য ইতর প্রাণীরা যখন অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে এবং অল্পেই শেষ হয়ে যায় মানুষ তখন নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী অনেকদিন সংগ্রাম করতে পারে, নিজের কল্যাণে প্রকৃতির পরিবর্তনগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বাঁচতে পারে। তাই বলা হয় বস্তুজাগতিক প্রকৃতিবাদ যখন বর্হিপ্রকৃতির ওপর বেশি জোর দেয় জৈবিক প্রকৃতিবাদ তখন মানুষের স্বভাবজ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রকৃতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

২.২.৩ প্রকৃতিবাদী দার্শনিক (The Naturalists)

আমরা দেখব প্রকৃতিবাদ মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। অনেক পিছিয়ে গেলে অ্যারিস্টটলে (Aristotle)-র লেখায় আমরা প্রকৃতিবাদী ধারণার সন্ধান পাই। তিনি যুক্তি নয়,— মানুষের প্রকৃতি এবং অভ্যাসের ওপর বেশি গুরুত্ব দিলেন। জৈবিক প্রকৃতিবাদে অষ্টাদশ শতকে রুশো গুরুত্ব আরোপ করেন। ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব অনুযায়ী জৈবিক প্রকৃতিবাদের ধারণার উৎপত্তি। লার্ক (La Maroke)

আধুনিক প্রকৃতিবাদের ভিত্তি সৃষ্টি করেছেন বলা যায়। এছাড়াও প্রকৃতিবাদী দার্শনিক তথা শিক্ষাবিদ হিসাবে ম্যাকডুগাল (Mcdougall), বার্নাড স্য (Bernard Shaw)-র নাম করতে পারি। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) রুশোর অনুগামী ছিলেন। উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ দার্শনিক তথা শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেসার প্রকৃতিবাদে নতুন মাত্রা যোগ করলেন এবং মানুষের বিজ্ঞান মনস্কতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন।

২.২.৪ শিক্ষায় প্রকৃতিবাদের প্রভাব (Influence of Naturalism on Education)

শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় কীভাবে প্রকৃতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

২.২.৪.১ প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Naturalism and Aims of Education)

প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী 'আত্ম উপলব্ধি' অপেক্ষা 'আত্মপ্রকাশ'কে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন প্রকৃতিবাদী দার্শনিক শিক্ষার লক্ষ্যকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। যে সব প্রকৃতিবাদী দার্শনিক বিশ্বজগৎকে একটি বিরাট যন্ত্র হিসাবে মনে করেন এবং মনে করেন মানুষ-এর অংশ বিশেষ তাঁরা বলেন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মানবযন্ত্রকে এক উন্নত যন্ত্র রূপে গড়ে তোলা যাতে এর গঠন প্রণালী উন্নত হতে পারে, জটিল থেকে জটিলতর কাজে দক্ষ হতে পারে এবং সেই সুবাদে সর্বোত্তম উপায়ে বিশ্বজগতের সঙ্গে সঠিকভাবে সাযুজ্য রাখতে পারে। জৈবিক প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে বাইরে থেকে অবস্থিত হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে শিশুর আত্মপ্রকাশ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম বিকাশ।

হার্বার্ট স্পেনসার মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে 'সম্পূর্ণ জীবন যাপনের প্রস্তুতি'। শিক্ষার ফলে শিশুর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হবে।

ম্যাকডুগাল আত্মসুখের (Pleasure) চেয়ে প্রবৃত্তির স্বাভাবিক বাঞ্ছিত লক্ষ্যপথের দিকে উদ্‌গমন (Sublimation)-এর ওপর গুরুত্ব দিলেন। প্রবৃত্তিবাদীরা বলেন শিক্ষারলক্ষ্য হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তিগুলি এমনভাবে পুনর্নির্দেশিত এবং সমন্বিত করা যাতে প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্তিক ও সামাজিক মূল্য অর্জন করতে পারে।

ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে নিজের বেঁচে থাকার সংগ্রামে সঠিক পথ বাতলে দেওয়া।

লামার্ক (La Marck) এবং তার অনুগামীরা বলেন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থী যাতে দৈহিক ও মানসিকভাবে পরিবেশ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এঁরা দেহ ও মনের উন্নতির ওপর জোর দিলেন।

বার্নার্ডশ (Bernerd Shaw) বলেন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে বিবর্তনের গতিপথকে ত্বরান্বিত করা। শিক্ষাই সামাজিক বিকাশকে অন্য কোন উপায়ের চেয়ে আগে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

রুশো (Rousseau) মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে বাইরের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক সহজাত প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিকশিত করা।

টি.পি. নান (T.P. Nunn) মনে করেন শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিসভাকে বিকাশ ঘটাবে এবং এর মাধ্যমে সামাজিক

উন্নতিতে অবদান রাখবে। তিনি বলেন, ''The proper goal of human life is perfection of the individual and the machinery of society and all the traditions of human achievement and cultures are to be valued only in so far as they conduce towards the perfection''

সামগ্রিকভাবে প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন শিক্ষা হচ্ছে "শিশুর বিকাশমান প্রক্রিয়া যাতে সে আনন্দপূর্ণ, যুক্তিবাদী, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুষম উপযোগী এবং স্বাভাবিক শিশু হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।" (''Education is the process of development of the child into a joyful, rational, harmonionaly balanced, useful and natural child'')।

তাই বলা হয় প্রকৃতিবাদীরা ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্বীকার করেন। তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে সমাজে অন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের হানি ঘটালে চলে না। অন্যের কথাও ভাবতে হবে। একমাত্র পশুরাই স্বার্থপর হয়ে নিজের কথা ভাবে। অ্যালডুয়াস হাকস্‌লে (Aldous Huxley) বলেন, "ব্যক্তিত্ব চরম নিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব নয়, ব্যক্তিরা আরও বড় কিছু সমগ্রের পারস্পরিক নির্ভরশীল অংশ" (''Personality is not an absolutely in dependent existence, persons are inter-dependent parts of a greater whole')।

২.২.৪.২ প্রকৃতিবাদ ও পাঠক্রম (Naturalism and curriculum)

প্রকৃতিবাদীরা বলেন, পাঠক্রম তৈরি হবে ব্যক্তি শিশুর জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথপ্রয়াসের মাধ্যমে। শিশুর রুচি, প্রবণতা, মানসিক চাহিদা অনুসারে এই পাঠক্রম হবে জীবনমুখী ও কর্মকেন্দ্রিক।

প্রকৃতিবাদী পাঠক্রমে ধর্ম ও ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান অন্তর্ভূক্ত নয় কারণ প্রকৃতিবাদ আধ্যাত্মিকতাকে গুরুত্ব দেয় না। বিচারবুদ্ধি (Reasoning power)-ই প্রকৃতিবাদীদের কাছে বড়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে সুখী হতে চায়।

ভাববাদী দার্শনিকগণ, যখন পাঠক্রম মানববিদ্যা (humanities) চর্চারও ওপর জোর দেন তখন প্রকৃতিবাদ বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারে এমন বিজ্ঞান বিষয়সমূহ যেমন পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিবিজ্ঞান (Physics, Chemistry, Zoology, Botany) প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন।

এই বিষয়গুলিকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক জ্ঞান এবং ভাষাকে তাঁরা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন।

প্রত্যক্ষণ গত জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কৃষি ও কাঠের কাজের কথা বলেন।

অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার মানসে প্রকৃতিবাদী পাঠক্রমে ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রকৃতিবাদীরা নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। তবে তাঁরা বলেন এর জন্য কোন পৃথক পাঠের দরকার নেই। নীতিশিক্ষা শিক্ষার্থীরা রুশোর মতানুযায়ী "প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বের" Theory of natural consequences) ভিত্তিতে শিখবে।

প্রকৃতিবাদী কমেনিয়াস মনে করেন সব ব্যক্তিকে সমস্ত কিছু শেখানো উচিত। পাঠ বিষয়ে বাছাবাছির প্রয়োজন নেই। তবে লক্ বলেন সীমিত জীবন পরিধিতে সব্ কিছু শেখার ক্ষমতা মানুষের নেই। সেজন্য যা খুব প্রয়োজনীয় এবং যার ব্যবহার বারবার দরকার সেই সব বিষয়ই মানুষের শেখার প্রয়োজন।

হার্বার্ট স্পেনসর মনে করেন আত্ম সংরক্ষণে (Self preservation)-র জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও কাজ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই পাঠক্রমে সেজন্য উদার সংস্কারমুক্ত বিষয় (liberal education)-কে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন এবং মানুষের কাজে লাগে এমন বিজ্ঞান বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবার কথা বলেন তিনি তার পাঠ্য বিষয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এইভাবে ভাগ করেন—

(১) আত্মসংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ বিষয়সমূহ— শারীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন।

(২) আত্মসংরক্ষণের জন্য পরোক্ষ বিষয়সমূহ— গণিত, জীবন বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা।

(৩) সন্তান পালনের শিক্ষা— গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান।

(৪) সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার শিক্ষা— ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি।

(৫) অবসর বিনোদনের জন্য শিক্ষা — চারু কলা, কবিতা, গান ইত্যাদি।

তিনি ডিউই (Dewey)-র সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করেছেন প্রয়োজনীয় বিদ্যা আগে এবং পরিশীলিত গুণবর্ধক বিষয় পরে (essentials first and refinements second) শেখা প্রয়োজন।

হাক্সলে (T. H. Huxley) আবার মনে করেন, বিজ্ঞানের ওপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। প্রকৃতিবাদে পাঠক্রমে গুরুত্ব দিতে হবে নান্দনিক সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ্য বিষয়সমূহকে।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদগণ তাই মনে করেন পাঠক্রম পূর্ব নির্দিষ্ট হবে না। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক, জীবনধারার গতিপথকে ত্বরান্বিত করতে জীবনমুখী শিক্ষার উপকরণে সমৃদ্ধ হবে পাঠক্রম। পাঠক্রম হবে নমনীয়।

২.২.৪.৩ প্রকৃতিবাদ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি (Naturalism and Methods of Teaching)

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদগণ পূর্বনির্দিষ্ট জ্ঞান শিশুদের রুচি প্রবণতা, আগ্রহ ইন্দ্রিয় বিকাশ যাচাই না করেই তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবার বিরোধী ছিলেন। রুশো এই শিক্ষাকে বলেছিলেন 'ধনাত্মক শিক্ষা' (Positive education)। এই শিক্ষাগতানুগতিক শিক্ষা যা পরিণত হবার আগেই না বুঝে পরিণত মানুষের মতো জ্ঞান শিশুদের জোর করে অধিগত করানোর চেষ্টা করতে হয়। প্রকৃতিবাদী রুশো শিশুশিক্ষার প্রথম পর্যায়ে নেতিবাচক শিক্ষাদান পদ্ধতি (negative method of teaching)-র আশ্রয় নিতে বলেছেন। এর মানে শিশুদের 'অলস জীবন যাপন' বা 'কোনো কিছু না শেখানো' নয়। বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কাজকর্মের ভিত্তিতে নিজেরাই যাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের এ সময় ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিশীলিত করে সুস্থ করে গড়ে তুলতে হবে 'ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা' (Sense training)-র ব্যবস্থা করতে হবে। সুস্থ ইন্দ্রিয় বর্হিপ্রকৃতির সঙ্গে শিশুর সঠিক অভিযোজন সহায়তা করবে। প্রকৃতিবাদী রুশো বারে বারে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় উন্মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু শিখবে এবং তার শিক্ষা সর্বোত্তম হবে।

প্রকৃতিবাদীরা জোর করে কোন পাঠক্রম শিশুদের ওপর চাপিয়ে দিতে চান না। তাঁরা বলেন, নিজের চেষ্টায় শিশুরা শিখবে। শিশুদের দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় এ ব্যাপারে একসঙ্গে অনুশীলিত হওয়া উচিত ('Body organs, senses and powers should be exercised')। একে প্রকৃতিবাদীরা 'আত্মশিক্ষা' (Self education) বলে উল্লেখ করেছেন।

এরজন্য প্রকৃতিবাদীরা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, আবিষ্কার ইত্যাদিকে শিক্ষাদানের উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতিবাদীরা বলেন, পরিমিতির সাহায্য নিয়ে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে জ্যামিতি শেখাতে হবে। আবিষ্কার পদ্ধতি গ্রহণ করে গণিত এবং বিজ্ঞান শেখানো যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে কেবল পুস্তক এবং মানচিত্রের ওপর নির্ভর না করে শ্রেণিকক্ষের বাইরে ভ্রমণের সাহায্য নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছাত্ররা ইতিহাস ভূগোল পাঠ আয়ত্ত করবে। পুস্তক অপেক্ষা বিদ্যালয়ে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রণালী (Self Government)-র মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পৌর বিজ্ঞান (Civics) রপ্ত করবে।

ব্যক্তিমুখী ও সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রকৃতিবাদীরা নাম দিয়েছেন 'খেলাচ্ছলে শিক্ষাপদ্ধতি' বা 'খেলাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি' (Play way method of teaching)। এই পদ্ধতিতে শিশুরা খেলায় যে আনন্দ পায় সেই আনন্দময় পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। শিক্ষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। খেলা (play) এখানে 'প্রকৃতিপ্রদত্ত শিক্ষার একটি স্বাভাবিক উপায়' (nature's mode if education)। 'খেলা' বলতে প্রকৃতিবাদীরা কোন হালকা, অসার, অর্থহীন কাজ (Something frivolous) বলে মনে করেন না। তারা মনে করেন খেলার আনন্দেই শিশুরা সমস্ত সৃজনশীল কাজ করতে পারে। খেলার ছলেই শিশুদের শিক্ষাদান করতে হবে।

রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, মন্তেস্বরীর শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, ফ্রয়েবেলের কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাদান পদ্ধতি সবই প্রকৃতিবাদী ভাবনাকে রূপদান করেছে।

২.২.৪.৪ প্রকৃতিবাদ ও শৃঙ্খলা (Naturalism and Discipline)

প্রকৃতিবাদীরা শৃঙ্খলার চিরাচরিত ধারণার বিরোধিতা করেন। তাঁরা চান শিশুরা বাধ্যবাধকতাহীন মুক্ত পরিবেশ স্বাধীন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে। এই ব্যক্তি স্বাধীনতা অবশ্যই অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নেয়। তাঁরা শিশুকে দৈহিক শাস্তি দেওয়ার বিরোধী। শিশুরা আপনা আপনি স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে সামাজিকচর্যা পালনের মাধ্যমে শিখবে। এই শিক্ষা বাইরের কোন চাপের কাছে নতি স্বীকারের মাধ্যমে ইচ্ছার বিরুধে অর্জন করবে না। রুশো বলেন, "শিশুদের কখনও শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। ক্ষমতা প্রদর্শন নয়, স্বাধীনতা প্রদানই হচ্ছে সবচেয়ে মঙ্গলদায়"। (Children should not receive punishment. Freedom and not power is the greatest good)।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার এবং রুশো উভয়েই প্রাকৃতিক ফলাফলের নীতির ভিত্তিতে শৃঙ্খলার (discipline by natural consiquences) কথা বলেন। এই নীতি অনুযায়ী শিশু সমস্ত কাজের জন্য প্রকৃতির কাছ থেকে ফলাফল ভোগ করে। কোনটা সন্তুষ্টি প্রদান করে, আবার কোনটা ব্যথা দেয়। এর মাধ্যমে শিশু নিজেই ঠিক করতে পারে কোন কাজটা তার করা উচিত এবং কোনটা করা উচিত নয়। একে বলে 'মুক্ত শৃঙ্খলা' (Self

discipline)। এই শৃঙ্খলা আরোপিত (enforced) নয়। এই প্রাকৃতিক ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার নীতি — 'দগ্ধ শিশু আগুনকে ভয় পায়' ('A burnt child dreads the fire) অনেকটাই এই প্রবাদবাক্য অনুসারী। স্পেনসার বলছেন "যখন একটি শিশু পড়ে যায় বা টেবিলের ধাক্কায় মাথায় আঘাত পায়, সে ব্যথা পায়। এই রকম অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তিতে শিশু নিজেই কোন পথে যাওয়া উচিত সে সম্পর্কে স্বনির্দেশনা পেতে পারে।" তিনি এও বললেন যে এই নীতি শৈশবে প্রয়োগ করা উচিত হবে না। তাঁর পর্যবেক্ষণ লব্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে "একটি তিন বছরের দুরন্ত ছেলে যখন ক্ষুর নিয়ে খেলছে দেখা যায় তখন তাকে বাধা দেওয়াই উচিত— ফলের ভিত্তিতে শিশু শিখবে এই নীতি কার্যকর করা উচিত নয়। কারণ এটি চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে।" (A three year old urchin playing with an open razor cannot be allowed to learn by this discipline of the consequences, for the consequences may be too serious)। জন স্টুয়ার্ট মিল (John stuart mill) এবং পরবর্তী কালের অনেক শিক্ষাবিদ এই নীতিকে বিপজ্জনক জীবনদায়ী বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন প্রতিটি বয়ঃস্তরে শিশুদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী শৃঙ্খলার মূল কথা হল, শিশুরা শিখবার সময় স্বাধীনতা ভোগ করবে। নিজের রুচি প্রবণতা, ইচ্ছা অনুযায়ী শিখবে। বাইরের চাপে প্রভাবিত হবে না। তার ব্যক্তিত্ব মর্যাদা পাবে।

২.২.৪.৫ প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষক (Naturalism and the Teacher)

প্রকৃতিবাদীদের মত অনুযায়ী শিশুরা নিজেরাই প্রকৃতি (nature) বস্তুজাগতিক বিষয়মূহ (things), এবং মানুষ (Men) এর নিকট থেকে আত্ম প্রক্রিয়ায় শেখে। প্রকৃতিবাদী রুশো বলেছেন, 'শিক্ষা অবশ্যই প্রকৃতি অনুসারী হবে' (Education must be according to nature)। তাই তিনি বলেছেন "প্রকৃতিকে অনুসরণ কর" (follow nature) যে প্রকৃতি শিশুদের শিখনের সমস্ত নিয়মগুলি সরবরাহ করে।

শিশুরা যদি নিজেরাই সব শেখে তবে শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। শিশুরা যে তিনটি বিষয় প্রকৃতি বস্তুনিচয় এবং মানুষের কাছ থেকে শেখে তা যাতে সমন্বিত হতে পারে সে দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। তিনি পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন। তিনি বাইরে থেকে শিশু বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করবেন না, ত্বরান্বিত করবেন। শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন। শিশুর মনকে বুঝবেন এবং দুর্নীতির কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবেন। সমস্ত দমনপীড়ন মূলক পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখবেন। শিশুর দেহমন যাতে সুস্থ থাকে সে দিকে নজর রাখবেন এবং ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন এবং তাদের কর্তব্য পরায়ণতা যাতে বিকশিত হয় তা সাহায্য করবেন। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষক (observer), রক্ষক (protector), স্বাভাবিক বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ রচয়িতা (Stage setter conductive to natural developments) হিসাবে কাজ করবেন।

প্রকৃতিবাদীরা বারে বারে উল্লেখ করেন শিশু বিকশিত হবে অন্তর থেকে, বাইরের বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ থেকে নয়। সুতরাং বাইরে থেকে জোর করে শিশুর ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

২.৩ প্রয়োগবাদ (Pragmaism)

২.৩.১ প্রয়োগবাদ কী? (What is Pragmatism?)

দর্শন ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে প্রয়োগবাদের আবির্ভাব ১৮৭৮ সালে চার্লস্ পিয়ার্স (Charles Pierce)-এর হাত ধরে। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান জন ডিউই (John Dewey), উইলিয়াম জেমস্ (William James) কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick), শিলার (Schiller) প্রমুখ দার্শনিক তথা শিক্ষাবিদগণ। এই দর্শন একই সঙ্গে 'ভাববাদ' এবং 'প্রকৃতিবাদ' এর বিরোধিতা করে গড়ে উঠল। ভাববাদের তত্ত্ব 'অতিন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক পরম সত্তার উপলব্ধি প্রকৃত সত্য বা প্রকৃতিবাদের বস্তুজগতের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা তথা 'প্রকৃতিকে অনুসরণ করো' (Follow the Nature) তাই সত্য (Rerlity) এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়।

প্রয়োগবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Pragmatism' এর উৎপত্তি গ্রিকশব্দ 'Pragma' থেকে যার অর্থ 'কাজ' (action) বা 'ব্যবহারিক কাজ' (Practic)। যখন ভাববাদীরা ধরাছোঁয়ায় নেই যে পরমাত্মা তাকে পেতে চায় তখন প্রয়োগবাদীরা বর্তমানের দিকে তাকায় এবং তৎক্ষণাৎ সমস্যার সমাধান করতে চায়। ভাববাদীরা ভাবের জগতে বাস করে প্রয়োগবাদীরা কাজের জগৎ নিয়ে বাঁচতে চায়। ভাববাদীদের মতো পরজাগতিক আত্মার দিবাস্বপ্ন দেখার পরিবর্তে প্রয়োগবাদীরা মূর্ত পরিস্থিতি নিয়ে এগোতে চায়। প্রকৃতিবাদীরা আগে থেকেই বর্তমান প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কথা বলে। প্রয়োগবাদীরা নিজেরাই পরিবেশ তৈরি করায় বিশ্বাসী।

প্রয়োগবাদীরা চিন্তার চেয়ে কাজকে বেশি প্রাধান্য দেয় এবং বলে চিন্তা কাজের অধীনে থাকবে এবং যন্ত্র (Instrument) হিসাবে কাজ করবে। তাই প্রয়োগবাদকে 'যান্ত্রিকতাবাদ' (Instrumentalism) বলেও অনেকে ব্যাখ্যা করেন।

প্রয়োগবাদীরা পরীক্ষায় প্রমাণিত যা সত্য বিজ্ঞানের এই তত্ত্বকে বিশ্বাস করে। তাই প্রয়োগবাদকে পরীক্ষণলব্ধ মতবাদ (Experimentalism) বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

প্রয়োগবাদ মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। তাই একে 'মানবতাবাদ' (Humanism) রূপেও চিহ্নিত করা যায়।*

২.৩.২ প্রয়োগবাদের মূলতত্ত্ব (Main tenets of Pragmatism)

(১) মানুষ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে ডুবে থেকে এবং বর্তমান সমস্যা সমাধান কল্পে' কাজের মাধ্যমে শেখে।
এই প্রক্রিয়ায় সে মুখোমুখি হয়—

(ক) তার সমস্যার,

* "Pragmatism is essentially a humanistic philosophy maintaining that man creates his own Values in course of activity, that reality is still in making and awaits its part of complexion from the future".
—Ross.

(খ) তারসহ পাঠীদের,

(গ) তার শিক্ষকের।

(২) প্রয়োগবাদ স্থির চিরন্তন মূল্যবোধে (fixed eternal values) বিশ্বাস করে না। এই দর্শন মনে করে মূল্যবোধ নমনীয় (plastic) এবং মানুষ নিজের জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

(৩) প্রয়োগবাদীরা চরম অধ্যাত্মবাদী পরমসত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আপেক্ষিকতাবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরে।

(৪) প্রয়োগবাদীরা 'বিমূর্তচিন্তা' (abstractions), অপ্রতুলতা (Insufficiency), মৌখিক সমাধান (verbal solutions), নির্দিষ্ট নীতি (fixed principles), বন্ধ ব্যবস্থা (closed system) পূর্বনির্দিষ্ট কারণ (a-priori reasons), অনুমিত সত্তা ও উৎস (pretended Absolutes and origins) বিশ্বাসী নয়। তাঁরা চান মূর্ততা (concreteness), প্রাচুর্যতা (adequacy), ঘটনা (facts), কাজ (actions)-এর মুখোমুখি হতে।

(৫) প্রয়োগবাদীদের মতে মন প্রতিটি মানুষের মধ্যে কতকগুলি সমস্যা সম্পন্ন বস্তু বা ঘটনাকে ঘিরে এবং সেগুলিকে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে সমাধানকল্পে গতিশীল থাকে। প্রয়োগবাদীরা বিশ্বাস করেন সুনির্বাচিত পরিবেশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কাজ এবং আবিষ্কারের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

(৬) ব্যক্তিত্বের বিকাশ সমাজপরিবেশেই সার্থকভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব। দেহ-মন চিন্তা কাজ যেমন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবন্ধ। মানুষ জীবজগতের শ্রেষ্ঠপ্রাণী এবং সে শূন্যস্থানে বাস করে না। সমাজের এক অংশ হিসাবে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গতিশীল হয়ে এগিয়ে চলে। সামাজিক পরিবেশই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে কার্যকরী এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ নির্দেশনা দিতে পারে।

(৭) সত্য কী? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রয়োগবাদীরা বলেন—যা আমাদের জীবনের ও কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য সর্বোত্তম উপায়ে সাহায্য করে তাই সত্য। সন্তোষপ্রদানকারী কাজ ও উপযোগিতার নিরিখে সত্য নির্ধারিত হয়। প্রকৃত ধারণা সেগুলিই— যেগুলি আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধির মাধ্যমে সঙ্গতিকরণ করতে পারি, যুক্তিসিদ্ধ করতে পারি, নিশ্চয়তাদানে সমর্থন করতে পারি এবং পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করতে পারি। (True ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate and verity).

(৮) মূল্যবোধের ন্যায় সত্যও সার্বজনীন চিরন্তন ও স্থির নয়। অভিজ্ঞতার নিরিখে সত্য আপেক্ষিক।

(৯) প্রকৃতিবাদীদের মতো প্রয়োগবাদীরাও 'পরিবেশ'-এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে প্রকৃতিবাদীরা যেখানে কৃত্রিম, যান্ত্রিক প্রকৃতির কথা বলেন তখন প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে গতিশীল চিন্তায় কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেই নিত্যনতুন পরিবেশের সৃষ্টি করে।

(১০) প্রয়োগবাদ মনে করেন যখন একটি বিশ্বাস বাস্তবে কার্যকরী হয় তখন ব্যক্তির সেটিকে অবলম্বন করা বা আঁকড়ে ধরার পূর্ণ অধিকার আছে। (When a belief works in practice, we have moral right to hold it)।

২.৩.৩ শিক্ষায় প্রয়োগবাদের প্রভাব (Influence of Pragmatism of Education)

শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় কীভাবে প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নীচে আলোচনা করা হল।

২.৩.৩.১ প্রয়োগবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Pragmatism and Aims of Education)

প্রয়োগবাদ অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য বলে কিছু নেই। জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে লক্ষ্য সতত পরিবর্তনশীল। মানুষের প্রাণ আছে এবং সে সমাজে বাস করে। সে একাধারে জৈবিক তথা সামাজিক প্রাণী। তার লক্ষ্য হচ্ছে বিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ডিউইর মতে শিক্ষার লক্ষ্য বলতে বোঝায় আরও শিক্ষা। আরও এগিয়ে যাওয়া। এই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ক্রমপরির্তনশীল সামাজিক পরিবেশে ক্রমান্বয় সার্থক সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে। প্রয়োগবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমানে সার্থক সম্পূর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। শিক্ষা হচ্ছে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা গঠন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজ নির্দেশিত ক্রমান্বয় বিকাশমান প্রক্রিয়া।

২.৩.৩.২ প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম (Pragmatism and curriculum)

প্রয়োগবাদীরা এমন পাঠক্রমের কথা বলেন যা শিক্ষার্থীর মূল্যবোধকে তৈরি করতে সাহায্য করে, সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবে, সমাজে সুষ্ঠু সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

এজন্য তাঁরা উপযোগিতার নীতি (principle of utility)-র ওপর জোর দিয়েছেন। যা কিছু অপ্রচলিত বর্তমানে অকার্যকরী শুষ্ক মৃত তথা, বাদ দিতে হবে। সেই সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা বর্তমান জীবন সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে সমাধান করতে পারে। প্রয়োগবাদী পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর জীবনের অত্যাবশ্যক দিকগুলি (first essentials) যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও সমাজ জীবনের উপযোগী জ্ঞান সম্ভার অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োগবাদ মনে করে জীবন নিত্য পরিবর্তনশীল। তাই বিকাশমান শিক্ষার্থীর নানা স্তরে বিভিন্ন চাহিদা, রুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যস্ত করতে হবে। সেজন্য শৈশবে বাচনিক সংযোগ, জিজ্ঞাসা, গঠনমূলক প্রবণতা ও শিল্পীমনকে উদ্দীপ্ত করতে প্রারম্ভিক শিক্ষায় লিখন, পঠন, গণিত, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, হাতের কাজ, অঙ্ক, চিত্রণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরবর্তী স্তরের পাঠক্রমে ভাষা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞানের কার্যকরী অংশ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ছেলেদের জন্য কৃষি এবং মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের পক্ষে প্রয়োগবাদীরা মত প্রকাশ করলেন।

প্রয়োগবাদীরা পাঠক্রমে যেখানে যতটা সম্ভব সমন্বয়ের নীতি (principle of integration)-কে অনুসরণ করার কথা বলেন। বিষয়ের বিভিন্ন অংশকে বা বিভিন্ন বিষয়ের সদৃশ অংশকে সমন্বয়ের নীতি অনুসরণ করে পড়ালে খণ্ডিত জ্ঞানের পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সংহতি গড়ে ওঠে ফ্রেডারিক হার্বার্ট, ডেকার্ড, মহাত্মাগান্ধি প্রমুখ শিক্ষাবিদ এই সমন্বয়ী পাঠক্রমের সমর্থক ছিলেন।

প্রয়োগবাদীরা অতীত, অকার্যকরী বিষয়ের চর্বিত চর্বনের পরিবর্তে শিশুর অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক, কর্মভিত্তিক

পাঠক্রমের ওপর জোর দিলেন। ডিউই বলেন, ''মানুষ যখন কোন বিষয় থেকে কিছু খুঁজে বার করতে চায় তখন তাকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হয়।'' কাজেই (Activities) তাকে চাহিদা ও লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষার্থে এই পরিস্থিতির পরির্তন ঘটাতে সাহায্য করে এবং এইভাবে সে কার্যকরী জ্ঞান ও বোধের সম্মুখীন হয়। বৌদ্ধিক জ্ঞান হিসাবে অতীত জ্ঞান সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। যেটুকু অতীত জ্ঞান বর্তমান কাজকে সফল করতে কার্যকরী হয়, সেটুকুই গ্রহণ করতে হবে। এ কারণে বিদ্যালয়ে এমন সমাজ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী স্বায়ত্তশাসনমূলক ও সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে নাগরিকতা, আত্মশৃঙ্খলা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণগুলি অর্জন করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় প্রয়োগবাদী দার্শনিক কর্ম কেন্দ্রিক, কর্মভিত্তিক পাঠক্রমে প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ আদর্শায়িত বিদ্যালয় সংগঠনে সহযোগিতামূলক জীবনচর্যার মাধ্যমে চর্চিত সহযোগিতামূলক, উৎপাদনশীল কাজের সমবায়ে প্রয়োগবাদী পাঠক্রম গঠিত হয়।

ভাষা সমাজবিদ্যার পাঠের প্রয়োজন এখানে গৌণ। মুখ্য হচ্ছে বৃত্তিমূলক বিষয় বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ।

২.৩.৩.৩ প্রয়োগবাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি (Pragmatism and the Methods of Teaching)

ভাববাদীদের ন্যায় প্রয়োগবাদীরা বক্তৃতাপদ্ধতির ওপর নির্ভর করেন না। তাঁরা চান না শিশুরা বিদ্যালয়ের বেঞ্চে স্থানুবৎ বসে থেকে অন্য কারও চিন্তায় সৃষ্ট তত্ত্ব কথা শুনুক। প্রয়োগবাদী দার্শনিক চান বাস্তব জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষার্থী আয়ত্ত করুক। তিনি চান পরীক্ষামূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা সত্য নির্ধারণ করুক। এতে কোনও নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগে শিশু জ্ঞান অর্জন করবে। রাস্কে (Rusk)-র কথায় ''শিক্ষার্থীর সেই পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং গ্রহণ করা উচিত যা সত্য আবিষ্কারে সাহায্য করে বা সেই নীতির ওপর জোর দেওয়া উচিত যা আরোহী (Inductive) আবিষ্কার (heuristic) পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।'' (''The pupil should be aware of and appreciate the method by which a truth is discovered or a principle estoblished has been insisted on by the inductive and heuristic methods of teaching'')। ডিউইর মতানুসারে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ ও বিকাশে ''হাত, চোখ, কান এবং বলতে কী সমগ্র শরীরকে'' (The hands, the eyes, the ears, in fact the whole body'') কাজে লাগান উচিত। ডিউই বলেন ''কাজের মাধ্যমে শিক্ষা'' (Learning by doing) হচ্ছে সার্থক শিক্ষা। প্রয়োগবাদীদের এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'প্রকল্প পদ্ধতি' (Project Method) এবং প্রকল্প হচ্ছে ''সামাজিক পরিবেশে অগ্রসরমান সর্বান্তকরণে সম্পন্ন হতে পারে এরকম উদ্দেশ্যমূলক কাজ'' (''a whole hearted, purposeful activity, proceeding in a social environment'')। আবার বলা হয় ''প্রকল্প হচ্ছে স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন হতে পারে এ রকম সমস্যামূলক কাজ'' (Project is a problematic act carried to completion in its natural setting'')।

প্রকল্প একটি তত্ত্ব নয়। একটি কাজ, একটি সমস্যা। এখানে শিক্ষার্থী পুরাতন পূর্ব নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য মুখস্থ করবে না। বাস্তবে কাজ করবে এবং শিখবে। সে দেহে ও মনে সক্রিয় হবে। শিশু খেলাচ্ছলে কাজের সুযোগ পাবে। মনে রাখতে হবে কাজটি কোন সাধারণ কাজ নয়, সমস্যামূলক কাজ এবং অর্থবহ কাজ। এটা সম্পন্ন করতে যুক্তি, কল্পনা, গণনা ইত্যাদি লাগবে। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম, অবাস্তব, পুস্তকলব্ধ জ্ঞান অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। কাজ করার মাধ্যমে এবং কাজটি শেষ করার মাধ্যমে প্রকল্প রূপায়িত হবে। কাজ অসমাপ্ত করে ফেলে রাখা চলবে না।

এই পদ্ধতির চারটি পর্যায় :

(১) উদ্দেশ্য নিরূপণ করা (Purposing)।

(২) পরিকল্পনা রচনা করা (Planning)।

(৩) সম্পাদন করা (Executing)।

(৪) বিচার করা/মূল্যায়ন করা (Judging)।

বিদ্যালয়ে ছাত্ররা স্বায়ত্তশাসনমূলক, সহযোগিতামূলক বা উৎপাদন ভিত্তিক কোন কাজ নিজেরাই এই চার পর্যায়ে সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষক কেবল সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।

২.৩.৩.৪ প্রয়োগবাদ ও শৃঙ্খলা (Pragmatism and Discipline)

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন শিশুদের শৃঙ্খলা আসবে সার্থক, বন্ধনমুক্ত, সুখী সমাজ পরিবেশ, সহযোগিতামূলক, উদ্দেশ্যমুখী কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে। এই কাজ আরোপিত নয়। ডিউই বলেন, এর মাধ্যমে যে 'মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি' (Mental attitude) শিশুর মধ্যে জাগরিত হয় তাই 'শৃঙ্খলা'। এই শৃঙ্খলাও তাই 'আরোপিত' নয়, 'সহযোগিতামূলক জীবনযাপনের' (associative living) মাধ্যমে এই 'শৃঙ্খলা' আপনা আপনি উৎসারিত হয়। তাই একে বলে 'স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলা' (Auto discipline) প্রয়োগবাদীরা মনে করেন সার্থক সুসমঞ্জস্য সমাজপরিবেশে সংঘটিত সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা, আত্মবিশ্বাস, সহ্যক্ষমতা সহযোগিতা, সহানুভূতি, অপরের মত গ্রহণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি মানসিকতা জন্ম নেয়। এগুলি শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের সাহায্য করে, সামাজিক গুণাবলিকে উদ্দীপ্ত করে এবং স্বার্থপরতা আত্মসর্বস্বতা প্রভৃতি দোষ থেকে শিক্ষার্থীকে দূরে সরিয়ে রাখে।

২.৩.৩.৫ প্রয়োগবাদ ও শিক্ষক (Pragmatism and the Teacher)

প্রয়োগবাদ অনুযায়ী শিক্ষক পুস্তকলব্ধ জ্ঞান ছাত্রদের প্রথাবদ্ধ উপায়ে শেখাবেন—এটা চান না। তিনি 'জানার' (knowing) চেয়ে শিক্ষার্থীদের 'করার' (doing) ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি চান শিক্ষার্থী পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান অর্জন করুক এবং তাকে কাজে লাগিয়ে পরের সমস্যার সমাধান করুক। প্রয়োগবাদী শিক্ষক চান "তাঁর ছাত্ররা নিজেদের সমস্যা সমাধানে চিন্তা করুক এবং কাজ করুক, জানার চেয়ে কাজে বেশি গুরুত্ব দিক, পুনরাবৃত্তির চেয়ে নতুন কিছু আবিষ্কারের গুরুত্ব দিক" ("his pupils to think and to act for themselves, to do rether than to know, to originate rather than to repeat")।

এই দর্শন অনুযায়ী শিক্ষক এখানে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতেন না। জোর করে কিছু আরোপ করবেন না। পরোক্ষে ছাত্রদের সাহায্য করবেন। ছাত্ররা নিজেরাই যাতে আবিষ্কারক এবং পরীক্ষকের ভূমিকায় উদ্দীপিত হয় তার ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রকল্প নির্বাচনে তিনি সাহায্য করতে পারেন। তার পরে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য নিরূপণ, কর্ম সম্পাদন, বিচারকগণ সব ব্যাপারেই ছাত্ররা যাতে নিজেই উদ্বুদ্ধ হয় তার ব্যবস্থা করবেন। সর্বোপরি তিনি শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য সার্থক পরিবেশ রচনা করে দেবেন যাতে তারা বন্ধনমুক্ত সমাজ পরিবেশে আপনা আপনি স্বয়ং শৃঙ্খলায় সহপাঠীদের সহযোগিতায় কাজ সম্পাদন করতে পারে।

২.৪ বাস্তববাদ (Realism)

২.৪.১ ভূমিকা (Introduction)

ভাববাদী দর্শনে (Idealism)-র বিপরীতে শিক্ষায় বাস্তববাদ (Realism)-র আন্দোলন শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে এবং বিকশিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের অগ্রগতি প্রাকৃতিক জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মানুষের মনে নতুন জিজ্ঞাসার জন্ম দিল। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসা বা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে উঠল যে দর্শন তা হল বাস্তববাদ (Realism)।

মধ্যযুগকে পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয় সমাজে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে করা হত। মানুষ সর্বপ্রকারে ছিল অবহেলিত। ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল অবদমিত। এই অবদমনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সর্বতো প্রকার আত্মপ্রকাশ রূপ পেল নবজাগরণ বা রেনেশাঁ আন্দোলনের পথ ধরে। নতুন চেতনা সমৃদ্ধ দর্শন হল 'মানবতাবাদ' (Humanism)। এই শিক্ষায় 'মানবতাবাদ' এর প্রকাশ ছিল একাধারে প্রাচীন গ্রিকদের মুক্ত শিক্ষার আদর্শের পুনরুজ্জীবন এবং অন্যদিকে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সর্বাত্মক প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে সমসাময়িক সমাজের যোগ্য করে গড়ে তোলা। কালের গতিতে এই মানবতাবাদী আন্দোলনজাত মুক্ত শিক্ষা কৃত্রিম সঙ্কীর্ণ, প্রথামাফিক বাচনিক শিক্ষায় পর্যবসিত হল এবং রোমান বাগ্মীদের অনুসরণ করে ও সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়ে মানবতাবাদী শিক্ষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ, প্রথামাফিক কৃত্রিম শিক্ষায় রূপান্তর লাভ করল। এরই বিরুদ্ধে সপ্তদশ শতাব্দীতে শিক্ষায় বাস্তববাদের অগ্রগতি সম্পন্ন হল। বলা হল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ এবং বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাই হবে শিক্ষার ভিত্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর আগেও এই বাস্তববাদের অন্যরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি।

২.৪.২. বাস্তববাদের অর্থ (Meaning of Ralism)

বাটলারের (Butler) মতে 'বাস্তববাদ হচ্ছে বস্তুজগৎ ঠিক যেমনটি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তার সর্বজনগ্রাহ্য রূপটি পরিশীলিত উপায়ে তুলে ধরা'। (Realism is the refinement of our common acceptance of the world as being just what it appears to be)।

রস (Ross) বলেন—'বাস্তববাদ সম্পর্কিত মতবাদ নিশ্চিত করে যে, আমাদের প্রত্যক্ষণের অনুসারী সমস্ত বস্তুর পশ্চাতে একটি বাস্তব জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান।' ('The doctrine of realism asserts that there is a real world of things behind and coresponding to the object of our perception')।*

২.৪.৩ বাস্তববাদের মূলতত্ত্ব (Main Tenets of Realism)

(১) ভাববাদীরা যখন জগৎ ও জগতের বাইরে 'পরম ব্রহ্ম' বা 'পরম সত্তা'-র উপলব্ধির ওপর জোর দেন তখন বাস্তববাদীরা বস্তুজগতের ঘটনা ও বস্তু নিচয়ের অস্তিত্বের ওপর প্রাধান্য দেয়।

---

* "Realism means a belief or theory which looks upon the world as it seems to us to be a mere phenomenon". —Swami Ram Tirtha

(২) ভাববাদীরা যখন বলেন প্রকৃত সত্তার অস্তিত্ব মনের মধ্যে তখন বাস্তববাদীরা বলেন মনের বাইরে অবস্থিত বস্তুজগৎ প্রকৃত জগৎ।

(৩) জড় জগৎ বা বস্তুজগৎ প্রাধান্য পায় বলে বাস্তববাদী দার্শনিক একাধারে জড়বাদী এবং বস্তুবাদী। ভাববাদীরা হলেন অধ্যাত্মবাদী।

(৪) ভাববাদীরা যেখানে মনে করেন অসীম মনের সসীম অংশ হচ্ছে ব্যক্তি মন, তখন বাস্তববাদীরা বলেন মানুষের মন বৃহত্তর যান্ত্রিক জড় জগতের এক যান্ত্রিক ক্ষুদ্র অংশ। তাঁরা মনে করেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

(৫) কৃত্রিম, স্থানুবৎ অকার্যকরী অতীতের ওপর নির্ভর না করে বাস্তববাদীরা বর্তমান ঘটনা প্রবাহ এবং জীবন অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেন এবং মনে করেন কার্যকরী বর্তমানের ওপর নির্ভর করেই মানুষ ভবিষ্যতের পথে সচল থাকবে।

২.৪.৪ বাস্তববাদের প্রকারভেদ (Forms of Realism)

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাস্তববাদ বিভিন্ন রূপে প্রাধান্য পেয়েছিল। মনোবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক, উপযোগিতাবাদ ও ব্যবহারিক প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে বাস্তববাদের এই রূপান্তরগুলি ঘটতে থাকে। আমরা তিন রকমের বাস্তববাদের কথা এখানে বলব।

(১) মানবিক বাস্তববাদ (Humanistic Realism)

মানবিক বাস্তববাদের প্রবক্তা হলেন ইরাসমাস (Erasmus), রাবেলায়িস (Rabelais) এবং জন মিলটন (John Milton)। মানুষের জীবন প্রকৃতি ও চাহিদা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান আহরণ করা মানবিক বাস্তববাদের মূল লক্ষ্য। সাহিত্যকে ভাবা হয়েছিল জীবনের আয়না। সমসাময়িককালে তাই প্রাচীন রোম ও গ্রিস সাহিত্য সম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হবার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ইরাসমাসের মতে শব্দজ্ঞানের তুলনায় বস্তুজ্ঞান বেশি আবশ্যক, কারণ বস্তু জ্ঞান সমাজজীবনে বেশি কাজে লাগে। মানবিক বস্তুবাদ বাচনিক জ্ঞানের (Verbalism) বিরোধিতা করেছে। মানবিক বাস্তববাদ ধীরে ধীরে সামাজিক বাস্তববাদ (Social Realism) ও ইন্দ্রিয়মূলক বাস্তববাদ (Sense Realism)-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকল।

(২) সামাজিক বাস্তববাদ (Social Realism)

মানুষের সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ আবির্ভূত হল সামাজিক বাস্তববাদের। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হল বস্তুর সংস্পর্শে মানুষ এলেই তার শিক্ষা শুরু হয়। এই মতবাদ সামাজিক জীবনে ব্যক্তির অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিল এবং মনে করল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপযোগিতা জীবনে অত্যধিক। মনটেন (Montaigne) বললেন, 'জীবনযাপন নামক মহৎ শিল্পকলা পুস্তকলব্ধ জ্ঞানে পাওয়া যায় না পাওয়া যায় মানুষের মধ্যে বেঁচে থেকে।" ("The best of levit named as that of living is acquired by living and not by learning from books")।

(৩) ইন্দ্রিয় মূলক বা সংবেদন ভিত্তিক বাস্তববাদ (Sense Realism)

বাস্তববাদের গুরুত্বপূর্ণ পরিণত পর্যায় হল ইন্দ্রিয়মূলক বাস্তববাদ। এই তত্ত্ব ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণে (Sense train-

ing)-র ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বলা হয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের জ্ঞানজগতের জানলা (Gate ways of knowledge)। তাই সেগুলি সুস্থ রাখা দরকার এবং পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করতে শেখানো দরকার। সংবেদন, প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে গৃহীত অভিজ্ঞতা সমূহকে পরীক্ষা লব্ধ সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। এই বোধভিত্তিক তত্ত্ব শিক্ষাজগতে তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারার সূচনা করল। উদ্ভব হল সর্বজ্ঞানবাদের (Pansophism)। এর অর্থ হল জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সার্বজনীন জ্ঞানের (Universal knowledge) আয়ত্তীকরণ ও প্রসার (acquisition and dissemination)। নৈসর্গিক বিশ্ব প্রকৃতি এবং এর সূত্র ও নিয়মগুলি শিক্ষার ভিত্তি রচনা করে। জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চালনের পদ্ধতি হল বৈজ্ঞানিক ও আরোহী (Scientific and Inductive)। এই পদ্ধতিতে আমাদের মূর্ত জ্ঞানের মাধ্যমে বিমূর্তে যেতে হয়। বিশেষ থেকে সাম্য (Particular to General) পৌঁছাতে হয়। পর্যবক্ষেণও পরীক্ষ খুব কাজে লাগে।

এই ইন্দ্রিয়মূলক বাস্তববাদের প্রবক্তাদের অন্যতম হলেন, ফ্রান্সিস বেকন (Fancis Bacon), ডেকার্তে (Descartes), মুলকাসটার, র‍্যাটকে (Ratke), কমেনিয়াস (Comenius) প্রমুখ।

২.৪.৫ শিক্ষায় বাস্তববাদের প্রভাব (Influence of Realism on Education)

শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় কীভাবে বাস্তববাদ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নীচে দেওয়া হল।

২.৪.৫.১ বাস্তববাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Realism and Aims of Education)

বাস্তববাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য মানুষকে তত্ত্বজ্ঞানে পণ্ডিত করে তোলা নয়, বস্তু জগতের জ্ঞান সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ করে গড়ে তোলা। শিক্ষা মানুষকে প্রত্যক্ষ জীবন যাত্রায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলবে।

এছাড়াও এই দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শারীরিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক দিক দিয়ে এক সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা।

২.৪.৫.২ বাস্তববাদ ও পাঠক্রম (Realism and curriculum)

সার্বিক মানুষ গড়ে তোলার জন্য পাঠক্রমে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজন আছে এরকম বহুবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বাস্তববাদীরা পাঠক্রমে বাস্তবে কার্যকরী বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক বিষয়পাঠকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শারীর শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর সঙ্গে গণিত, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, আইন গুরুত্ব পেল। বলা হল শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

২.৪.৫.৩ বাস্তববাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি (Realism and Methods of teaching)

বাস্তববাদীরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেন—

(ক) আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method)।

(খ) সমন্বয়ী পদ্ধতি (Corelation Method)।

(গ) পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতি (Observation and Experementation)।

(ঘ) দৃষ্টি-শ্রুতি সহায়ক উপকরণের সাহায্যে শিক্ষণ (Teaching by using Audiovisual aids)।

(ঙ) বিভিন্ন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে যথা 'সহজ থেকে জটিল', 'মূর্ত থেকে বিমূর্তে', 'বিশেষ থেকে সামান্যে'।

(চ) পুনরাবৃত্তির ওপর জোর দেওয়া।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান।

(জ) সহশিক্ষামূলক কার্যকলাপ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাদান।

(ঝ) ইন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষাদান।

২.৪.৫.৪ বাস্তববাদ ও শৃঙ্খলা (Realism and Discipline)

বাস্তববাদীরা শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এঁরা মনে করেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারিত নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। বিশ্বপ্রকৃতি যেমন নির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে তার অংশবিশেষ হয়ে ব্যক্তিকেও নিয়মের অধীনে থাকতে হবে।

তবে বাস্তববাদীরা শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শাস্তিদান প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা চান শিক্ষার্থীদের উন্নত পরিবেশ সরবরাহ করার পর তার নিয়মনীতি মানা করে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শৃঙ্খলিত হোক।

২.৪.৫.৫ বাস্তববাদ ও শিক্ষক (Realism and the Teacher)

বাস্তববাদীরা শিক্ষকের গুরুত্ব নেই এ কথা মনে করেন না আবার শিক্ষককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ারও পক্ষপাতী নন। এঁদের মতে শিক্ষকরা ঘটনা ও বিষয়সমূহ বাস্তবভাবে তুলে ধরবেন। নিজেরা কিছু যোগ করে, বিকৃতভাবে নয়। শিক্ষার্থীরা যাতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করতে পারে তার বাস্তব পরিবেশ শিক্ষক রচনা করে দেবেন। সঠিক দিকটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে যাতে হাজির হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

২.৫ মার্কসবাদ (Marxism)

২.৫.১ মার্কসবাদ কী? (What is Marxism?)

এক কথায় এর জবাব দেওয়া মুশকিল। V.I. Lenin কে অনুসরণ করে বলা যায় যে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষামালাই হল মার্কসবাদ ("Marxism is the System of the views and teachng of Marx"—Lenin)। জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস তাঁর জীবনে যে অতিবৃহৎ কর্মকাণ্ডের অবতারণা করেন এবং যে অনন্য সাধারণ চিন্তা ও কর্মধারা প্রবর্তন করেন, তা-ই মার্কসবাদ নামে পরিচিত।

এমিল বার্নস বলেছেন, "মার্কসবাদ হল আমাদের এই জগৎ এবং তারই অংশ মানবসমাজ সম্পর্কে সাধারণতত্ত্ব। এর নামকরণ করা হয়েছে কার্ল মার্কসের নামানুসারে।" মার্কসবাদ হল একটি সঠিক সমাজদর্শন, একটি সামগ্রিক চিন্তাধারা। মার্কসবাদ হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এটি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও একটি সামগ্রিক তত্ত্বচিন্তা। যে কোনো জ্ঞান শৃঙ্খলাতেই এর প্রয়োগ সম্ভব। একে পৃথকভাবে কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতি বা ইতিহাস বা দর্শনের তত্ত্ব বলা যায় না। আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিসরে অবশ্য আমরা মার্কসবাদকে দর্শনতত্ত্ব হিসাবে আলোচনা করব এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা করব।

এমিল বার্নস বলেছেন ঃ "মার্কসবাদ স্বীকৃতি দাবি করে সত্য হিসাবে, কোন বিমূর্ত নৈতিক সত্যের উপর প্রতিবিম্বিত বলে নয়।" মার্কসবাদ বস্তুগত অস্তিত্বের উপর জোর দেয়। তাই মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক নীতিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয়। মার্কস বলেছেন ঃ 'সত্তাই চেতনাকে নির্ধারিত করে; চেতনা সত্তাকে নির্ধারিত করে না' ("Being determines consciousness, not the other way round")।

মার্কসের মতে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান। দ্বান্দ্বিকতার অর্থ হল দু'টি বিরোধী শক্তির মধ্যে অনবরত সংঘাত ও মিলনের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রতিটি বিষয়ের চরিত্র প্রকাশ পায়। মার্কসবাদ অস্তিত্ব সম্পর্কিত দ্বান্দ্বিক বিচারকে সার্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে। মানুষ ও জড় পদার্থ নির্বিশেষে সর্বত্রে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নিয়মগুলিকে ভিত্তি করে মার্কসীয় দর্শন তথা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। মার্কসীয় তত্ত্ব তথা চিন্তাধারা তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলি হল জার্মান দর্শন তথা হেগেলীয় ভাববাদ, ইংরেজদের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ও ফরাসি সমাজতন্ত্র। অবশ্যই এই দর্শনতত্ত্বে ভাববাদ ও প্রয়োগবাদের থেকে কিছু বিভিন্নতা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রয়োগ এবং অন্য দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে বিভিন্নতা আলোচনার আগে আরা সংক্ষেপে মার্কসবাদের মূলবিষয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করে নেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ঃ— মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম মূল বিষয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism)

দ্বন্দ্বে (Dialectic)-র ধারণা মার্কস গ্রহণ করেছিলেন। জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেলকে অনুসরণ করে। হেগেলীয় দর্শন অনুসারে এক মহাভাব বা চৈতন্যের দ্বান্দ্বিক বিকাশের ফল হিসাবে পার্থিব জগৎ ও জীবনের সতত পরিবর্তনশীল বিভিন্ন রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। মার্কস্ এই ভাবের সত্যতাকে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন আমার দ্বন্দ্বভাবনা হেগেলীয় দ্বন্দ্বের বিপরীত' (My dialectic is opposite of Hegels)। মার্কসীয় মতে বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া ভাবের ধারণা কল্পনা বিলাস (utopia)। প্রকৃত বস্তুজগতের রূপটি মনের মধ্যে প্রতিফলিত হলেই তা ধারণায় রূপ পায়। মনের ভাবনা এই বস্তু জগৎকে সৃষ্টি করতে পারে না। পরন্তু বস্তু জগৎই এই ভাবনা সৃষ্টি করে। লেনিনের মতে "বস্তুর মধ্যে অবস্থিত প্রকৃতিগত অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের আলোচনাই হল দ্বান্দ্বিকতা" ("In its proper meaning dialectics are the studies of contradiction within the very essence of things")।

হেগেল বলেছিলেন, বিকাশের প্রক্রিয়ায় পূর্ব ধারণা (idea) বা বাদ (Thesis)কে অস্বীকৃতির মাধ্যমে এর বিপরীত ধারণা বা 'প্রতিবাদ' (antithesis) এর সৃষ্টি হয়। 'বাদ' ও 'প্রতিবাদে'-র দ্বন্দ্বে যা সৃষ্টি হয় তা হল সম্বাদ (Synthesis)। এই সম্বাদ আবার নতুন ধারণা (thesis) রূপে আবির্ভূত হয়ে আবার পরিবর্তিত হতে থাকে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের ইতিহাস ঃ কার্ল মার্কস ইতিহাসের গতিপথকে চিন্তা চেতনা বা ভাবনার দ্বন্দ্বের বিকাশের পরিণতি হিসাবে মনে না করে বস্তুগত দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। মার্কস্ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে ইতিহাসের গতি যখন ব্যাখ্যা করলেন তখন তা হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সমাজবিকাশের গতিপথে উৎপাদনের মালিকানা আছে এরকম শ্রেণিকে (বাদ)-এর বিপরীত শ্রেণি যার হাতে মালিকানা নেই (প্রতিবাদ) তার দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণির বিরোধ থাকে। দুই শ্রেণির দ্বন্দ্বে সৃষ্টি হয় সমাজবাদের (সম্বাদ)। এ হল অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি। Care Hunt বলেছেন, ''The Synthesis negates the antithesis—The first negation— and is thus the negation of the negation''.

মার্কসই প্রথম মনে করলেন মানুষের চিন্তা নয়, জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজ পরিবর্তনের মূলে বর্তমান। Carew Hunt বললেন "মানুষকে চিন্তা করার আগেও বেঁচে থাকতে হয়।" সমাজপরিবর্তনের ইতিহাস শ্রেণিদ্বন্দ্বের ইতিহাস। সমাজগঠনের ইতিহাসে পরটি পর্যায় পাওয়া যায়। (ক) আদিম সাম্যবাদী সমাজ (খ) দাস সমাজ (গ) সামন্ততান্ত্রিক (ঘ) ধনতান্ত্রিক সমাজ।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণি ব্যবস্থা ছিল না। মানুষ খাদ্য প্রকৃতি থেকে আহরণ করত, যাযাবরের জীবন যাপন করত। পরবর্তীকালে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের প্রয়োজনে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হল তখন পুঁজির ধারণা এল। শ্রম বিভাগের সৃষ্টি হল। সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষকে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হতে হল। অল্প সংখ্যক কিছু ব্যক্তি হল পরশ্রমভোগী মালিক শ্রেণি। এইভাবে দাসমালিক, সামন্তপ্রভু, বুর্জোয়া শ্রেণি দাস, সামন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রভুত্ব করতে থাকল। একইভাবে দাস, ভূমিদাস, এবং সর্বহারা শ্রেণি হল শোষিত শ্রেণি। শ্রেণিদ্বন্দ্বকে সংযত করতে রাষ্ট্রকাঠামোর সৃষ্টি হলেও তা শ্রমভোগী মালিকশ্রেণির প্রতিই বেশি আনুগত্য প্রদর্শন করল। মার্কসের মতবাদ অনুযায়ী সব ঐতিহাসিক পরিবর্তন, উৎপাদনের উপায় পরিবর্তনের ফলে সূচিত হয়। উৎপাদন কৌশল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই রাজনৈতিক, আইনি, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক উপরি কাঠামো গড়ে ওঠে। ভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান অথবা ক্ষীয়মান হয়ে পরস্পর বিরোধী দুটি মুখ্যশ্রেণির সৃষ্টি হয়। তাই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বলে "সমাজের ইতিহাস শ্রেণিদ্বন্দ্বের ইতিহাস" (History of all hither to existing society is the history of class struggle)। শ্রেণি দ্বন্দ্ব শেষ হলে তৈরি হবে শ্রেণিহীন সমাজ। এই তত্ত্বের লক্ষ্য হল সর্বহারার এক নায়কত্বে শ্রেণিহীন সমাজ (Classless Society) এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialistic Democracy)। মানুষ সমাজে যোগ্য মর্যাদা পাবে। সাম্য, স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব জয়ী হবে।

২.৫.২ মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব (Main Texets of Marxism)

দর্শন হিসাবে মার্কসবাদের মূল বক্তব্যগুলি এইভাবে সাজানো যায়।

(১) বস্তু প্রধান, মন বা চিন্তা অপ্রধান।

(২) মস্তিষ্ক মানুষের সমস্ত ইচ্ছার আজ্ঞাবাহী যন্ত্ররূপে কাজ করে।

(৩) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, মূর্তপ্রতীক (Imagery) এবং প্রতিহত ক্রিয়া (Reflex) এগুলি শারীরিক ক্রিয়া বিধায় বস্তুগত।

(৪) প্রত্যেকটি বিকাশের ধারায় আছে বৈপরীত্য এবং বা অন্তর্নিহিত। পরস্পর বিপরীতের সংঘাতে সৃষ্টি হয় সমন্বয়। এই ক্রিয়াকেই বলে দ্বান্দ্বিকতা (Dialectics)।

(৫) কোথায়ও কিছু থেমে নেই, নিত্যনতুন পটভূমি পরিবর্তিত হচ্ছে।

(৬) মানুষের ইতিহাসে পরিবর্তন নির্ভর করে উৎপাদনের প্রকৃতির ওপর। উৎপাদনের এই প্রকৃতি সমাজ কাঠামো তৈরি করে।

(৭) সমাজকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে হবে।

(৮) প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের সম্পদ।

(৯) সমাজ বা রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য; কতিপয় মানুষের ভোগের জন্য নয়। শোষণহীন সমাজই কাম্য।

২.৫.৩ মার্কসবাদ ও ভাববাদ ঃ বিভিন্নতা (Marxism and Idealism : Differency)

মার্কসবাদের প্রাথমিক ধারণার উৎস হেগেলীয় ভাববাদ হলেও ভাববাদ ও মার্কসবাদে বহুলাংশে বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

প্রথমত, ভাববাদে একটি বিমূর্ত বিশ্বজনীন পরম ভাবনা (abstract, Universal and Absolute Idea)-র ধারণা স্বীকৃত। চেতনা প্রাথমিক সত্য। বস্তু অপ্রধান। মার্কসবাদী ভাবনায় বস্তুই আসল, চেতনা বস্তুর প্রতিফলন। মস্তিষ্ক একটি দেহযন্ত্র যার মাধ্যমে বিশ্বজগৎ প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত, ভাববাদে সত্যকে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, সার্বজনীন বলে মনে করা হয়। মার্কসীয় দর্শনে অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধ বা সত্য বলে কিছু নেই। সবই গতিশীল পবিরর্তন সাপেক্ষ।

তৃতীয়ত, ভাববাদে বস্তুর সারসত্য জ্ঞানের অগম্য। মার্কসবাদে এই ধরনের বস্তুর সারসত্য বলে অজ্ঞেয় কিছু নেই।

চতুর্থত, ভাববাদে মন ও দেহের পৃথক অস্তিত্ব বর্তমান। মার্কসবাদে মন ও দেহ পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

পঞ্চমত, ভাববাদীরা মনে করেন প্রকৃতির বিকাশের প্রক্রিয়া অন্ধ, আকস্মিক। মার্কসবাদীরা মনে করেন প্রকৃতি কখনও অন্ধ নয় এবং এর বিকাশ প্রক্রিয়া কতকগুলি ক্রম প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। সেই ক্রম প্রক্রিয়াগুলি হল ইতিবাচক বাদ (thesis), নেতিবাচক-প্রতিবাদ (antithesis) এবং দুটির সমন্বিত প্রক্রিয়া সম্বাদ (Synthesis)।

ষষ্ঠত, ভাববাদে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা প্রাধান্য পেয়েছে। মার্কসবাদে মনে করা হয়েছে মানুষ দেহ মন বিশিষ্ট একটি সত্তা।

২.৫.৪ মার্কসবাদ ও প্রয়োগবাদ : বিভিন্নতা (Marxism and Praginatism : Defference)

মার্কসবাদ ব্যক্তির সীমাহীন কর্মক্ষমতা এবং সকলের সাধারণ স্বার্থে পাহাড়ের মতো অনড় সামাজিক বন্ধনের ওপর জোর দেয়। এই তত্ত্ব ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত এক নতুন নৈতিক শক্তির ওপর প্রাধান্য দেয় যা শ্রমকে মর্যাদা দিয়ে ব্যক্তির ঐক্য থেকে সামাজিক ঐক্যে উত্তরণ ঘটায়। রাজনৈতিক ভাবে গঠিত রাষ্ট্রের (Political State) গণতান্ত্রিক দর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রয়োগবাদ যখন ব্যক্তির উপর বিশ্বাসের ভান করে তখন তাদের কতকগুলি শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে চায়। মার্কসবাদ মানুষকে কাজের মূল্যের ওপর গুরুত্ব শিখিয়ে নিজস্ব বন্ধনে বেঁধে রাখে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

প্রয়োগবাদে মানুষের চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী জীবনের ও শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনশীল। অন্য দিকে মার্কসবাদ একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌছাতে চায়।

মার্কসবাদ ব্যক্তির কাছে জীবনের এক নতুন অর্থ তুলে ধরে। তা হচ্ছে সকলে মিলে বস্তুজগতে একত্রে সমান সুখে বেঁচে থাকা। অন্যদিকে প্রয়োগবাদ মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখেও বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণহীন মানুষ 'রাজনৈতিক ক্ষমতার অরক্ষিত আধার' (Unsaferepository of political power)। প্রয়োগবাদী দর্শন যে গণতন্ত্রের কথা বলে তাতে বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা আছে। সেজন্য এক দলের কাছে যা গ্রহণীয় অপর কোনো দলের কাছে তা বিকাশের প্রতিকূল বলে মনে হতেই পারে। সেজন্য মানুষে মানুষে চিন্তার ও স্বাধীনতাবোধে দূরত্ব কমার চেয়ে বেড়ে যাবার দিকে যেতে থাকে।

মার্কসবাদ যখন সামাজিক সাম্য এবং ব্যক্তির জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর কথা জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করে তখন প্রয়োগবাদ সে লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়।

যতক্ষণ না এই মনোভাব অর্জিত হয় যে জাতি, ধর্ম, শ্রেণি, বর্ণ, বিত্তশালী, অসচ্ছল নির্বিশেষে সকলে সম কাজে সমান মর্যাদা পাবে এবং সকলে সম শিক্ষা পাবে এবং এক্ষেত্রে কোনো শ্রেণির কোনো পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে না ততক্ষণ সাম্যের মনোভাব আসবে না। মার্কসবাদ এই সাম্যের মনোভাবের কথা বলে। অন্য দিকে প্রয়োগবাদী দর্শন অনুযায়ী গণতন্ত্রে সামাজিক মতের গহ্বরে আটকে পড়ে সাম্যের ধারণা টুকরো টুকরো হতে থাকে। মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার চাহিদায়—এখানে অস্বচ্ছল পরিবারের মানুষের সঙ্গে বিত্তবান পরিবারের মানুষের চাহিদায় ফারাক থাকে।

২.৫.৫ শিক্ষায় মার্কসবাদের প্রভাব (Influence of Marxism on Education)

শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় কীভাবে মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নীচে আলোচনা করা হল।

২.৫.৫.১ মার্কসবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Marxism and The Aims of Education)

মার্কসবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে শেখানো যাতে

তার সামাজিক চরিত্র নষ্ট না হয় এবং সে শ্রেণিহীন, শোষণমুক্ত একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সাহায্য করতে পারে। সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব হবে সমাজের পক্ষে আবশ্যিক শর্তাবলি। শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজের অংশ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া। শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষকে নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে সামাজিক মনস্ক করে গড়ে তোলা এবং বিশ্বনাগরিকত্ব মুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

২.৫.৫.২ মার্কসবাদ ও পাঠক্রম (Marxism and Curriculum)

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সামাজিক বিকাশের জন্য পাঠক্রম হবে তাত্ত্বিক ও শারীরিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। পাঠক্রমে বৌদ্ধিক, শারীরিক, কারিগরি বিষয়মসূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তত্ত্ব ও বাস্তব সমন্বিত হবে যাতে ব্যক্তি নিজেকে সমাজবিচ্ছিন্ন না ভেবে সমাজ সম্পর্কিত এক অংশ হিসাবে ভাবে। এজন্য শিক্ষার্থী থাকাকালীন সামাজিক উৎপাদনী কর্মকাণ্ডে তাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। মার্কসীয় শিক্ষাভাবনায় উৎকৃষ্ট সাধারণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাদ দেওয়া হয়নি। মনে করা হয়েছে উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বোধ নানা ধরনের শিল্প শিক্ষার উন্নয়নে সাহায্য করবে। ব্যক্তির অবসর বিনোদনের শিক্ষা হিসাবে নানা সূক্ষ্ম শিল্পকলা, চারুকলাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

২.৫.৫.৩ মার্কসবাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি (Marxism and the Method of Teaching)

মার্কসবাদ অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ধরা বাঁধা নিয়মে তথ্যবিতরণ জায়গা পাবে না। শিক্ষার্থী তার সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। নিজস্ব শারীরিক মানসিক প্রবণতা দিয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জানবে। পদ্ধতি ঘরে মনোবিজ্ঞান নির্ভর, বৈজ্ঞানিক এবং স্বাধীন উদ্দীপক, জ্ঞানের তৃষ্ণা বর্ধক। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর কর্মপ্রচেষ্টা ও সৃজনশীল ক্ষমতা উৎসাহ পাবে।

২.৫.৫.৪ মার্কসবাদ ও শৃঙ্খলা (Marxism and Discipline)

মার্কসীয় দর্শনে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার নতুন ধারণা পাই। এখানে নৈতিকতা আধ্যাত্মিক ভাবনায় অর্জনের ফল নয়। নৈতিকতা এখানে সমাজ চিন্তা বা সচেতনতায় শ্রমের মর্যাদা ও মানুষের মূল্য উপলব্ধিতে অজির্ত হয়। শ্রমের মূল্যে সকল মানুষ সমান এই ধারণাবোধে মানুষ উদ্দীপ্ত হয়। মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমমালিকানা, দেশাত্মবোধ এবং তার উত্তরণে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সমবোধ মানুষের সৌন্দর্যভাবনাকেও দেশকালের ভিত্তিতে গড়ে তুলে। মানুষ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আত্মকর্ম প্রবণতায় উদ্দীপ্ত হলে শৃঙ্খলা আপনা আপনি অর্জিত হয়।

২.৫.৫.৫ মার্কসবাদ ও শিক্ষক (Marxism and The Teacher) :

মার্কসবাদ অনুযায়ী শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত, মনস্তত্ব, নির্ভর, উৎপাদনধর্মী এবং সবই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁরা তাদের উৎসাহ দেবেন। ইতি, নেতি ও ছুটির সমন্বয়ে শিক্ষা

কীভাবে শ্রেণি সংগ্রাম থেকে উত্তরণের পক্ষ নির্ধারণ করবে তা বুঝতে সাহায্য করবেন। শিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং প্রয়াসী হবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

২.৬ অনুশীলনী

১। ভাববাদ কী? শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও শিক্ষকের ধারণা কীভাবে ভাববাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়?

২। প্রকৃতিবাদ কাকে বলে? প্রকৃতিবাদের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

৩। শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে কীভাবে প্রকৃতিবাদ প্রভাবিত করে?—আলোচনা করো।

৪। প্রয়োগবাদ কাকে বলে? প্রয়োগবাদের মূলতত্ত্ব আলোচনা করো।

৫। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও শিক্ষকের ধারণা কীভাবে প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়—আলোচনা করো।

৬। বাস্তববাদের অর্থ কী? বাস্তববাদের প্রকার ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। বাস্তববাদের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে কী জান? শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে কীভাবে বাস্তববাদ প্রভাবিত করে—আলোচনা করো।

৮। দর্শন হিসাবে মার্কস্‌বাদের সংজ্ঞা দাও। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও শ্রেণিসংগ্রামে তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯। মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব কী? মার্কসবাদী দর্শন দ্বারা শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম পাঠদান পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলার ধারণা কীভাবে প্রভাবিত হয় আলোচনা করো।

১০। টীকা লেখো :

(ক) ভাববাদের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য (Proposition)।

(খ) ভাববাদ ও শিক্ষক।

(গ) বস্তুজাগতিক প্রকৃতিবাদ ও জৈবিক প্রকৃতিবাদ।

(ঘ) প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য।

(ঙ) প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি।

(চ) প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম।

(ছ) বাস্তববাদের প্রকার ভেদ।

(জ) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

(ঝ) শিক্ষায় মার্কস্‌বাদের প্রভাব।

১১। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) ভাববাদ অনুযায়ী শৃঙ্খলার ধারণা কী?

(খ) ভাববাদ অনুযায়ী শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

(গ) প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী শৃঙ্খলার ধারণা কী হওয়া উচিত?

(ঘ) শিক্ষায় প্রকল্পপদ্ধতি (project method) সম্পর্কে আলোচনা করো।

(ঙ) 'সংবেদনভিত্তিক বাস্তববাদ' সম্পর্কে আলোচনা করো।

(চ) মার্কসবাদ ও ভাববাদের পার্থক্য সম্পর্কে কী জান?

(ছ) মার্কসবাদ ও প্রয়োগবাদের বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

(জ) প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী পাঠক্রম কী হওয়া উচিত আলোচনা করো।

১২। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(ক) হেগেল ছিলেন— প্রকৃতিবাদী দার্শনিক / ভাববাদী দার্শনিক / বাস্তববাদী দার্শনিক।

(খ) লামার্ক (La Marcke) ছিলেন— প্রকৃতিবাদী দার্শনিক/মার্কসবাদী দার্শনিক / প্রয়োগবাদী দার্শনিক।

(গ) রুশো (Rousseau) ছিলেন— প্রয়োগবাদী দার্শনিক / ভাববাদী দার্শনিক / প্রকৃতিবাদী দার্শনিক।

(ঘ) 'নেতিবাচক শিক্ষা' (Negative Education)-র কথা বলেন—জেটাইল/অ্যারিষ্টটল/রুশো/ হেগেল।

(ঙ) 'প্রাকৃতিক ফলাফলের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা'র কথা বলেন—লেনিন/বিবেকানন্দ/প্লেটো/রুশো।

(চ) 'মুক্ত শৃঙ্খলা'র ধারণা দেয়—প্রকৃতিবাদ / প্রয়োগবাদ / ভাববাদ।

(ছ) মনে করা হয় প্রয়োগবাদের প্রবক্তা—চার্লস্ পিয়ার্স / বুদ্ধদেব / হার্বার্ট স্পেনসার / ফ্রয়েবল।

(জ) র‍্যাটকে (Ratke) ছিলেন— প্রকৃতিবাদী দার্শনিক / প্রয়োগবাদী দার্শনিক / বাস্তববাদী দার্শনিক।

(ঝ) শিক্ষাদানের প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method) হল—প্রকৃতিবাদী পদ্ধতি / বাস্তববাদী পদ্ধতি / প্রয়োগবাদী পদ্ধতি।

(ঞ) দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—ভাববাদের/মার্কসবাদের/প্রকৃতিবাদের/প্রয়োগবাদের/— মূলতত্ত্ব।

একক ৩ □ প্রাচ্য দর্শনের শাখাসমূহ (Oriental Schools of Philosophy)

গঠন

৩.১ সমসাময়িক প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

৩.২ ব্রাহ্মণ্য দর্শন

- ৩.২.১ বেদ
- ৩.২.২ সমাজে শ্রেণিভেদ
- ৩.২.৩ ঋষি ও পুরোহিত
- ৩.২.৪ বহুদেববাদ
- ৩.২.৫ উপনিষদ
- ৩.২.৬ বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী শাখা
- ৩.২.৭ পরা ও অপরা বিদ্যা

৩.৩ অবৈদিক দর্শন

- ৩.৩.১ চার্বাক দর্শন
- ৩.৩.২ জৈন দর্শন

৩.৪ অবৈদিক বৌদ্ধদর্শন

- ৩.৪.১ চারটি আর্যসত্য
- ৩.৪.২ অনিত্যবাদ ও অনাত্মবাদ
- ৩.৪.৩ বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব
- ৩.৪.৪ বৌদ্ধদর্শনের শাখা

৩.৫ ব্রাহ্মণ্যদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের তুলনা

৩.৬ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা

৩.৭ ইসলামি দর্শন

- ৩.৭.১ ইসলামি দর্শনের লক্ষ্য
- ৩.৭.২ ইসলামি দর্শন ও শিক্ষা

৩.৮ পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা

৩.৯ অনুশীলনী

৩.১ সমসাময়িক প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Contemporary Ancient Indian Philosophy)

প্রাচ্য দর্শন বলতে মূলত ভারতীয় দর্শনের যথা ব্রাম্বণ্য দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং ইসলামি দর্শন আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত দর্শন বিষয়সমূহ আলোচনা করার আগে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও তার ক্রমবিকাশই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ইউরোপে যখন আমরা দেখি চিন্তাবিদ দার্শনিকগণ একের পর এক এসেছেন অত্যন্ত জোরালোভাবে নতুন নতুন দর্শন নিয়ে এবং প্রয়াজনে পূর্বসূরিদের প্রাচীন অকেজো চিন্তাকে সমসাময়িকতার নিরিখে অস্বীকার করে— তখন ভারতে পরবর্তীকালের দার্শনিকগণ মূলগতভাবে কোনো নতুন দর্শনের কথা বলতে পারেন নি। নতুন চিন্তাপ্রক্রিয়ার কথা ভাবনার আগে পূর্ব সৃষ্ট দর্শনের যুক্তিকে নতুন আঙ্গিকে ভেবেছেন মূলগত ভাবনাকে অস্বীকার করে নেয়। বরং সেই ভাবনাকে সমসাময়িক জীবনে কীভাবে কাজে লাগান যায় সেই যুক্তিতে জোরালো করেছেন। এতে করে দর্শনের বিকল্প যে সব শাখার (Alternative Philosophics) সৃষ্টি হয়েছে তার 'রকমগুলো থেকে গেছে একই' ('The types remained the same'—Dasgupta S. N. A History of Indian Philosophy)। নতুন কোনো চিন্তা সৃজন করতে গিয়েও দেখা হয়েছে পূর্বতন চিন্তার কাঠামোগুলিকে কতটা অবিকৃত রাখা যায়। সার্বিকভাবে পরিস্থিতিতে যেন এক বুদ্ধির জড়তা লক্ষ্য করা যায়" ("The situation as a whole is also indicative of some mind of ideological stagnation")।

এর কারণ হয়তো এই যে কয়েক শতক ধরে ভারতবর্ষে উৎপাদন শৈলীতে দৃশ্যত কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি যা মানুষের প্রয়োজন হয় পরিবর্তনশীল পার্থিব পরিস্থিতির জন্য। এই পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে মানুষের জীবন ও তার লক্ষ্য সম্পর্কে নতুন কিছু ভাবনা ও ধারণা সৃষ্টিতে দার্শনিকদের উৎসাহিত করতে পারল না। বিশ্বজগৎ এবং তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তন বোঝার নতুন সম্ভাবনা বাধাপ্রাপ্ত হল। মানুষের জীবনযাত্রার মূলগত কোন পরিবর্তন হল না। ভাগ্যও থাকল অপরিবর্তিত। মনে করা হল জন্ম অনুযায়ীই মানুষের শ্রেণি, তার ভাগ্য ও কর্ম নির্ধারিত হয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে দর্শনের কার্যকলাপ কতকগুলি প্রাচীন চিন্তাভাবনার কাঠামোতেই আবর্তিত হতে থাকল যা পরবর্তী দার্শনিকগণ একেবারে অস্বীকার করতে পারলেন না।

অপরদিকে মনে রাখতে হবে প্রাচীন মুনি ঋষি, শাস্ত্রবেত্তা নিয়ামকগণ সব সময়ই চেষ্টা করেছেন এমন কতকগুলি পদ্ধতি আবেগ করতে যা দার্শনিকদের পুরাতন তন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক নতুন সম্ভাবনাময় যুক্তিপূর্ণ মনোভাব, চিন্তা চেতনার বিকাশে সবলে বাধা দিতে পারে। একটি উদাহরণ দিতে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে। ভারতীয় মুনি ঋষি শাস্ত্র বেত্তা গণের অন্যতম মনু বললেন 'বেদকে বলে 'শ্রুতি' এবং ধর্মশাস্ত্র (ধর্মীয় নিয়ম বিধি) হল 'স্মৃতি'। যে কোনোভাবে এ দুটিকে মীমাংসা (যুক্তি, বিচার প্রয়োগ)র বাইরে রাখতে হবে। .... 'দ্বিজ' (যারা উচ্চবর্ণের) যারা 'যুক্তি' (হেতুশাস্ত্র)র সাহায্যে এ দুটিকে অমান্য করতে চায়, তাদের সৎসমাজ থেকে বার করে

দেওয়া উচিত। কারণ যারা বেদকে কালিমালিপ্ত করে তারা ধর্ম বিদ্বেষী' ('The Vedas are called 'Sruti' and the Dharma Sastras (Lawcodes) the 'Smriti'; the two are beyond the purview of mimamsa (application of reason) in every respect .... The Duija (literally, the twice-born, i.e. the person belonging to the higher caste) who disobeys these two on the strength of logic (hetusastra) should be driven out of good society because one who vilifies the Veda is a heretic' (Manusmriti).

একমাত্র লোকায়ত দর্শনের প্রবক্তারা যাদের বাস্তববাদী দার্শনিক (Materialist) বলা যায়, তাঁরা এই প্রাচীন দর্শনের ব্যতিক্রমী ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে যথার্থ জ্ঞানের উৎস হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করা। তাঁরা মানুষের ওপর আধ্যাত্মিক কোন কর্তৃত্বকে স্বীকার করেন নি এবং অন্যের কুসংস্কার মূলক মতবাদকে অস্বীকার করেছেন। তবে যাই হোক অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকই তাঁদের পূর্বসূরীগণের বিশ্বাসের জগতকে বাধা দিতে আগ্রহী ছিলেন না।

সাধারণভাবে বলা হয় ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিক নিরাকার। শুধু একথা বললে বোঝায় এই দর্শন অতি মানবীয় পর জাগতিক (other worldly) মূল্যবোধের কথা বলে। এটা সত্য যে ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তবে একেবারেই মানুষকে, পার্থিব জগতকে প্রকৃতিকে এবং তার বিভিন্ন রূপ এবং শক্তিকে অস্বীকার করে নয়। ভারতীয় সমসাময়িক চিন্তাবিদগণ মনে করেন আধ্যাত্মিক বোধের জাগরণ শূন্যস্থানে সম্পন্ন হয় না। এর জন্য রহস্যময় প্রকৃতিকে প্রত্যখ্যান করাও যায় না বরং তার শক্তিকে বুঝে সম্পূর্ণতা দান করে এই বোধের জাগরণ সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিক তাই প্রকৃতির কতকগুলি পূণ্যময় শক্তি (holy powers)কে আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হন। এটা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ আত্ম উন্নয়নের মাধ্যমে নিজের মধ্যে এই শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে। একবার উপলব্ধিতে এলে এই প্রাকৃতিক শক্তিকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগান যায়। প্রকৃতি ও নিজের আত্মশক্তির উন্নয়ন—এই উভয় বিষয় সম্পন্ন হয় ধ্যানমূলক অনুমান (Meditative speculation) এর মাধ্যমে। তবেই অধ্যাত্ম জগতকে সংস্পর্শ করা যায়। তাই 'ভারতীয় দর্শন' ধ্যানমূলক কথাটি বলা বেশি যুক্তিযুক্ত এই কারণে যে এটি 'আধ্যাত্মিক' এই কথাটিকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।' ('The word 'meditative' is more comprehensive than the word 'spiritual', because it incorporates in it even the word 'spiritual')। এই ধ্যানমূলক উপলব্ধি এবং পরবর্তীকালের সমসাময়িক দর্শনের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। ব্রিটিশ দর্শনের মূল যখন অভিজ্ঞতা (experience), আমেরিকান দর্শনের মেরুদণ্ড যেখানে প্রয়োগবাদী চিন্তাভাবনা (pragmatic considerations), ফরাসি দর্শন যখন যুক্তিবাদী (rationalistic), আর জার্মান দর্শন অনুমানভিত্তিক (speculatie), ভারতীয় দর্শন তখন অবশ্যই ধ্যানমূলক উপলব্ধি (Meditative) সঞ্জাত।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন দুঃখ কষ্টময় জীবন থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজতে গড়ে উঠেছিল। ধর্মভিত্তিক দর্শনের লক্ষ্য ছিল জীবনের দুঃখকষ্ট থেকে উত্তরণ। ভারতীয় দার্শনিকগণ মনে করেন দুঃখ আছে, তার থেকে মুক্তিও আছে। তথাপি দর্শনের বিভিন্ন শাখা সমস্যা থেকে মুক্তির বিভিন্ন পথের সন্ধান ছিল। প্রত্যেক দার্শনিক, জীবনের মানে কী, উদ্দেশ্য কী, নিজের মত করে ব্যাখ্যা করলেন। আধ্যাত্মিক বিকাশকেই জীবনের লক্ষ্যে পৌছাতে হাতিয়ার

করলেন। ভারতীয় চিন্তানায়কদের কেউ কেউ মনে করলেন দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করেই মানুষ মানবিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে।

৩.২ ব্রাহ্মণ্যদর্শন

প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য দর্শনের সূত্রপাত হয় প্রকৃতি পূজার মধ্য দিয়ে। কারণ মানুষের জীবন ছিল প্রকৃতি নির্ভর। রহস্যময় প্রকৃতির কার্য কারণ সম্পর্ক উপলব্ধি না করতে পেরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগে ঐশ্বরিক শক্তির অংশ বলে মনে করা হত। এই দেবদেবীরা হলেন ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি।

৩.২.১ বেদ

বেদের সূচনা খ্রিঃ পূঃ ২০০০ অব্দে। বেদের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান (orally transmitted) হয়। শুনে এগুলি শিখতে হত বলে একে বলা হত 'শ্রুতি'। বেদের প্রধান শাখা দুটি একটি পদ্যময় ছন্দে রচিত যার নাম মন্ত্র (Mantra)। দ্বিতীয়টি অনেক পরে গদ্যে রচিত যার নাম হল 'ব্রাহ্মণ' (Brahamana)। মন্ত্রের চারটি ভাগ 'সংহিতা' (Samhitas) বলে পরিচিত যেমন 'ঋকবেদ সংহিতা', 'সামবেদ সংহিতা', 'যজুসর্বদ সংহিতা' এবং 'অথর্ববেদ সংহিতা'। সংক্ষেপে এগুলিকে ঋকবেদ, সামবেদ ইত্যাদি বলা হয়। দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ঋকমন্ত্রের সংকলন হল ঋকবেদ। বিশেষজ্ঞরা হলেন 'হোতা'! সংগীতাকারে সংকলিত ঋক হল সামবেদ। বিশেষজ্ঞরা হলেন 'উদ্‌গাতা'। যজ্ঞকালে আনুষ্ঠানিক রীতি পদ্ধতির সংকলন হল যজুর্বেদ। বিশেষজ্ঞরা হলেন 'অর্ধাজু'। পরবর্তীকালে নানা বিদ্যার সংমিশ্রণে তৈরি হল অথর্ববেদ। বিশেষজ্ঞরা হলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। পরবর্তীকালে রচিত 'ব্রাহ্মণ'-এ বিধৃত হল বিভিন্ন পালা পার্বণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা।

৩.২.২ সমাজে শ্রেণিভেদ

আগেই বলা হয়েছে প্রাচীন ভারতে মনে করা হতো জন্ম অনুযায়ী মানুষের শ্রেণি, ভাগ্য ও কর্ম নির্ধারিত হয়ে গেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজে চারটি শ্রেণি গড়ে উঠল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শ্রেণি অনুযায়ী সবচেয়ে ঊর্ধ্বে অবস্থান ব্রাহ্মণশ্রেণির। এদের কাজ হল যাগযজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনা, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়দের ওপর ন্যস্ত ছিল রাজ্যরক্ষার ভার। এরা ছিলেন রাষ্ট্রনীতিতে দক্ষ, রণনিপুণ বীর সম্প্রদায়। কৃষিকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, পশুপালনের ভার ছিল বৈশ্য সম্প্রদায়ের ওপর। এই তিন শ্রেণির সেবার ভার ছিল শূদ্রের ওপর। অনার্য মানুষ শূদ্র বলে পরিচিত ছিলেন।

৩.২.৩ ঋষি ও পুরোহিত

মন্ত্রের শ্রষ্ঠা ছিলেন 'ঋষি'। সেই মন্ত্রে পূজা করার অধিকারী ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায়। ধীরে ধীরে পুরোহিতগণ বা যাজক সম্প্রদায় এমন অগণতান্ত্রিক প্রাচীন বৈদিক সমাজের ধারক, বাহক, রক্ষক ও পুরোধা হয়ে উঠলেন।

৩.২.৪ বহুদেববাদ

আর্যসভ্যতায় মানুষের ধর্ম ছিল আকার সর্বস্ব। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে বিভিন্ন দেবতা কল্পনা করে বহুদেবতাকে তুষ্ট করতে গড়ে উঠেছিল বহুদেববাদ (Polytheism)। কিন্তু এই বহু দেবার্চনা, আচার অনুষ্ঠানে মানুষ তুষ্ট থাকল না। সে অল্পে সুখী নয়। মানুষের মননে এল ভীষণ আলোড়ন।

৩.২.৫ উপনিষদ

মানুষের মননেই জন্ম দর্শনের। জীবন জিজ্ঞাসার উত্তরণ ঘটতে লাগল। মানুষের জীবনের প্রকৃতলক্ষ্য কী? প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্য কী? জীবনের মৌলিক সত্তানুসন্ধান কেমন করে ঘটবে? কেন পার্থিক জীবন সাময়িক প্রভাস জীবন? এইসব বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রচীন ভারতের ঋষি ও তপস্বীগণ আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী হলেন। লোকালয় থেকে দূরে অরণ্যের কোলে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে এঁরা গভীর মনন, ধ্যানমূলক উপলব্ধি, অন্তর্বিক্ষণের সাহায্যে এই সব প্রকৃতি, রহস্য, জীবন ও তার লক্ষ্য সম্পর্কিত বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইলেন। নৈমিত্তিক আচার অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে শুরু হল মানুষের প্রকৃত দর্শনচর্চা। রচিত হল 'উপনিষদ' (৭০০ খ্রীঃ পূর্ব অব্দ)। গভীর দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশ ও পূর্ণ পরিণতি হল উপনিষদে। উপনিষদের অর্থ হল 'নিকটে বসা' (উপ-নিকট, নিষদ-উপবিষ্ট)। পুত্র বা অতি প্রিয় শিষ্যকে নিকটে বসিয়ে 'আত্মা' ও 'ভূমা' সম্পর্কে গূঢ় দার্শনিক তত্বসমূহ শিক্ষা দেওয়া হতো বলেই একে উপনিষদ বলা হয়। অরণ্যেবাসী ঋষিদের উপলব্ধিজাত জ্ঞান এতে বিধৃত ছিল বলে উপনিষদকে 'আরণ্যক' বলেও উল্লেখ করা হয়। এই উনিষদকে 'গুরু শিষ্য সংবাদ'ও বলা যায়।

বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, আমার স্বরূপ, অধ্যাত্ম জীবনযাপনের আদর্শমান, জীবন ও জগতের বিভিন্ন রূপকে কেন্দ্র করে না প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে এই উপনিষদমালা। উপনিষদ শুধু দর্শন বললে ভুল হবে। এটি মহান কাব্যও বটে। উপনিষদের অমৃতধারায় অবগাহন করে রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যসৃষ্টি। উপনিষদে যেমন আছে অধিবিদ্যা (Metaphysics), জ্ঞানতত্ব (Epistemology) তেমন আছে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সার। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন তথা উপনিষদে এক অখণ্ড অতিন্দ্রীয় নিরাকার অসীম, চরম সত্তা (The Absolute)কে স্বীকার করা হয়েছে এক ব্রহ্মসত্য 'একমেবদ্বিতীয়ম' (Ekamevadwitiyam) রূপে। বলা হল 'অদ্বিতীয়', 'অসীম', 'এক বিরাট পুরুষ' সৃষ্টিসুখে নিমগ্ন হলেন। 'অসীম' বিকশিত হলেন 'সীমায়'। 'বিরাট' হলেন 'ক্ষুদ্র'। একক, অনন্ত, অরূপ রূপ পেলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুতে, মানুষ ও প্রকৃতির রাজ্যে। নিরাবয়ব অখণ্ড সত্তার অস্তিত্ব হল সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। বলা হল 'সর্বম খানু ইদং ব্রহ্ম' ('Sarvam Kaluidam Brahma'—All are the manifestations of the one Absolute Being)। তাই প্রত্যেক মানবসত্তাকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অসীম বৃহত্তর সত্তার সসীম অংশ, এক পরম উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার রূপকার বলে মনে করা হল। উপনিষদে বলা হল অখণ্ড ব্রহ্মাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনের মূল উপদেশ হল 'নিজেকে জানো' ('আত্মানম্ বিদ্ধি'— 'Know thyself')। উপনিষদে উচ্চারিত হল—

> "আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
> বুদ্ধিতু সারথিং বিদ্ধি মন পয়হমেব চ।"

(আত্মা শরীরের ধারক— এদের রথের মতো মনে করো বুদ্ধি হল সারথি আর মন হল বয়ে চলা নৌকার লাগামের মতো।—Regard the soul as the passessor of the body which is like the chariot, Intelligence is the charioteer and mind only the rein.)।

বৈদিক বহুদেববাদ পেরিয়ে আমরা উপনিষদের স্তরে এসে পৌঁছলাম এক ও অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম সত্যে। উপনিষদকে তাই বেদান্তও বলা হয়— কারণ বেদের শেষে উপনিষদের শুরু বেদভাবনাকে কেন্দ্র করেই। প্রাথমিক স্বল্প সত্য থেকে বৃহত্তর পরম সত্যের উত্তরণ প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি দেখা দিল উপনিষদীয় দর্শন জিজ্ঞাসায়।

৩.২.৬ বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী শাখা

কালক্রমে বৈদিক সাহিত্য বিশাল ও জটিল হয়ে উঠলে তা শুদ্ধভাবে পাঠ, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম নির্ভুলভাবে যাতে পালন করা যায়, তার জন্য সৃষ্টি হয় সূত্র-সাহিত্য। সত্র-সাহিত্যের দুটি ভাগ— বেদাঙ্গ ও ষড় দর্শন। বেদাঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত—শিক্ষা (বিশুদ্ধ উচ্চারণ), ছন্দ (বেদের ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান), ব্যাকরণ (ভাষা ব্যবহারের নিয়ম) , নিরুক্ত (শব্দের উৎপত্তির ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ (গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞান), ও কল্প (যাগযজ্ঞের বিধান)।

ষড় দর্শন হল—সংখ্যা, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। এই ষড়দর্শন ভিন্ন ভিন্ন ছয় জন ঋষির দ্বারা রচিত।

৩.২.৭ পরা ও অপরা বিদ্যা (Para and Apara Vidya)

আত্মার মুক্তি ও বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধি জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করলেও ভারতীয় ঋষি মানুষের ব্যবহারিক পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। উপনিষদের ঋষি নির্দেশ দিলেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপরা চ" (দুই প্রকার বিদ্যার অনুশীলন করতে হবে পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা)।

পরম জ্ঞানলাভের জন্য তিন বেদ, ছয় বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত অনুশীলন করার কথা বলা হল। আত্মসংযম ও যোগ সাধনার পথে এই বিদ্যালাভ করতে হবে। এটাই হল পরাবিদ্যা। অপরদিকে পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুশীলনকে অপরা বিদ্যারূপে অভিহিত করা হল। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্ম বিদ্যাই পরাবিদ্যা, আর যাবতীয় শিল্প, কলা, সাহিত্য ইত্যাদি হল অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা—অপরাবিদ্যার সার্থক সমন্বয়ে সফল হয়েছে প্রাচীন বৈদ্ধিক শিক্ষা। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

"অবিদ্যয়া মৃত্যুংত্তীর্ত্বা বিদ্যায়াহমৃতশুতে"—অবিদ্যা অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প বিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন পার্থিব জগতে বেঁচে থাকার জন্য এবং শিক্ষার্থীকে সমাজে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য। আর ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন অমৃতত্ব লাভ বা চরমশান্তির জন্য। বৈদিকযুগে কি ব্রাহ্মণ্যযুগে অতি সামান্য সংখ্যক শিক্ষার্থীই আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে অধ্যয়ন অধ্যপনা ও সত্যানুসন্ধানে নিয়োজিত ছিলেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেছেন। তাই শিক্ষার নিকট বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য এবং অন্তিম লক্ষ্য দুটিই ছিল। প্রথমটি পার্থিব ব্যবহারিক জীবনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এবং দ্বিতীয়টি নিজের পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে অসীম সত্তার সঙ্গে মিলনের জন্য। তাই পরাবিদ্যা প্রাচীন ভারতে শিক্ষার শেষ কথা হলেও অপরাবিদ্যা প্রাচীন শিক্ষায় অবহেলিত

হয়নি। উপনিষদে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশান্তি যে অবিদ্যাং উপাগতে তত ভূয় এবতে উ বিদ্যায়াং রতাঃ।"

যারা কেবল লৌকিক বিদ্যার অনুশীলন করে, তারা অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু তার চেয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তারা, যারা কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করে।

৩.৩ অবৈদিক দর্শন (চার্বাক ও জৈন)

বৈদিক দর্শন বেদান্ত, উপনিষদ ব্যতীত, অবৈদিক দর্শনের তিনটি শাখা— চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে তাদের অবদান রেখে গেছে। এরপর ষড়দর্শন অর্থাৎ বেদভিত্তিক ছটি দর্শনের আবির্ভাব পর্ব। আগেই বলা হয়েছে এই ষড়দর্শন হল ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। এই সব নয়, পরবর্তীকালে মুসলিমদের সৃজনশীল মননশীলতা ইসলামি দর্শনকেও গ্রহণ করেছে ভারতবর্ষ। পশ্চিমের উদারনীতিও সমাদরে গৃহীত হয়েছে। ভারতের সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে এসেছে বিভিন্ন ভাবধারার মিলন ক্ষেত্র যা—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

আমাদের পাঠ্য বিষয় হল বৈদিক ব্রাহ্মণ্য দর্শন (বেদান্ত/উপনিষদ) এবং বৌদ্ধ ও ইসলামি দর্শন। তবে বৌদ্ধদর্শন এবং ইসলামি দর্শন আলোচনা করার আগে আমরা খুব সংক্ষেপে চার্বাক দর্শন ও জৈনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করে নেব।

৩.৩.১ চার্বক দর্শন

বৈদিকযুগের বহুদেববাদ, শুকনো আচার সর্বস্বতা, পুরোহিত তন্ত্রের নিপীড়ন মানুষের স্বাধীনতার অভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে গড়ে উঠল নতুন এক দর্শন—যার নাম চার্বাক দর্শন।*

এটি বস্তুবাদী লোকায়ত দর্শন। চার্বাক সম্প্রদায় লোকায়তিক নামেও পরিচিত ছিলেন। লোকপ্রবাদ এই যে এই জড়বাদী দর্শনের প্রবক্তা হলেন বৃহস্পতি লৌক্য যিনি পুরাণে দেবতাদের গুরু বলে প্রসিদ্ধ। এই দর্শন বেদোপনিষদকে প্রতিক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করল। বলা হল প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বস্তুই প্রধান। ইহলোকের বাইরে কোনো জগৎ নেই। মৃত্যুই সকলের পরিণাম। সম্পদ, আনন্দ, সুখভোগই জীবনের লক্ষ্য। জগৎ চতুর্বিধ উপাদান নিয়ে গঠিত। ক্ষিতি, অপ্, তেম, মরুৎ। বেদের যাগযজ্ঞ, আমার অনুষ্ঠান, জন্মান্তর বাদ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে গড়ে উঠল এই মতবাদ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও দর্শনের তীব্র গোঁড়ামি কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ স্বাধীন জীবনের অধিকারী হল। মানুষের ব্যক্তিত্ব মর্যাদা পেল। বলা হল পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি একটা অলীক কল্পনা। ইন্দ্রিয় বস্তুর পারস্পরিক স্পর্শ থেকেই আমরা সব কিছু প্রত্যক্ষ করি এবং

* "This philosophy is very pleasing to our ears. So the welcome utterances (charu-vaka) found in this philosophy account for its name". —Dr. Vatsayan.

জানি। মানুষের জ্ঞান জগতে এল পরিবর্তন। এই সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন দেখা দিল। স্বাধীন চিন্তার মানুষের অগ্রগতির ফল স্বরূপ রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের চর্চা হতে লাগল।

৩.৩.২ জৈন দর্শন

যিনি সার্থকভাবে সমস্ত বাসনা কামনাকে জয় করে আত্মসংযমী হতে পেরে যেন, তিনিই 'জিন' অর্থাৎ বিজয়ী। জৈন দার্শনিক একথা বিশ্বাস করেন। ঋষভদেব এই মতবাদের প্রবক্তা। এঁর অনুগামী ছিলেন ২৩জন তীর্থঙ্কর। কনিষ্ঠতম হলেন মহাবীর (৫৬৯-৪৮৫ খ্রিঃ পূঃ)। দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় জৈনদর্শনের মূলকথা বাস্তববাদ ও বহুত্ববাদ (Realism and pluralism)। জৈন মতে আমাদের প্রত্যক্ষগত সবকিছু অতিবাস্তব এবং সেগুলি সংখ্যায় একাধিক জৈনদের বিশ্বাসী। বিভিন্ন মতবাদ একসঙ্গে সত্য হতে পারে। একে বলে অনেকান্তবাদ। জৈন জ্ঞানবিদ্যায় (Epistemology) একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল অনেকান্তবাদ। এর বিশ্লেষণী দিকটিকে স্যাদ্‌বাদ বলে। 'স্যাৎ' বলতে ''হতে পারে'' বোঝায়। 'অনেকান্তবাদ' ও স্যাদ্‌বাদের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, কোনো বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান হলেও হতে পারে। সত্যের অনেক রূপ যে যেমন দেখে এই হল দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দিল 'পরমতাসহিষ্ণুতা' ধর্মের।

জৈন মতবাদ বিশ্বাস করে যে জগৎ জুড়ে অসংখ্য পরমাণু। ধূলিকণা, উদ্ভিদ, পশুপাখি থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত প্রাণ বা আত্মন্ এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। মানবাত্মা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। এই আত্মা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। নৈতিক বিধানে এই আবরণ উন্মোচন সম্ভব। জৈনদর্শনে নেকান্তবাদ, জীবের অনেকত্ত্ব, অনন্তশক্তিসম্পন্নতা পরমানুতত্ত্ব, ধর্ম ও অধর্মের বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার, জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন স্তর বিন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী কিন্তু এই দর্শনের মূল লক্ষ্য হল আত্মনের মুক্তি। এই দর্শন নৈতিক জীবন উন্নতি নির্ধারক কিছু নীতি পথের ও নির্দেশ দেয়।

৩.৪ অবৈদিক বৌদ্ধদর্শন

জৈনধর্ম ও দর্শনের সমসাময়িক মতবাদ হল বৌদ্ধদর্শন। এই মতবাদ অনেক ব্যাপকতর এবং গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছিল সমসাময়িক ও পরবর্তী মানবজীবন ও পরিবেশে। বৌদ্ধমতের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ বেদ উপনিষদের সংস্কৃতির মধ্যেই লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ অর্ধে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে শাক্য বংশের এক অভিজাত পরিবারে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। তিনি প্রথম জীবনে সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত ছিলেন। পরে সাধনালব্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হল বা 'বোধি' লাভ করেন এবং বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। তিনি খ্রিঃ পূর্ব ৪৮৩ অব্দে ৮০ বছর বয়সে মারা যান। বুদ্ধের উপদেশ বা বাণীই হল বৌদ্ধ দর্শনের মূল উৎস। বুদ্ধদেব নিজে কোনো ধর্মগ্রন্থ, দর্শনশাস্ত্র অথবা নীতিশাস্ত্র রচনা করে যাননি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও সাধনালব্ধ সম্পদ-বাণী, উপদেশমালা, গল্পকথার মাধ্যমে মুখে মুখে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে গেছেন। প্রচারের মাধ্যম ছিল জনগণের ব্যবহৃত পালিভাষায়। তাঁর অভিমত ধরা আছে পালিভাষায় লেখা তিনটি গ্রন্থে, যাদের একত্রে বলা হয়

ত্রিপিটক। ত্রিপিটক গ্রন্থগুলির নাম 'বিনয় পিটক' (Abhidhamma Pitaka)। প্রথমটি বৌদ্ধসংঘ বা বিহারের পরিচালন ব্যবস্থা এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের পালনীয় দৈনন্দিনবিধি সম্পর্কে নির্দেশমূলক। সূত্ত পিটক গদ্যেও কবিতায় লেখা যা বৌদ্ধধমন, সাহিত্য ও দর্শনের সম্বন্ধে ধারণা দেয়। 'অভিধর্ম্ম' অর্থ উন্নততর ধর্ম' (higher religion)। সে অর্থে তৃতীয় পিটক পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে (Scholastic mannar) এই উন্নততর ধর্মের কথা বলে। এই তিনটি প্রাচীন গ্রন্থই বৌদ্ধদর্শনের মূল উৎস এবং প্রামাণ্য যাজকীয় বিধিসম্মত। এছাড়াও পালিভাষায় লিখিত 'মিলিন্দ পন্থ' (Milinda-Pantha) (বৌদ্ধ শিক্ষক নাগসেনা ও ১২৫-৯৫ খ্রীঃ পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজা মিলিন্দের কথোপোকথন), সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাকাব্য অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, চতুর্থ অব্দে লেখা আর্যসূরের (Arya sura) 'জাতকমালা' ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বৌদ্ধভারতের সামাজিক অনুশাসন ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। বুদ্ধদেব শাক্য উপজাতীয় গোষ্ঠীতে জন্মেছেন। তিনি রাজা রাজড়াদের এবং অর্থলোভী ধনী মানুষদের দ্বারা উপজাতি গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন। সাধারণ মানুষের এই দাসত্ব, শোষণ, অত্যাচার জাতকের কথার বিভিন্ন খণ্ডে লিপিবাদ আছে। বুদ্ধদেব তাই মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন মানবজীবন দুঃখময়। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই দুঃখ থেকে মানবজীবনকে মুক্ত করা। কিন্তু কোন্ পথে? তিনি তত্ত্বজ্ঞানে বেশি সময় দেন নি। তাঁর চার পাশে জরা, ব্যাধি ও দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা বা যজ্ঞের মাধ্যমে উপকার প্রদান একথা একেবারেই বিশ্বাস করেননি। তিনি তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন দুঃখময় কোনো কিছু ঘটে গেলে, দুঃখের উৎস, সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে বেশি জানার চেয়ে বাস্তবে কী করে মুক্তি পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে। পাঁজরে তীরের খোঁচা লাগলে (arrow plunged into oue's flanu) তীরটা এল কোথা থেকে? কে তৈরি করেছে? এইসব ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তীরটা টেনে বার করা জরুরি। তাই তার দুঃখের পথ থেকে মুক্তি পাওয়ার শিক্ষণ ছিল ব্যবহারিক। তিনি নির্বাণের জন্য উপনিষদীয় প্রজ্ঞার পথে বিশ্বাসী ছিলেন না। যে জ্ঞানটুকু অসততা থেকে, অসত্য থেকে, দুঃখ থেকে মানুষকে মুক্ত করবে শুধু সেইটুকু নির্দেশনা তিনি মানুষকে দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর দর্শন প্রয়োগমূলক ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। বুদ্ধদেব বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণত্বের প্রাধান্য, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদিকে একেবারেই অস্বীকার করলেন। 'এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর' সম্পর্কে কোনো কথাই বললেন না বা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তাই কেউ কেউ তাঁকে পুরোপুরি আস্তিক বা নাস্তিক না বলে অজ্ঞেয়বাদী বা agonistic বলে চিহ্নিত করলেন। বুদ্ধের নতুন চেতনা হল রাজা নয়, ব্রাহ্মণ নয়, বেদ নয়—এরা কেউই চূড়ান্ত নয়। নতুন কথা হলো "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"। এই ত্রিশরণমন্ত্র যতদিন ভারতে বিরাট শক্তি নিয়ে বেঁচে ছিল, বৌদ্ধ দর্শন এবং তার উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাও বিরাটত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বৌদ্ধ মতবাদ চারটি আর্যসত্য বা মহাসত্যর (four noble truths) ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রতীত্য সমুৎপাদতত্ত্ব (theory of dependent origination) দ্বাদশ নিদান (Twelve Causes) এবং নীতিশাস্ত্র (Ethics)। চারটি পরাসত্য ও অন্যতত্ত্বগুলির ফসল হিসাবে আরও দুটি প্রধান বৌদ্ধ মতবাদ হল অনিত্যবাদ (Views of Universal impermanence) এবং অনাত্মবাদ (Theory of denial of a permanent

soul substance)। এছাড়াও আছে বৌদ্ধ মতবাদে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) বৌদ্ধ মতবাদ তথা দর্শন এই সমস্ত মূল ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৩.৪.১ চারটি আর্যসত্য (Four Noble Truths)

চারটি আর্যসত্য হল ঃ

(১) দুঃখ আছে (Every thing is Suffering)।

(২) দুঃখের কারণ আছে (Suffering has a cause)। আকাঙক্ষা আছে তাই দুঃখ আছে। এই আকাঙক্ষা হল হয়ে ওঠার আকাঙ্খা (thirst for being), ক্ষমতার আকাঙক্ষা, আনন্দের আকাঙক্ষা ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব কার্যকারণ সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন সেটি হল প্রতীত্যসমুৎপদ তত্ত্ব (Thoery of dependen origination)।

এই মতবাদ অনুসারে সব কাজেরই কারণ আছে তাই দুঃখেরও কারণ আছে। দুঃখের উৎস বা কারণ হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট করে বারোটি শর্ত বা নিদানের উল্লেখ করেছিলেন যেগুলি দূরীভূত হলে দুঃখও আর থাকবে না। এই কারণগুলিকে বলা হয় দ্বাদশ নিদান (duadasa nidana - twelve causes)।

প্রতীত্যসমুৎপদ অর্থ এই রকম—

'ওটা আছে বলেই এটা হয়, ওটার থেকেই এটার উৎপত্তি' (that being present, this becomes ; from the arising of that, this arises.)। বিপরীতে বলা যায়, "ওটার অনুপস্থিতি আছে বলেই এটা হয় না, ওটা বন্ধ হলে এটাও বন্ধ হয়ে যায়" (That being absent, this does not become ; from the cessation of that, This ceases.)।

দ্বাদশ নিদান ঃ

(১) অজ্ঞতা (অবিদ্যা) থেকে জন্মায় (২) সংস্কার সমূহ (dispositions)। সংস্কার থেকে উৎপত্তি (৩) চেতনা (Consciousness)-র চেতনা থেকে জন্ম নেয় (৪) জৈব মানসিক সংগঠন বা নামরূপ (phycho-physical organisation mamarupa)। নামরূপ থেকে উৎপত্তি (৫) ষড়ায়তনের অর্থাৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের (five sense organs and Manas) ষড়ায়তন (Six ayatanas) থেকে পাই (৬) স্পর্শ বা বিষয় সংক্ষেপ (Sparsa) স্পর্শ থেকে পাই (৭) বেদনা বা অনুভূতি (Vedana or sensation)। বেদনা জন্ম দেয় (৮) তৃষ্ণা বা আকাঙক্ষার (Thirst, desire), (৮) তৃষ্ণা বা আকাঙক্ষা থেকে জন্মায়, (৯) বিভিন্ন জাগতিক বস্তুর সঙ্গে সংযোগ বা উপাদান। সংযোগ (attachment) থেকে উৎপত্তি (১১) জন্মানোর ইচ্ছা বা ভাব (The will to be born or Bhava)। ভব থেকে উৎপত্তি (১২) সমস্ত জাগতিক দুঃখ, শোক, অনুশোচনা, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু (old age, death) ইত্যাদি।

(৩) তৃতীয় আর্যসত্য (Third noble truth) হল দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব (suffering can be extinguished)। বারোটি নিদান বিনষ্ট হলে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব। এই দুঃখ নিবৃত্তিকে নির্বাণ (Nirvana) বলে। জীবিতাবস্থায় মানুষ আত্মজ্ঞান বা বোধি লাভ করলে নির্বাণ লাভ সম্ভব। নির্বাণ জীবনের অনস্তিত্ব নয়,

নির্বাণ লাভ হল সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্তি। নির্বাণ অপার শান্তি ও আনন্দের অবস্থা। এই অবস্থা বর্ণনাতীত।

(৪) চতুর্থ আর্যসত্য (Fourth Noble truth) হল—দুঃখ নিবৃত্তির পথ আছে (There is a path leading to this extinetion)।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ (Eight Fold Path) ঃ দুঃখ নিবৃত্তি বা নির্বাণলাভের পথকে বলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ (Eight fold path)। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র (Ethics) বলে পরিচিত।

এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথমটি হল

(১) সম্যক জ্ঞান (Right Faith)

চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও সেগুলির অনুধ্যান। এর জন্য চাই দ্বিতীয় মার্গ।

সেটি হল ঃ

(২) সম্যক সংকল্প (Right Resdue)

(৩) সম্যক বাক্ (Right Speech) :

মিথ্যাভাষণ, অপ্রিয় কথা, পর নিন্দা, অতিকথন থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

(৪) **সম্যক কর্ম বা সদাচার** (Right Action) :

সাধককে সদাচারী হতে হবে।

(৫) **সম্যক জীবনযাপন** (Right Living) :

কখনও অসৎ উপায়ে জীবন যাপন চলবে না।

(৬) **সম্যক অনুশীলন** (Right Effort) :

এই অনুশীলন হল মানসিক। মনটি থেকে সবসময় নেতিবাচক ভাবনা দূর করতে হবে।

এরপর তাই সপ্তম মার্গ হল।

(৭) **সম্যক চিন্তা বা স্মৃতি** (Right Thoughe) মুক্তিকামী মানুষকে চারটি আর্যসত্যকে মনে ধরে রাখতে হবে এবং সমস্ত কামনা বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। এই সাতটি পথ অতিক্রম করে মানুষ শেষ পথে পৌঁছাবে। সেটি হল—

(৮) **আত্ম সমহিত অবস্থা বা সমাধি** (Self concentration)। এই অবস্থায় পৌঁছালে মানুষ আলোকপ্রাপ্ত হয় বা বোধি (Enlightenment) লাভ করে এবং বুদ্ধ (enlightened) হয়। তাই 'বুদ্ধ' একটি অবস্থা মাত্র।

৩.৪.২ অনিত্যবাদ এবং অনাত্মবাদ (Theory of Universal Impermanance and theory of denial of permanent soul substance) :

বৌদ্ধ মতবাদের পরটি মহাসত্য, অনুসঙ্গী প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র ছাড়াও আরও দুটি প্রধান বৌদ্ধ মতবাদ হল অনিত্যবাদ এবং অনাত্মবাদ যার প্রকৃত দার্শনিক তাৎপর্য আছে। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বে আমরা দেখেছি প্রতিটি বিষয়ের উপস্থিতি কতকগুলি শর্তের সমাবেশের উপর নির্ভর করে (everything is dependent upon the collocation of certain conditions)। শর্তের অনুপস্থিতিতে বিষয়টিও স্থায়ী হয় না। এইরকমভাবেই

অনিত্যবাদে বলা হল কোনো কিছুই কখনও স্থির নয়, সবসময়ই ভাঙা গড়া চলছে, চলছে ক্ষণে ক্ষণে সবকিছুর পট বদল। স্থায়ী কিছু নেই।

অনাত্মবাদে বলা হল—আত্মা অবিনশ্বর এ কথা বৌদ্ধদর্শন স্বীকার করে না। আত্মা হল চেতনা স্রোতের নিরন্তর প্রবাহ এটা কখনও থেমে নেই। নদীর তরঙ্গমালার মতো অবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। বৌদ্ধ মত স্বীকার করে—মানুষ দেহ, মন, চেতনার একটি অনিত্য সমাহার। দেহ মন চেতনা যুক্ত হলে তার সৃষ্টি, আর বিনাশের সময় এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। উপনিষদের মত অনুযায়ী দেহ চেতনার কাঠামোর বাইরে এক পরম সত্তার বাস্তব উপস্থিতিকে বুদ্ধদেব স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী পরম আত্মার উপস্থিতি নয়— প্রত্যেক ব্যক্তির (Personality) আছে এ কথা স্বীকার করা হয়। এই ব্যক্তিত্ব বা মানব অস্তিত্বকে দেহ ও মনের কতকগুলি অবস্থার বা উপাদানের সমাহার (Aggregate) বলে মনে করা হয়। এই অবস্থা অথবা উপাদান (state or factor) কে বৌদ্ধ মতে স্কন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মত অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব হল—পাঁচটি স্কন্ধের সমাহার—

(১) রূপ স্কন্ধ— শরীরের উপর প্রভাবকারী বিষয়ের সমাহার।

(২) বেদনা স্কন্ধ — সুখ দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতির যোগফল।

(৩) বিজ্ঞান স্কন্ধ— চেতনার যোগফল।

(৪) সংজ্ঞা স্কন্ধ— ধারণা সমাহার।

(৫) সংস্কার স্কন্ধ— প্রবৃত্তি প্রভৃতি আন্তর বিষয়ের সমষ্টি।

এর মধ্যে প্রথমটি হল মানুষের দৈহিক অবস্থা (Physical body)। অন্যগুলি সবই মানসিক। অতএব ব্যক্তিত্ব হল দৈহিক ও মানসি নানা অবস্থার যোগেরও যোগফল। এই সার্বিক যোগফলকে বৌদ্ধমত অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে নামরূপ (Nama-Rupa) বলে।

৩.৪.২ বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology in Buddhist philosophy)

বৌদ্ধদর্শন অবৈদিক শাখা। বিশেষভাবে জানা বা জ্ঞানলাভের উৎস বলতে বৌদ্ধ মতাবলম্বীগণ প্রত্যক্ষণ (Perception) এবং অনুমান (Inference) কে গ্রহণ করেছেন।

প্রত্যক্ষণ দু রকম হতে পারে নির্ণীত (Determinate) এবং অনির্ণীত (Indeterminate)। যখন মানুষ কোন বস্তু সম্বন্ধে সরাসরি জ্ঞান লাভ করে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ (Sense perception) এবং মননের সাহায্যে ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ হল নির্ণীত প্রত্যক্ষণ। যখন বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ (nature) বা নির্যাস (essence)টি মানুষ সরাসরি প্রত্যক্ষ করে না তবে সাধারণীকরণের মাধ্যমে পূর্ব কোন সমজাতীয় প্রত্যক্ষণের সাহায্যে উপলব্ধ হয় তখন প্রত্যক্ষণ হচ্ছে অনির্ণীয় (Indeterminate) এছাড়া জ্ঞান লাভের আর একটি উপায় হচ্ছে অনুমান। দূরত্ব, গভীরতা, বির্মূত জ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাসের অনেক কিছুই মানুষের প্রত্যক্ষণ ব্যতীত অনুমান নির্ভর। তবে অনির্ণীত প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানও নির্ণীত প্রত্যক্ষণের সাহায্যে কোনো সময় প্রমাণিত না হলে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা চলে না।

মানুষ জানে কী করে?

বৌদ্ধ মতবাদে বলা হয়েছে কোনো বস্তু যখন মনের সামনে আসে তখন মন উদ্দীপিত হয়। অন্তরে আলোড়ন

বা কমান শুরু হয়। তখন এক পরীক্ষা শুরু হয়। মনের মধ্যে সঞ্চিত পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে তার সঙ্গে নতুন জ্ঞানকে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে মনের মধ্যে এক ভাবজট সৃষ্টি করে এবং পুরাতন জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন এবং নতুন জ্ঞানের সঙ্গে তার মিলনের মাধ্যমে মানুষ জানে। এই ভাবজটকে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করেছে apperceptive mass রূপে এবং প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে apperception বা সংপ্রত্যক্ষণ। একেই খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দে বুদ্ধদেব নাম দিয়েছেন 'জবন'।

৩.৪.৪ বৌদ্ধদর্শনের শাখা

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কোনো বিষয় বা বস্তু কতখানি প্রকাশিত হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বৌদ্ধদর্শনের চারটি শাখা গড়ে ওঠে। সেগুলি হল—

শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক।

শূন্যবাদ (Nihilism) বলে মানসবহির্ভূত কোনো বস্তু প্রত্যক্ষই হয় না। সবই শূন্য।

বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির অন্তরসত্তার অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তির মন সঞ্চিত জ্ঞানের আলয়। বাইরের মাৎ মনের ধারণারই প্রতিফলন।

সৌত্রান্তিক মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় মনের জগৎ এবং বহির্মাৎ দুটিই সত্য। কিন্তু মনের ধারণা বস্তুর অনুকৃতি (copy) মাত্র।

চতুর্থশাখা বৈভাষিক অনুযায়ী মন বহির্জগৎকে প্রত্যক্ষভাবেই জানে। অনুমানের সাহায্যে নয়।

৩.৫ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে তুলনা (Comparison between Vedic Brahmanya Philosophy and Buddhist Philosophy) :

বৌদ্ধ ও বৈদিক এই উভয় দর্শনের জীবন ও জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়াই পরম উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য মতবাদ যখন পরম ব্রহ্মাকে 'একমে বা দ্বিতীয়ম' ঈশ্বর বলে উপলব্ধি করে তখন বৌদ্ধদর্শন নিরীশ্বরবাদী। ব্রাহ্মণ্যমতবাদে বিশ্বাসী হিন্দুরা পার্থিব জীবনকে স্বীকার করেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর অংশ বলে মনে করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে হিন্দুর আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করে। তবেই পরম অনুভূতি ও সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে সেই অসীমের সঙ্গে সীমার মিলন সম্ভব হবে। তাই পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সেইজন্যই 'চতুরাশ্রম' (ব্রহ্মচর্য, গাহস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস) -এর গুরুত্ব। আর বৌদ্ধ দর্শনে একমাত্র লক্ষ্য দুঃখের সমাপ্তি, নির্বাণ ও মোক্ষ। পরমাত্মার সঙ্গে পুনর্মিলনে নয়, বাসনার অবলুপ্তিতে হবে সেই নির্বাণ। এইভাবে জরা, ব্যাধি, দুঃখ থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। তাই গার্হস্থ্যের গুরুত্ব নেই তাদের কাছে। কেবলমাত্র ভিক্ষুত্ব বা অর্হত্বপ্রাপ্তির সাধনা এদের সমস্ত জীবন জুড়ে। বৌদ্ধদর্শনে কেবল 'সন্ন্যাস' আশ্রম স্বীকৃত হয়েছে। সেজন্য বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাতে সন্ন্যাসগ্রহণের মাধ্যমেই শিক্ষার শুরু এবং সন্ন্যাসের মাধ্যমেই

তার শেষ। পরম উদ্দেশ্য—সংসার বন্ধন থেকে চূড়ান্ত মুক্তির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ। হিন্দু দর্শনে মনে করা হত জন্ম অনুযায়ী মানুষের ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী কর্ম। সমাজ চতুর্ণের এবং প্রতিটি বর্ণের কর্ম নির্দিষ্ট। সমাজ পরিবেশ অগণতান্ত্রিক। বৌদ্ধদর্শনে সমাজ গণতান্ত্রিক।

৩.৬ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা (Brahamanic & Buddhistic System of education)

ধর্মসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঞ্চালন করা জন্য ব্রাহ্মণ্যদর্শন অনুযায়ী গড়ে উঠল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বৌদ্ধদর্শন অনুযায়ী গড়ে উঠল বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থা।

যজ্ঞ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্ভব। শিক্ষা ছিল উচ্চ তিন বর্ণের কাছে উন্মুক্ত। শিক্ষায় নারীদের পূর্ণ অধিকার ছিল। প্রাকবিদ্যালয় শিক্ষায় পিতামাতার দায়িত্ব থাকলেও নির্দিষ্ট বয়সে (ব্রাহ্মণ সন্তানের আট, ক্ষত্রিয়ের এগারো ও বৈশ্যের বারো) উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষর শুরু হতো। এই শিক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্রিক গুরুর কাছে গুরুগৃহে। অর্থাৎ মৌলিক বিদ্যালয় ছিল গুরুকুল। বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। ব্রহ্মচর্যটি ছিল গুরুগৃহে শিক্ষার কাল। সব বেদ আয়ত্ত করতে বারো বছর শিক্ষার প্রয়োজন হত। তাই গুরুগৃহে বারোবছর থাকতে হত। তবে জীবনব্যাপী শিক্ষার আদর্শ প্রচলিত ছিল। গুরুকুল, পরিষদ, চতুষ্পাঠী, টোল প্রভৃতি ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে বলা চলে না। গুরুকুল ব্যবস্থায় মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষকই ছিলেন চরম বিচারক। বর্ণাশ্রম প্রথা থাকায় প্রথম দিকে গণশিক্ষার প্রসার ঘটেনি। পরে লৌকিক ব্যবহারিক শিক্ষা গুরুত্ব পায়। সমাজ ও রাজশক্তির আনুকূল্য থাকায় শিক্ষা ছিল মূলক অবৈতনিক। শিক্ষকগণ শিক্ষাদানকে সেবার দৃষ্টিতে দেখতেন।

বেদ বিরোধিতা, ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ও বর্ণাশ্রম-চতুরাশ্রমকে অস্বীকার করে বৌদ্ধ শিক্ষায় সার্বজনীনতা স্বীকৃতি পেয়েছিল। শৈশবে গৃহের ভূমিকা স্বীকৃত হলেও সাধারণত আট বছর বয়সে 'প্রব্রজ্যা' নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভের জন্য সংঘজীবনে প্রবেশ করতে হত। 'সংঘজীবন' বা 'সংঘারাম' বা 'বিহারে' যৌথ কর্তৃত্বে শিক্ষা প্রদত্ত হতো। দুশ্চরিত্র, ব্যাধিগ্রস্ত, পঙ্গু, ঋণগ্রস্ত, অপরাধীরই কেবলমাত্র বিহার জীবনে প্রবেশের অধিকার ছিল না। গুরুশিষ্যের যৌথজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত সংঘ সমাজ। 'প্রব্যজ্যা'র পর শিক্ষার্থীদের বলা হত 'শ্রমণ'। শ্রমণের বারো বছরের শিক্ষা কাটিয়ে পরবর্তী স্তর 'উপসম্পদা'য় প্রবেশ করতে হতো। দশবছর উপসম্পদা জীবন অতিবাহিত করে শিক্ষার্থী 'উপাধ্যায়' বা গুরু পদে উন্নীত হতে পারত। বিহারে শিক্ষাজীবন তাই ছিল সুদীর্ঘ বাইশ বছরের। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জীবন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত কর্তব্য বাঁধনে বাঁধা। গুরু শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ থাক, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় সবার ওপর ছিল সঙ্ঘের স্বার্থ।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় দর্শনের দ্বারাই শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন, শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষকের কাজ, শৃঙ্খলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণা ইত্যাদি প্রভাবিত হয়েছিল। যদিও বলা যায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই নেওয়া হয়েছে।*

৩.৭ ইসলামি দর্শন (Islamic school of Philosophy)

দেশ, কাল, জীবনযাপনের পরিস্থিতি, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় জীবন দর্শন নির্ধারিত হয়। জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়। সেই অনুযায়ী শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থিরীকৃত মানুষকে সেই লক্ষ্যে উন্নত করার প্রচেষ্টা চলে। হজরত মহম্মদ চেয়েছিলেন আরব ভূমির অন্ধ কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস, পারস্পরিক কলহ, নীতিজ্ঞানহীন জীবনযাত্রাকে পাশে সরিয়ে রেখে 'কোরান' এ সন্নিবেশিত সামাজিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে স্থিতিশীল ঐক্যবদ্ধ সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা করতে। 'ইসলাম'কে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন 'ইসলাম' হচ্ছে একটি জীবন প্রণালী (A way of living)। কেউ বলছেন 'ইসলাম' এর অর্থ শান্তি (Peace)। অনেকের মত হল 'ইসলাম' একটি 'সভ্যতা' (Civilization)। আমাদের কাজ হচ্ছে 'ইসলাম'কে দর্শন হিসাবে ব্যাখ্যা করা দর্শন বা Philosophy ('Puilo'-Love এবং 'Sophia'-Wisdom) রূপে ইসলামের অর্থ হবে ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করা। (Philosophy-র অর্থ যখন 'প্রমা'র প্রতি ভালোবাসা বা সত্যানুসন্ধান; দর্শনে (দৃশ্ + অন্)র অর্থ যখন গভীরভাবে দেখা বা উপলব্ধি, সৃজনশীল গভীর মননের সাহায্যে আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে 'প্রমা'য় পৌঁছানো, তখন ইসলামি দর্শনের মূলনীতি হল সত্যের প্রতি নিজেকে সমর্পণ। এখানে 'সত্যের প্রতি সমর্পণ' আর 'ঈশ্বরের' বা 'আত্মার' প্রতি সমর্পণ সমার্থক।

ইসলামি দর্শন তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসী— ঈশ্বরবাদী, নিরশ্বরবাদী নয়। এই ঈশ্বরবাদিতা হ'ল Theism, প্রাচীন গতানুগতিক চিন্তায় দর্শন যখন রহস্যময় অতিন্দ্রীয় জগতের চাবিকাঠি তখন ইসলামি দর্শন অনুযায়ীও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান অতিন্দ্রিয় রহস্যময় বলে মনে করা হয়। এই মত রহস্যময়তা বা অতিন্দ্রিয়তায় ভরা (Mysticism)। ধর্মীয় ভাবনায় আচ্ছন্ন। এই প্রচলিত মত অনুযায়ী ঈশ্বর মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে অনেক দূরের এক ভাবনা। দর্শন জীবনের লক্ষ্য নির্দেশ করে। মানুষকে সেই পথে পরিচালিত করে। এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে সকল দার্শনিক মতের মতো ইসলামি ভাবনাকেও পুনর্গঠিত করা হল। ভারতবর্ষে এই ইসলামি দর্শনের অন্যতম পথপ্রদর্শক হলেন স্যার মহম্মদ ইকবাল (Sir Mohammad Iqbal)।

সমস্ত ভবিষ্যৎদর্শী (Prophetic) ধর্ম তথা দর্শনের মতো ইসলামি দর্শন, একেশ্বরবাদিতায় (Monotheism) বিশ্বাসী। এই দর্শন অনুযায়ী ঈশ্বর এক, পরম ও চরমসত্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী (Omnipotent) বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা।

* "It (Buddhism) bad a considerable influence upon Indian philosophic though and religions ideals, but on the educational side it is difficult to estimate te amount of its influence. Its curriculum was meagre; and, such as it was, was mostly borrowed or adepted from the Bradmanic schools." — F.V. Keay (A History of Education in Indian and Pakistan.)

তিনিই সর্বোচ্চ সত্তা (Supreme ego) যার থেকে ব্যক্তিসত্তা (Individual ego)-র বিকাশ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (through sense organs) ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়। তাঁকে স্বজ্ঞার (Intution) মাধ্যমে পেতে হয়। স্বজ্ঞার প্রকৃতি (Nature of Intution) ইসলামি ধর্ম এবং অধিবিদ্যায় (Metaphysics) বলা হল স্বাভাবিক উপায়ে পরম সত্যে পৌঁছানো যায় না। স্বাভাবিক উপায়ে যে নিত্যজ্ঞান লাভ করি তা সময় ও গতির নিরিখে (Spacetime dimension) পরীক্ষালব্ধ টুকরো টুকরো বিষয়ের খণ্ড খণ্ড জ্ঞান। মানুষের পার্থিব জীবনে এই জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। বুদ্ধি এবং চিন্তনের সাহায্যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে এই জ্ঞানকে সে পার্থিব জীবনে অনেক সমস্যার সমাধানে কাজে লাগাতে পারে। তবে এতে পরমজ্ঞানের বাস্তবতাকে (Saprame Reality) ধরাছোঁয়া যায় না।

কোরাণের মত অনুযায়ী এই পরম জ্ঞান সরাসরি লাভ করা যায় হৃদয় (heart) দিয়ে। যুক্তি ও তর্ক ছাড়াই অনুভব ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই হঠাৎ উপলব্ধিই Intution বা স্বজ্ঞা।

স্বজ্ঞার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি পরম সত্যের বা ঈশ্বরের তাৎক্ষণিক জ্ঞান (Intution is immediate knowledge of Reality or God)।

এটি চিন্তালব্ধ সিদ্ধান্তলব্ধ প্রক্রিয়া (Inferential process)-য় জ্ঞাত নয়।

এটি ইন্দ্রিয়লব্ধ খণ্ড খণ্ড বিষয়ের জ্ঞান নয়। এটি পরমসত্তার সার্বিক অভিজ্ঞতা (whole experience of the Supreme relaity)। এই সার্বিক অভিজ্ঞতা লব্ধ উপলব্ধিতে যে জানতে চায় সেই ব্যক্তি যাকে জানতে চায় তার অনুভবে একীভূত হয়ে যায় এবং উপলব্ধি করে।

স্বজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভূত হয়। ব্যক্তিসত্তা উন্নীত হয়ে পরমসত্তাকে ছুঁতে পারে। এই উপলব্ধিমূলক জ্ঞানের মন ও বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা চলে না। তাই স্বজ্ঞাকে বলা হয় হৃদয়লব্ধ জ্ঞান।

স্বজ্ঞা পরমসত্তার অনন্ত ময়তা (eternity) কে উপলব্ধি করে।

৩.৭.১ ইসলামি দর্শনের লক্ষ্য (Aims of Islamic Philosophy)

সত্যকে জানতে একমাত্র পথ হল জ্ঞানার্জন ও তার প্রসারণ (The acquisition of 'ilm' (knowledge) is the only road to the apprehension of truth)। স্বভাবতই জ্ঞান আহরণকে ইসলাম অগ্রে স্থান দিয়েছেন। এই দর্শনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের কাছে নীতিসম্পন্ন নিয়মানুবর্তী জীবনের আদর্শই বড়। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহম্মদ বলেছেন, "জ্ঞান আহরণ কর, কারণ, ঈশ্বরের পথে যিনি জ্ঞান আহরণ করেন তিনি পূণ্যের কাজ করেন। যিনি জ্ঞানের কথা বলেন, তিনিও ঈশ্বরের গুণগান করেন। যিনি জ্ঞান অন্বেষণ করেন, তিনি ঈশ্বরের সেবা করেন। .... জ্ঞানই জ্ঞানীব্যক্তিকে গ্রহণীয় এবং বর্জনীয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়, স্বর্গের পথ আলোকিত করে। এটিই মরুভূমিতে বন্ধু, একাকীত্বে সমাজ এবং বন্ধুহীনতার মাঝে সঙ্গীর কাজ করে। জ্ঞানই সুখের পথ দেখায়, লোভ থেকে সরিয়ে রাখে, বন্ধুদের সাহচর্যে অলঙ্কারের কাজ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে বর্মের কাজ করে। জ্ঞানের শক্তিতেই ঈশ্বরের সেবক মহত্বের শীর্ষে পৌঁছায়, ইহজগতে প্রবল প্রতাপান্বিতদের সঙ্গলাভ করে এবং পরজগতে পরম শান্তি লাভ করে।"

কোরান ঈশ্বরের ধারণাকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছে এবং বলেছে আল্লা (Allah) হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক শক্তি। জ্ঞান হচ্ছে সেই আল্লাকে স্পর্শ করবার এক অন্যতম উপায়।

ইসলামি দর্শনে বিশ্বাসী মানুষই পারে ঈশ্বরকে ছুঁতে। কোরানের উদ্দেশ্যকে অবিভক্ত ভারতের ইসলামি দার্শনিক ড. ইকবাল এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন কোরানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে "তার সঙ্গে ঈশ্বর এবং জগতের যে বহুবিধ সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কে উন্নততর চেতনা জাগ্রত করা" (a higher consciousness of his manifold relations with God and the Universe)। ড. ইকবাল এই বলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন, "তোমার অহং সত্তাকে এমন পর্যায়ে উন্নত কর যাতে ঈশ্বর তোমার ভাগ্য নির্ধারণ করার আগে স্বয়ং তোলার সঙ্গে আলোচনা করেন" (Exalt thy ego so high that God himself will consult thee before determining the distiny)।

"খুদী কো কর বুলন্দ ইতনা, কি হর তকদীর সে পহলে,
খুদা বন্দে সে খুদ পুছে, বতা তেরী রজা ক্যা হ্যায়?"

ইসলামি দর্শনের তাই লক্ষ্য হচ্ছে পরম ঐশ্বরিক সত্তাকে ব্যক্তিগত আত্মসত্তার উন্নয়নের মাধ্যমে উপলব্ধি। ইসলামি দর্শন তাই অন্তরে মানবতাবাদী। এই দর্শন মানবকেন্দ্রিক, মানুষের প্রকৃতি ও সত্তার উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে। ইসলামি দর্শনে বিশ্বাসী সৎ মানুষ সমাজে থেকেও ঈশ্বর উপলব্ধি করেন, তাঁর সৃজনশীল জীবন, প্রাকৃতিক শক্তিকে বিশ্লেষণ করার বৌদ্ধিক ক্ষমতা, ঈশ্বরের পথে নিজেকে আত্ম নিয়োগ ও সব কিছু সমর্পণ করা, আত্ম উপলব্ধি ও আত্ম উন্নয়ন, অসততার সঙ্গে আপোস না করা, প্রাকৃতিক ও সংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সর্বোপরি সাহস, সহ্যশক্তি ও মেহনত এর সাহায্যে। বলা হয় একজন দেবদূতের চেয়ে মানুষ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে এর জন্য চাই কঠিন অধ্যবসায় (It is better to be a man than an angel, but it requires a lot of perseverance.)।

"ফরিস্তে সে বেহতর ম্যায় ইন্‌সান্ বল্ না,
মগর ইস মে লগতী হ্যায় মেহনত জ্যদা।"

৩.৭.২ ইসলামি দর্শন ও শিক্ষা

সকল দর্শনের মতো ইসলামি দর্শন শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে।

জ্ঞানকেই সত্য আবিষ্কারের একমাত্র উপায় বলে ইসলাম মনে করে। এজন্যই বিশ্বাসী স্ত্রী-পুরুষের জন্য শিক্ষাকে আবশ্যিক বলেই হজরত মহম্মদ মনে করেন। এই দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত মানুষ তৈরি করা যে মানুষ সাফল্যের সঙ্গে নিজ আত্মার সঙ্গে বিশ্ব আত্মার সক্রিয় মিলন অনুভব করতে পারে। এজন্য পার্থিব জগতে বাসের জন্য উপযোগী ব্যবহারিক বৌদ্ধিক শিক্ষাকে অবহেলা করা চলবে না।

পরম বিশ্ব আত্মার উপলব্ধির জন্য পদ্ধতি হচ্ছে নির্জন স্থানে গভীর মনন সহযোগে ধ্যান (Intution)। এই Intution বৌদ্ধিক শিক্ষায়, বিশ্ব প্রকৃতির জটিলতা পর্যবেক্ষণে, ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে।

আধুনিক পাঠক্রম তখন সম্ভব ছিল না। ধর্মনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় ধর্ম শিক্ষা ছিল পাঠক্রমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আরবী ছিল অবশ্য পাঠ্য। আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামিক পাঠ্য বিষয়গুলি ছিল তিন ধরনের (১) ইলাহি অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় (২) রিয়াজ অর্থাৎ গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংগীত চিকিৎসা (৩) তাবিকি অর্থাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞান।

ইসলামিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা। এই বিদ্যালয়গুলি গৃহস্থ বাড়িতে অথবা মসজিদে রাষ্ট্র অথবা ভূস্বামী অভিজাতদের দানে পরিচালিত হত। এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা করার পরিসর এটা নয়। এই ইতিহাস এই পত্রের পরবতী অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামি অনুশাসনে উলেমাদের চরিত্র শক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সচ্চরিত্র শিক্ষকের কাছে পিতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে কঠোর শৃঙ্খলায় শিক্ষাদান কাজ পরিচালিত হতো। শিক্ষকগণ বিনিময়ে অর্থ নিতেন না। বেতন গ্রহণ করা ছিল 'গুণাহ'। শিক্ষকরা অনেকসময় জাকাতের টাকা থেকে এতিমখানা পরিচালনা করতেন।

ইসলামিক বিধি অনুযায়ী ঈশ্বরের পথে শিক্ষাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করা হয়েছে। সেজন্য ধর্মগুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন একই ব্যক্তি। শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ধর্মগুরুর নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত।

৩.৮ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা (A comparative study of western and Indian schools of philosophy)

সাদৃশ্য—

(১) উভয় দর্শনের গতিপথ শুরু হয়েছে নিসর্গ প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতি পূজার আবির্ভাব এই কারণেই।

(২) পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শন উভয়ই ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছে। গ্রিকদের অ্যাপেলো এবং ভারতীয় দর্শনের বহুদেববাদ (Polytheism) কে নিয়েই দর্শনের যাত্রা শুরু হয়েছে।

(৩) দর্শনের উভয় শাখারই স্বাভাবিকভাবে উপজীব্য বিষয় অধিবিদ্যা (Metaphysics), জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology), নীতিবিজ্ঞান (Ethics), তর্কবিজ্ঞান (Logic), নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics), মনস্তত্ত্ব (Psychotogy)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে।

(৪) উভয় দর্শনেই 'রহস্যবাদ' (Mysticism) আলোচিত হয়। সক্রেটিস অন্তর্জগতের "daimon" দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। প্রাচ্য ভারতীয় দর্শনে রহস্যবাদ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

(৫) বস্তু বিশ্লেষণে পরমাণুবাদ দুটি শাখার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে।

(৬) আত্মার বহুত্ব (Plurality of Selves) দুটি দর্শনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে।

(৭) স্থান কাল (Space-time), কার্য-কারণ তত্ত্ব (Theory of Causation) ঘিরে নানা সমস্যা দার্শনিক প্রসঙ্গ হিসাবেই দুটি শাখায় বিবেচিত হয়েছে।

(৮) পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দর্শন শাখাতেই—চিন্তাভাবনা বস্তুজগৎ, সংস্কৃতি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হচ্ছে—এই ধারণা বিদ্যমান।

(৯) উভয় শাখাতেই জগতের আধার এবং জগৎ পারাবার পেরিয়ে উন্মিলন (transcendence) এই দুই রূপেই ঈশ্বরকে ভাবা হয়েছে।

(১০) উভয় দর্শনই আত্মনিরীক্ষণকে গুরুত্ব দিয়েছে। উপনিষদের ঋষি যখন উচ্চারণ করেন 'আত্মানম্ বিদ্ধি' সক্রেটিস তখন বলেন— 'Know thyself' (নিজেকে জানো)।

(১১) উভয় দর্শন শাখাই স্বীকার করেছে— সকল বস্তুর সার, পরমসত্তা (The Absolute), ব্রহ্ম' (Brahma) বা 'প্রমা' বলে যা মনে করা হয়েছে তা যুক্তি, বুদ্ধির অগম্য।

(১২) 'মূল্যবোধ' দুটি শাখাতেই প্রাধান্য পেয়েছে।

(১৩) 'সত্য, শিব, সুন্দর' এর প্রতি উভয় শাখাই শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

বৈসাদৃশ্য—

(১) পাশ্চাত্য দর্শন বিচিত্র। বিচিত্র মত ও পথের সন্ধান এখানে পাওয়া গেছে। তাই এর পরিসর ব্যাপ্ত। এইভাবেই আমরা পেয়েছি ভাববাদ, বাস্তববাদ, জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি।

ভারতীয় দর্শন অত বিচিত্র নয়। ভারতীয় দর্শনের মূলগত ভাবনা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ভিত্তিক। পরবর্তীকালে, চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক দর্শন গড়ে উঠলেও—মূলভাবনাকে একেবারে অস্বীকার।

(২) পাশ্চাত্যদর্শন প্রাধান্য দেয় বহির্জগৎকে বিশ্লেষণের ওপর এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষ কীভাবে তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করবে সেই প্রক্রিয়ার ওপর। প্রাচ্য দর্শন বেশিটাই অন্তর্মুখিন। মানুষের মন, আত্মন্ (Self) এবং তার প্রকৃত স্বরূপ প্রাচ্য দর্শনে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

(৩) এই কারণেই পাশ্চাত্যদর্শন মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার বিশ্লেষণের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শন অনেক বেশি যুক্তিধর্মী (rational)। পাশ্চাত্যদর্শনের মূল প্রক্রিয়াটি বৌদ্ধিক। প্রাচ্য দর্শন যুক্তি তর্কতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন, নরায়দর্শন) গুরুত্ব দিলেও সেগুলি অতিক্রম করে Intution বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

(৪) পাশ্চাত্য দর্শনে দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিদার্শনিকের প্রাধান্যও থেকে গেছে। যেমন, আমরা বলে থাকি, হেগেলীয় ভাববাদ (Hegelian - Idealism), লক্ এর অভিজ্ঞতাবাদ (Locke's Empericism), বার্গসন্ এর সৃজনশীল বিবর্তনবাদ (Creative Evolution) ইত্যাদি।

ভারতীয় দর্শনে বেদান্ত, উপনিষদ এর ভাবনার প্রাধান্য। পরবর্তীকালে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ দর্শন ও যড় দর্শনের ভাবনা গড়ে ওঠে। তবে ব্যক্তি দার্শনিকের প্রাধান্য সেভাবে প্রচারিত নয়।

(৫) পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব মন ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে যায় নি। ভারতীয় দর্শন জ্ঞানতত্ত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছে।

(৬) মানুষের তিন ধরনের প্রকৃতি-জৈবিক প্রকৃতি (Biological nature), মানসিক প্রকৃতি (Psychological nature) এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতি (Spiritual nature)-র মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম দুটি প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয় আর ভারতীয় দর্শন তিনটি প্রকৃতিকে সমন্বিত করে।

(৭) পাশ্চাত্য দর্শনে স্বাধীনতা অর্জন সাপেক্ষ। ভারতীয় দর্শনে প্রতিটি ব্যক্তিরূপই স্বাধীন। সে সৎ, চিৎ, আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ। সে স্বরূপত স্বাধীন।

৩.৯ অনুশীলনী

১। সমসাময়িক প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

২। ব্রাহ্মণ্য দর্শন সম্পর্কে যা জান লেখো।

৩। বেদ ও উপনিষদ সম্পর্কে কী জান লেখো।

৪। বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। বৌদ্ধদর্শনের 'চারটি আর্যসত্য' ও 'জ্ঞানতত্ত্ব' সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করো।

৭। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৮। ইসলামি দর্শন সম্পর্কে তোমার পরিচিতি দাও।

৯। পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করো।

১০। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

(ক) 'ব্রাহ্মণ' ও 'সংহিতা' সম্পর্কে কি জান?

(খ) 'বেদাঙ্গ' ও 'ষড়দর্শন' কী?

(গ) 'পরা' ও 'অপরা বিদ্যা' কী?

(ঘ) চর্বাক দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করো।

(ঙ) জৈন দর্শন সম্পর্কে তোমার পরিচিতি দাও।

(চ) বৌদ্ধ দর্শনের 'দ্বাদশ নিদান' সম্পর্কে আলোচনা করো।

(ছ) বৌদ্ধ দর্শনের 'প্রতীত্য সমুৎপাদতত্ত্ব' কী?

(জ) 'স্কন্ধ' সম্পর্কে কী জান?

(ঝ) ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

১১। টীকা লেখো :

(ক) বেদ।

(খ) উপনিষদ।

(গ) বৌদ্ধ দর্শনের 'চারটি আর্যসত্য'।

(ঘ) বৌদ্ধ দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব 'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমান'।

(ঙ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

(চ) বৌদ্ধ দর্শনে অনিত্যবাদ্য ও অনাত্মবাদ।

(ছ) ইসলামি দর্শনের লক্ষ্য।

(জ) ইসলামি দর্শন ও শিক্ষা।

(ঝ) 'ধ্যানমূলক অনুমান' (Meditative Speculation)।

(ঞ) ত্রিপিটক।

১২। অতিসংক্ষেপে লেখো ঃ

(ক) চতুবর্ণ কী?

(খ) 'চতুরাশ্রম' কোন সময়ের অনুষ্ঠান?

(গ) 'উপনয়ন' কোন সময়ের অনুষ্ঠান?

(ঘ) 'প্রব্রজ্যা' কী?

(ঙ) উপনিষদের শব্দগত অর্থ কী?

(চ) ষড়বেদাঙ্গ কী?

১৩। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

(ক) মনু বলেছেন— বেদ হচ্ছে 'শ্রুতি' / 'স্মৃতি' / 'যুক্তি' / 'দ্বিজ'।

(খ) বৈদিক দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে— পরমাত্মার উপলব্ধি / নির্বাণ লাভ / ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তু প্রত্যক্ষণ / আত্মসংরক্ষণ।

(গ) ভারতীয় দর্শনের মূলে আছে— প্রয়োগবাদী চিন্তাভাবনা / যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা / বাস্তব অভিজ্ঞতা/ ধ্যানমূলক উপলব্ধি।

(ঘ) বেদের সংখ্যা — একটি / দুটি / তিনটি / চারটি।

(ঙ) বেদের সূচনা হল— খ্রিঃ পূর্ব ২০০০ অব্দে / খ্রিঃ পূর্ব ১০০০ অব্দে / খ্রিঃ পূর্ব ৫০০ অব্দে/ খ্রিঃ পূর্ব ১০০ অব্দে।

(চ) উপনিষদ রচিত হয়— খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ অব্দে / খ্রীঃ পূর্ব ৭০০ অব্দে / ১০ খ্রিঃ/১০০ খ্রিঃ।

(ছ) 'গুরুকুল' শিক্ষা— ব্রাহ্মণ্যযুগের শিক্ষা / বৌদ্ধযুগের শিক্ষা ইসলামি শিক্ষা / আধুনিক শিক্ষা।

(জ) বৌদ্ধ শিক্ষায় 'শ্রবণে' থাকার কাল— দশ বছরের / বারো বছরের / আট বছরের / আঠারো বছরের।

(ঝ) 'উপসম্পদা'য় থাকার সময়— আট বছরের / দশ বছরের / বারো বছরের / বাইশ বছরের।

(ঞ) বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম উৎস— বেদ / উপনিষদ / কোরাণ / ত্রিপিটক।

(ট) ইসলামি দর্শন— বহুদেববাদে / নিরীশ্বর বাদে / একেশ্বরবাদে—বিশ্বাসী।

একক ৪ □ মহান শিক্ষাবিদগণের শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophies of Great Educators)

গঠন

৪.১ প্লেটো (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭-খ্রিঃ পূঃ ৩৪৭)

৪.১.১ সক্রেটিসের প্রভাব

৪.১.২ প্লেটোর ভাববাদী দর্শন, শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা

৪.১.৩ উন্নত শিক্ষা

৪.১.৪ সাংস্কৃতিক ভাববাদ

৪.১.৫ শিক্ষার লক্ষ্য

৪.১.৬ শিক্ষাপদ্ধতি

৪.১.৭ পাঠক্রম

৪.১.৮ শিক্ষক

৪.১.৯ শৃঙ্খলা

৪.২ রুশো (১৭২২ খ্রিঃ অব্দ ১৭৭৮ খ্রিঃ অব্দ)

৪.২.১ জীবনী

৪.২.২ রুশোর শিক্ষাভাবনার পটভূমি

৪.২.৩ রুশোর দর্শন

৪.২.৪ রুশোর শিক্ষাভাবনা

৪.২.৪.১ শিক্ষার ধারণা

৪.২.৪.২ প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা

৪.২.৪.৩ শিক্ষার উৎস

৪.২.৪.৪ নেতিবাচক শিক্ষা ও ইতিবাচক শিক্ষা

৪.২.৪.৫ শিক্ষার লক্ষ্য

৪.২.৪.৬ পাঠক্রম

৪.২.৪.৭ শিক্ষাপদ্ধতি

৪.২.৪.৮ শৃঙ্খলার ধারণা

৪.২.৪.৯ শিক্ষকের ভূমিকা

৪.২.৪.১০ মেয়েদের জন্য শিক্ষা

৪.২.৪.১১ মূল্যায়ন

৪.৩ পেস্তালৎসি (১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে—১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ)

৪.৩.১ জীবনী

৪.৩.২ দর্শন ও শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা

৪.৩.৩ শিক্ষার লক্ষ্য

৪.৩.৪ পাঠক্রম

৪.৩.৫ শিক্ষণ পদ্ধতি

৪.৩.৬ শৃঙ্খলা

৪.৩.৭ শিক্ষক

৪.৩.৮ বিদ্যালয়ের ধারণা

৪.৩.৯ রুশো ও পেস্তালৎসি

৪.৩.১০ পেস্তালৎসির শিক্ষায় অবদান

৪.৪ ফ্রয়েবেল (১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ—১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ)

৪.৪.১ সংক্ষিপ্ত জীবনী

৪.৪.২ ফ্রয়েবেলের দর্শন

৪.৪.৩ শিক্ষার ধারণা

৪.৪.৪ শিক্ষার লক্ষ্য

৪.৪.৫ পাঠক্রম

৪.৪.৬ শিক্ষাপদ্ধতি (উপহার, কাজ, খেলা)

৪.৪.৭ শৃঙ্খলা

৪.৪.৮ শিক্ষক

৪.৪.৯ ফ্রয়েবেলের শিশু উদ্যানের ধারণা

৪.৪.১০ মূল্যায়ন

৪.৫ জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)

৪.৫.১ জীবনী

৪.৫.২ দর্শন

৪.৫.৩ শিক্ষার ধারণা

৪.৫.৪ শিক্ষার লক্ষ্য

৪.৫.৫ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও পাঠক্রম

৪.৫.৬ পাঠদান পদ্ধতি

৪.৫.৭ শিক্ষক

৪.৫.৮ বিদ্যালয়

৪.৫.৯ শৃঙ্খলা

৪.৫.১০ অবদান

৪.৬ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

৪.৬.১ জীবনী

৪.৬.২ জীবনদর্শন

৪.৬.৩ শিক্ষার সংজ্ঞা

৪.৬.৪ শিক্ষার লক্ষ্য

৪.৬.৫ গণশিক্ষা ও পাঠক্রম

৪.৬.৬ শিক্ষার পদ্ধতি

৪.৬.৭ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্ক

৪.৬.৮ শৃঙ্খলা

৪.৬.৯ নারী শিক্ষা

৪.৬.১০ কারিগরি শিক্ষা

৪.৬.১১ মূল্যায়ন

৪.৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

৪.৭.১ জীবনী

৪.৭.২ জীবন দর্শন

৪.৭.৩ শিক্ষার অর্থ

৪.৭.৪ শিক্ষার লক্ষ্য

৪.৭.৫ প্রকৃতির কোলে শিক্ষা (শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম)

৪.৭.৬ পাঠক্রম

৪.৭.৭ শিক্ষার মাধ্যম

৪.৭.৮ শিক্ষাদান পদ্ধতি

৪.৭.৯ শিক্ষকের ভূমিকা
৪.৭.১০ শৃঙ্খলা
৪.৭.১১ বিশ্বভারতী
৪.৭.১২ মূল্যায়ন
৪.৮ মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮)
৪.৮.১ জীবনী
৪.৮.২ জীবন দর্শন
৪.৮.৩ শিক্ষার অর্থ
৪.৮.৪ শিক্ষার লক্ষ্য
৪.৮.৫ পাঠক্রম
৪.৮.৬ শিক্ষাদান পদ্ধতি
৪.৮.৭ শিক্ষণ মাধ্যম
৪.৮.৮ শৃঙ্খলা
৪.৮.৯ শিক্ষক
৪.৮.১০ স্ত্রী শিক্ষা
৪.৮.১১ গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা
৪.৮.১২ মূল্যায়ন
৪.৯ অনুশীলনী

৪.১ প্লেটো (Plato) ৪২৭ খ্রিঃ পূঃ — ৩৪৭ খ্রিঃ পূঃ

৪.১.১ সক্রেটিসের প্রভাব (Influence of Socratis)

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের কাছাকাছি সময় গ্রিক দর্শনের সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত। এই সময়ের কিছু আগে দার্শনিক সক্রেটিস মৌখিক উপদেশ বিতরণ করে তরুণ সমাজের হৃদয় জয় করলেন। সক্রেটিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৬৯-খ্রিঃ পূঃ ৩৯৯) কে সেই সময়ে সকলে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী (Wisest man) বলে অভিহিত করেছিলেন। সক্রেটিসের দর্শন জ্ঞানলাভের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বলতেন 'জ্ঞান শ্রেষ্ঠ গুণ' (Knowledge is the greatest virtue)। এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রয়োজন সঠিক বিচার বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও প্রযত্ন। তিনি বলতেন মানুষের সে ক্ষমতা আছে। কারণ তিনি মনে করতেন মানুষ অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী। সক্রেটিসের মতে এইভাবে জ্ঞানার্জন ও আত্মজিজ্ঞাসা হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শুধু আত্ম জিজ্ঞাসা বা আত্মোন্নতি নয়, এমন আত্মোন্নতি যাতে ব্যক্তি সঠিকভাবে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য

বিধান করতে সক্ষম হয়। তাঁর শিক্ষণপদ্ধতি ছিল প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে জ্ঞানচর্চা (cultivation of knowledge)। এমনিভাবেই জ্ঞান প্রবাহ এগিয়ে চলত। সক্রেটিস মানুষকে চিন্তা করতে শেখাতেন, নতুন ধ্যান ধারণা গড়ে তোলার দিকে পরিচালিত করতেন। কিন্তু মানুষের বড় দুভার্গ্য তরুণ দলকে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার অপরাধে তাঁকে রাষ্ট্রের দ্বারা অভিযুক্ত হতে হল এবং বিষপানে বাধ্য করা হল। রাষ্ট্র বিরোধী সত্য চিন্তা তাঁকে স্তব্ধ করে দিল।

সক্রেটিসের ভাবশিষ্য প্লেটো (Plato) (৪২৭-৩৪৭ খ্রিঃ পূঃ) ছিলেন এথেন্সবাসী। প্লেটো সক্রেটিসের দর্শন চিন্তার বাতাবরণে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার পরিকল্পনা পরিবেশন করলেন।

৪.১.২ ভাববাদী দর্শন, শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা (Plato's Idealism and concept of Education)

প্লেটো বললেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্ভাবনার আবিষ্কার যাতে করে ওই সম্ভাবনা অনুযায়ী তার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।*

প্লেটোর মতে—শিক্ষা ব্যক্তির শারীরিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার সর্বাত্মক বিকাশ সম্ভব করে এবং কেবলমাত্র আত্মসত্তার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন নয় এর মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে যাতে সে দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্যক্তি মানুষ নয়, দক্ষ সামাজিক নাগরিক সৃষ্টিই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই বলা যায় তিনি ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে সামাজিক লক্ষ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

প্লেটো সমস্ত জীবন জগৎ সদা পরিবর্তনশীল এবং মূলতত্ত্ব অসংখ্য বলে মনে করতেন। তিনি বললেন, জগৎ দুটি ভাগে বিভক্ত— প্রত্যক্ষ বস্তু জগৎ এবং আধ্যাত্মিক ভাব জগৎ। তাঁর কাছে ভাবজগৎই সারসত্য, প্রত্যক্ষ বস্তু জগৎ নয়। তিনি বললেন, বস্তুর ক্ষয় ও ধ্বংস আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগৎ চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর। তাই তাঁর দর্শন ভাব বা Idea কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল। তাই আমরা বলি প্লেটো ভাববাদী। তাঁর কাছে মনের ভাবনার বাইরে কোনো বর্হিবস্তুর অস্তিত্ব নেই। প্লেটো বললেন জগৎ-এর মতো মানুষেরও দুটি অংশ দেহ ও মন বা আত্মা। দেহের লয় আছে, আত্মার লয় নেই। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোও তাঁর গুরুর মতো তত্ত্বজ্ঞান লাভের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় প্রতক্ষণের থেকে বুদ্ধি ও যুক্তি চর্চা বেশি জরুরি।

৪.১.৩ উন্নতশিক্ষা (Higher type of Education)

প্লেটো আরও বললেন যে, মানুষের বংশগতি নির্দিষ্ট। শিক্ষা বংশগতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সেজন্য উন্নত শিক্ষা তাকেই বলা যায় বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলিকে উন্নত ও সম্পূর্ণ করে। এ শিক্ষা স্বভাবতই সকলের দ্বারা সমানভাবে প্রাপ্ত হবে না এবং যারা সদ্ আত্মার অধিকারী তারাই সর্বোচ্চ শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এই উন্নত শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন, পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য চিত্তকে মুক্ত করা। ভারতীয় ধারণার অনুসারী এই লক্ষ্য হচ্ছে সত্য, শিব ও সুন্দরকে উপলব্ধি করা।

---

* "Education consists of giving to the body and the soul all the perfection of which they are susceptible."— Plato

৪.১.৪ সাংস্কৃতিক ভাববাদ (Cultural Idealism)

সংস্কৃতিভিত্তিক ভাববাদ (Cultural Idealism) মানব সংস্কৃতিকে মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার মহত্তম প্রকাশ বলে চিহ্নিত করেছে। মূলত প্লেটোর ভাবনায় এই সংস্কৃতি ভিত্তিক ভাববাদ পুষ্ট হয়েছে।

এই সংস্কৃতি ভিত্তিক ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে সক্রেটিস, প্লেটো, ডেকার্তে, হেগেল, স্পিনোজা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার প্রাঙ্গণে অন্যান্য অনেক দার্শনিকের মতো প্লেটো এই ভাববাদকে প্রয়োগ করলেন।

মানুষ একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে। যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পায় সেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, মনন ধর্মী, সৃজনধর্মী কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই সমাজ ও সংস্কৃতিকে উন্নত করে এবং এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারাকে 'মানবিক সৃজনীক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' (Grandest expression of human personality) বলা হয়ে থাকে।

৪.১.৫ শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of Education)

প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের মূলকথা হল শিক্ষার সামাজিকীকরণ এবং সামাজিক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করা যাতে করে সে যথার্থভাবে সমাজের কাজে এবং অগ্রগতিতে সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেজন্য যা কিছু সত্য, সুন্দর এবং সুমহান তা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। এরজন্য শিক্ষার লক্ষ্য হবে নৈতিক জীবনের মান উন্নত করা, ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা, ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের মাধ্যমে চিরন্তন সত্য শিব সুন্দরকে উপলব্ধি করা এবং ব্যক্তিসত্তাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের অগ্রগতিতে, সামাজিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা।

৪.১.৬ শিক্ষাপদ্ধতি (Method of Teaching)

প্লেটোর শিক্ষাদান পদ্ধতি তিনটি মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। (ক) গল্পচ্ছলে শিক্ষাদান (Story Telling), (খ) খেলাচ্ছলে শিক্ষা (Play-way), (গ) অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা (Imitatation)।

শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষণ কৌশল ছিল প্রয়োজনানুযায়ী ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং দলকেন্দ্রিক। প্লেটো খ্রিঃ পূঃ ৩৮৭ অব্দে গ্রিসে যে একাডেমি (Academy) প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে শিক্ষামূলক প্রদীপনের ব্যবহার করা হত। শিক্ষার্থীরা এখানে দলবদ্ধভাবে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করত।

৪.১.৭ পাঠক্রম (Curriculum)

শিক্ষার্থীদের জীবনে সত্য ও আদর্শ গড়ে তোলার জন্য পাঠক্রমে ভগবৎ চিন্তা সম্পর্কিত গল্পের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হল। শিশুর কল্পনা বিকাশের জন্য শিল্পচর্চা ও হাতের কাজে গুরুত্ব দেওয়া হল। আত্মার উন্নতি ও আনন্দ লাভের জন্য সংগীতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল। নারী সম্ভাবনার কথা মনে রেখে তাদের জন্য উপযুক্ত পাঠক্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হল।

প্লেটো বললেন বৌদ্ধিক শক্তির উন্নয়নের জন্য গণিত চর্চা এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য দর্শন চর্চা জরুরি। সেজন্য উচ্চ শিক্ষার পাঠক্রমে এগুলিকে অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দিলেন।

যে কোনও রকম কাজে সক্রিয়ভাবে যাতে অংশগ্রহণ করা যায় সেজন্য তিনি পাঠক্রমে শরীরচর্চার ওপর গুরুত্ব দেবার কথা বললেন।

৪.১.৮ শিক্ষক (The Teacher)

প্লেটো নির্দেশিত শিক্ষণ পদ্ধতির একটি নীতিতে অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তাই শিক্ষক নিজের কাজের মাধ্যমে সদাকার ও উন্নত ব্যক্তিত্ব সমন্বিত স্বরূপ হবেন। ছাত্রদের সঙ্গে সমবেতভাবে জীবন যাপনের মাধ্যমে তাদের পরিচালিত করবেন।

৪.১.৯ শৃঙ্খলা (Disaplin)

প্লেটোর ভাববাদ অনুযায়ী শিক্ষাভাবনায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবনে কিছু বাধ্যবাধকতা ও অনুশাসন মেনে চলতেই হবে। এই অনুশাসন ও বাধ্যবাধকতা তাদের জীবনে নৈতিকমান উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি করবে না, বরং সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

৪.২ জাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau)

৪.২.১ জীবনী (Life)

১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের (১৭১২-১৭৭৮) জেনেভা শহরে রুশো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফরাসি এবং পেশায় ঘড়ি প্রস্তুতকারক। মাতা ছিলেন সুইস ভদ্রমহিলা, যিনি রুশো জন্মাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই মারা যান। Confessions নামে লেখা রুশোর আত্মজীবনী থেকে তাঁর জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা জানা যায়। মাতা পিতার স্নেহবঞ্চিত হয়ে রুশো শৈশবে ছিলেন আবেগতাড়িত ও সংবেদনশীল। বহুদিন তাঁকে কঠিন কঠোর ভবঘুরের জীবন কাটাতে হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়ে পড়ার তিনি কোনও সুযোগই পাননি। ইতঃস্তত প্রকৃতির কোলে ঘুরে বেড়ানোয় তিনি প্রকৃতিপ্রেমী হয়ে উঠলেন। প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেন। পরবর্তীকালে প্রকৃতি সম্বন্ধে এই জ্ঞান ও ভালোবাসা তাঁর জীবনদর্শন ও শিক্ষাভাবনাকে প্রভাবিত করল।

অধিকাংশ শিক্ষাই তিনি নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লাভ করেছেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি ক্রমে ধীর, স্থির, সংযত, মননশীল হতে থাকেন। তিনি জীবনকথা এবং তৎকালীন সময়ের ইতিহাস পড়তে ভালোবাসতেন। গৃহশিক্ষক, সংগীয়তশিক্ষক, কম্পোজার, সচিব, নাট্যকুশলী ইত্যাদি বহুবিধ পেশায় ভাগ্য অন্বেষণের চেষ্টা করেও কোনওটাতে বেশিদিন মনোনিবেশ করতে পরেননি। অবশেষে আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি হলেন একজন সফল লেখক। তাঁর মননশীলতা ছুঁয়ে গেল রাষ্ট্রচিন্তা, ধর্মীয় চেতনা, সমাজনীতি, শিক্ষা, আরও কত কী। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনায় রুষ্ট হল প্রশাসন ও ধর্মীয় পরিমণ্ডল। ফলে তাঁকে স্বদেশ ছেড়ে আত্মগোপন করতে হল। শেষে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় তিনি ফ্রান্সে ফিরে এলেন ও ১৭৭৮ সালে প্রয়াত হলেন।

রুশো রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির কয়েকটি হল 'A Discourse on the moral Effects of the Arts and

Sciences' (1750), 'The Origin of Inequality among Men' (1752), 'The Social contract' (1762) এবং 'The Emile' (1762)।

তাঁর 'এমিল' একজন কাল্পনিক শিশুকে নিয়ে পাঁচটি অধ্যায়ে লেখা বৃহৎ শিক্ষাভাবনা সম্বলিত উপন্যাস যা তাঁর সাহিত্যকীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে চিহ্নিত করা হয় এবং মনে করা হয় যে এই গ্রন্থের ভাবনা সারা বিশ্বের সমস্ত শিক্ষাভাবনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। 'এমিল' ও 'সোস্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে তাঁর দর্শনভাবনাও বিধৃত হয়েছে।

৪.২.২ রুশোর শিক্ষাভাবনার পটভূমি (The background of Rousseau's educational theories)

অষ্টাদশ ভাবধারার সঙ্গে নতুন ভাবধারার সংঘর্ষে, নতুন চেতার জন্ম নিল প্রায় সর্বস্তরে। শিক্ষাতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ও সামাজিক, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের প্রাধান্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি, প্রাচীন রীতি, অনড়, মূল্যবোধ, কুসংস্কার, ধ্রুপদী চিন্তা, সাধারণ মানুষের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভলটেয়ার ও রুশো বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। এই বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া স্পন্দিত হল ভল্‌টেয়ারের 'জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলন' (Illumination movement) এবং রুশোর প্রকৃতিবাদী বিপ্লবের (naturalistic movement) মাধ্যমে। ভলতেয়ারের আন্দোলন ছিল মূলত বৌদ্ধিক ও অভিজাতশ্রেণি কেন্দ্রিক। ফলে অগনিত সাধারণ মানুষের অধিকার ও চাহিদা পূরণে ব্যর্থ এই আন্দোলন সকলকে স্পর্শ করতে পারল না। ক্রমে কৃত্রিম ও প্রথাসর্বস্ব হয়ে উঠল। অপরদিকে রুশোর প্রকৃতিবাদী ভাবনা বৌদ্ধিক আভিজাত্যের বিরুদ্ধে সাধারণ, আদিম মানুষকে স্থান দিল সবার ওপরে এবং দাবী করল তার জন্য শিক্ষা হবে প্রকৃতি প্রদত্ত জন্মগত অধিকার। এতদিন শিক্ষাজগতে বৈষম্য ছিল। সবার জন্য শিক্ষায় সুযোগ ছিল না। দরিদ্র পরিবারের সন্তান শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল তাও ছিল গতানুগতি, জীবন বিমুখ অবদমনমূলক একটি প্রক্রিয়া।

মনরো (Monroe) পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেছিলেন 'রুশোর আগে শিশুদের ভুল করে বয়স্কদের ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করা হতো যেমন টেলিস্কোপের বিপরীত প্রান্তে ছোট জিনিসকে বড় দেখায় (''Privious to Roussean's period the child was merely the adult viewed through the wrong end of the telescope)। ব্যক্তি শিশুর কোনো স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল না। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ ছিল না। পুঁথিকেন্দ্রিক কৃত্রিম শিক্ষায় শিশুর প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার কোনো উপাদান ছিল না। বড়রা নিজস্ব চিন্তাভাবনা শিশুদের ওপর বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দিতেন। মরলি (Morley) বলেন, 'রুশোর তত্ত্ব আগেকার পচাগলা ধারণাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এবং শিক্ষা সম্পর্কে পূর্বতন রুদ্ধ সংস্কার বদ্ধমূল ধারণাকে পাল্টে দিল এবং পূর্বেকার নার্সারি ও বিদ্যালয়ের অবরুদ্ধ শ্রেণিকক্ষে আলো বাতাসের বন্যা বইয়ে দিল' (The fermenting ideas of te age which overflowed in his theories, cleared away the accumulation of clogging projudices and obsseure and inveterate usage which made education one of te dark formalistic arts ; and it admitted floods of light and air into the tightly closed murseries and school rooms.)।

১.২.৩ রুশোর দর্শন (Roussean's Philosophy)

রুশোর দর্শন ছিল প্রকৃতিবাদ (Naturalism)। এমিল গ্রন্থের শুরুতেই তিনি লিখলেন, ''প্রকৃতি প্রদত্ত সব কিছুই

ভালো, কিন্তু মানুষের হাতে তা কলুষিত হয়" (Everything is good as it comes from the hands of the Author of nature ; but everything degencates in the hands of man)। তিনি একজন প্রতিবাদী বিপ্লবী দার্শনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর দর্শন সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ বঞ্চনার, বিরোধিতা করে গড়ে উঠেছিল। 'Social Contract' গ্রন্থে তিনি বললেন, "জন্মমুহূর্তে মানুষ স্বাধীন, কিন্তু পরবর্তীতে সর্বত্র সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ" ('Man is born free, but every where in chains')।

রুশোর দর্শনের মূলকথা হল 'প্রাকৃতিক মানুষ' (Natural man), 'প্রাকৃতিক সভ্যতা' (Natural Civilization), 'প্রাকৃতিক রাষ্ট্র' (Natural State)।

'প্রাকৃতিক রাষ্ট্র' এবং 'প্রাকৃতিক মানুষ' বলতে তিনি আদিম সমাজব্যবস্থা এবং আদিম অসভ্য মানুষ বোঝাননি। 'প্রাকৃতিক সভ্যতা' বলতে তিনি এমন পরিবেশ বুঝিয়েছেন যা কৃত্রিম পারিপার্শ্বিকতায় আবদ্ধ নয় এবং যা ওই কৃত্রিম পরিবেশের কলুষ স্পর্শে কলুষিত নয়। 'প্রাকৃতিক মানুষ' হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজস্ব প্রকৃতির নিয়মে (by the laws of his own nature) বিকশিত হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মে তার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তিনি মনে করতেন 'শহর হচ্ছে সভ্যতার সমাধিস্থল' (Cities are graves of civilisation)। 'প্রাকৃতিক রাষ্ট্র' বলতে তিনি এক সরল কৃষি সমাজ অথবা এক কলুষমুক্ত সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন যা বড় নগররাষ্ট্র, দুর্নীতিপরায়ণ শাসক বা শ্রেণির কলুষে কলুষিত নয় এবং বিলাসবর্জিত (Natural state is a simple forming community or state without the evils of large ciies corrupt rulers, social classes and luxury)।

সেজন্য রুশো মন্তব্য করলেন "শিশুকে একাকী থাকতে দাও। তাকে তথাকথিত সভ্য মানুষ হওয়ার চেয়ে প্রাকৃতিক মানুষ হতে দাও। তাকে এক প্রাকৃতিক অবস্থা পেতে দাও; কৃত্রিম পরিবেশ যেন তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশকে বাধা দিতে না পারে।" ("Leave the child alone. Let him be a natural man rather than a civilized man. Let him have a state of nature rather than artificial surroundings that stunt the proper growth and arrest his natural development".)।

৪.২.৪ রুশোর শিক্ষাভাবনা (Educational thoughts of Rousseau)

৪.২.৪.১ শিক্ষার ধারণা (Concept of Education)

রুশো কেবল কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ বা জ্ঞান সঞ্চয়কে শিক্ষা বলে মনে করতেন না। বাইরে থেকে কৃত্রিম জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা নয়। শিক্ষা হচ্ছে শিশুর অন্তরস্থ স্বাভাবিক সহজাত ক্ষমতা ও সামর্থ্যের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। তাঁর মতে ব্যক্তির গড়ে ওঠার বিভিন্ন স্তরগুলিতে যে সব শারীরিক ও মানসিক বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলিকে স্বাভাবিক পথে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করাই শিক্ষা। রুশোই প্রথম শিশুর শৈশবকে যোগ্য মর্যাদা দিলেন। তিনিই প্রথম বললেন শিশুর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা, রুচি, আগ্রহকে তার বেড়ে ওঠার পথে মর্যাদা দিতে হবে, সব কিছুকে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করতে হবে, সেগুলিকে ঠিক পথে পরিচলনায় সহায়তা করতে হবে। শিশুর শিক্ষা কেমন হবে তা তিনি তাঁর 'এমিল' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বর্ণনা করে গেছেন।

৪.২.৪.২ প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা (Education according to Nature)

রুশোর মতে প্রত্যেক শিশু জন্মসূত্রে স্বভাবত একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি (innate psychological nature) নিয়ে জন্মায়। তাকে ঘিরে থাকে নৈসর্গিক প্রকৃতি (Phenomeral Nature) এবং মনুষ্যসৃষ্ট সামাজিক প্রকৃতি (Manmade social nature)। সমাজের কৃত্রিম প্রকৃতি থেকে রুশো শিশুকে দূরে রাখতে বললেন। তিনি বললেন, সহজ স্বাভাবিক নৈসর্গিক প্রকৃতির কোলে মনুষ্য সমাজের কলুষ মুক্ত আবহাওয়ায় নিজস্ব রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, সামর্থ্য অনুসারে স্বভাবজ বিকাশই হবে শিক্ষা। এই প্রকৃতিগত শিক্ষা সমাজের রীতিনীতি প্রথানুসারী হবে না। মানুষ বিকাশের পথে নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সব প্রকৃতির নিয়ম (natural laws) আবিষ্কার করে সেই প্রকৃতিদত্ত নিয়ম অনুসারে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। রুশো বলেছেন মনুষ্যত্ব এবং নাগরিকত্ব দুটির মধ্যে একটিকে আমাদের নির্বাচন করতে হবে। একই সময়ে 'মানুষ' ও 'নাগরিক' দুই সত্তা তৈরি করা যায় না ("We must choose between making a man and a citizen for we cannot make both at once")। ব্যক্তি মানুষকে তৈরি করাই রুশোর শিক্ষাভাবনার মূল উদ্দেশ্য।

৪.২.৪.৩ শিক্ষার উৎস (Sources of Education)

রুশোর মতে মানুষের শিক্ষক তিনটি : প্রকৃতি (Nature) মানুষ (Men) এবং বস্তুনিচয় (things)। ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ এবং মানসিক প্রবণতা ও ক্ষমতার বিকাশ হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত। এই বিকাশকে কীভাবে বাস্তবে ব্যবহার করতে হবে তার হদিশ পাওয়া যায় ব্যক্তি উৎস থেকে। পারিপার্শ্বিক বস্তু সামগ্রী থেকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তি যা অর্জন করে তাই তার বস্তুগত শিক্ষা। এই তিন উৎস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা যখন সমলক্ষ্যে পরিচালিত হয় তখন ব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে।

৪.২.৪.৪ নেতিবাচক শিক্ষা এবং ইতিবাচক শিক্ষা (Negative Education and Positive Education)

রুশো গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী প্রদত্ত শৈশবের ও বাল্যকালের শিক্ষাকে ইতিবাচক শিক্ষা (Positive Education) বলে ব্যাখ্যা করলেন। এই শিক্ষা নানা উপদেশ, তত্ত্ব, তথ্য বাইরের থেকে অপরিণত মনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত করার শিক্ষা। তিনি বললেন জীবনের প্রথম পর্যায়ে মনে যখন অপরিপক্ক, দৈহিক সংবোলগত অঙ্গ যখন অপরিণত এখন এই শিক্ষা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি এর পরিবর্তে ১২ বছর বয়সকালের আগে শিশুকে নেতিবাচক শিক্ষা (Negative education) দিতে বললেন। মন রাখতে হবে নেতিবাচক শিক্ষা মানে কোন কিছুই না শেখানো বা অলসজীবন যাপন, বোঝায় না। নেতিবাচক শিক্ষা বলতে বোঝায় শিক্ষা এই সময় বাচনিক (Verbal) হবে না। শিশু কেবলমাত্র নিজস্ব অভিজ্ঞ তার ভিত্তিতে পরিবেশ, বস্তু, দৃশ্য, অপরিচিত ও অজানা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবে ও তার পরিবর্তীকালের বৌদ্ধিক শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণের জন্য নিজেকে তৈরি করবে এবং জ্ঞানের জগতে প্রবেশের জানলা (gateways of knowledge) যে ইন্দ্রিয়গুলি (Sense organ) সেগুলি প্রকৃতির কোলে ভালোভাবে গড়ে তোলার প্রয়াস পাবে। এই সময় শিশুকে প্রত্যক্ষ কোনো নির্দেশনা দেওয়া চলবে না, প্রকৃতিতে মুক্ত হয়ে খেলার ছলে বেড়ে উঠতে দিতে হবে।

ইতিবাচক শিক্ষা বলতে রুশো গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষাকে বোঝালেন যা বাইরে থেকে বয়স্করা নিজের পছন্দমত জোর করে শিশুদের ওপর চাপিয়ে দিতে চান এবং শিশুদের অকালেই পরিণত করে তুলতে চান।

ইতিবাচক শিক্ষার সঙ্গে নেতিবাচক শিক্ষার পার্থক্য কী তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"I call a positive education one that tends to form the mind prematurely and to instruct the child in the duties that belong to a man. I call a negative education one that tends to perfect the organs that are the instruments of knowledge before giving this knowledge directly; and that endeavours to prepare the way for reason by the proper exercise of the senses."।

তিনি আরও বললেন, নেতিবাচক শিক্ষাকে শিশুকে সদগুণ শেখায় না, বদগুণ অর্জন থেকে বিরত করে। সত্যটা প্রত্যক্ষভাবে না শিখিয়ে অসত্য থেকে রক্ষা করে। পরিণতি প্রাপ্তিতে সত্যটা উপলব্ধি করে এবং ভালোবাসে। তার আগে নেতিবাচক শিক্ষা সেটিতে প্রত্যক্ষভাবে না শিখিয়ে শিশুকে তার জন্য প্রস্তুত হবার পথ দেখায়। রুশোর কথায় "It does not give virtue it protects from vice ; it does not inculcate truth, it protects from error. It disposes the child to take the path that will lead him to truth, when he has reached the age to understand it ; and to goodness when he has acquired the faculty of recognizing and loving it."

৪.২.৪.৫ শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of education)

গতানুগতিক শিক্ষায় মানসিক শক্তি (mental faculty) উৎকর্ষণের ওপর জোর দেওয়া হতো। শিশুদের বয়স্কদে ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করে তাদের ওপর বয়স্কদের ইচ্ছা অনুযায়ী বৌদ্ধিক শিক্ষা, জ্ঞান, নীতি, কৌশল জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হতো। ভাষা শিক্ষা ও ব্যাকরণের কচকচির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। শিশুদের আগ্রহ এতে উদ্দীপ্ত হতো না।

রুশো এই গতানুগতিক শিক্ষার সর্বতোভাবে বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা এক কৃত্রিম প্রক্রিয়া নয়, এটি স্বভাবত বিকাশমূলক প্রক্রিয়া। তাঁর মতে শিক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর অন্তরস্থ সহজাত ক্ষমতা ও প্রবণতার স্বাভাবিক বিকাশ। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞান আহরণ নয় ("It is a development from within, not an aeeretion from without".)। রুশোর মতে শিক্ষা একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Continuous process) এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলমান প্রক্রিয়া। এটি নিছক জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে অন্তর ক্ষমতার স্বভাবজ প্রসারণ। শিক্ষাই সম্পূর্ণ জীবনযাপন (complete living)। অনাগত, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য নিছক অবিচক প্রস্তুতি নয়। তিনি আরও বললেন 'প্রাকৃতিক মানুষ' (natural man) গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। 'এমিল' গ্রন্থে রুশো লিখলেন, ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের নিরিখে শিশুর একজন সৈন্য, একজন জেলাশাসক, একজন পুরোহিত হওয়ার আগে তার মানবিক গুণ সম্পন্ন প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা উচিত।

বয়ঃস্তর অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of education at different stages)

রুশো শিশুর শিক্ষাকে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগ করেছিলেন এবং বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন শৈশবে (পাঁচ বছর বয়স অবধি) শিশু নিজস্ব প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবে। বাল্যকালে (৫ বছর থেকে ১২ বছর বয়স অবধি) শিক্ষার লক্ষ্য হবে দেহ, ইন্দ্রিয়কে সুস্থ সুগঠিত

করে গড়ে তোলা। শারীরিক সুস্থতা রক্ষা করাই এ সময়ে শিক্ষার লক্ষ্য হবে। মনের শিক্ষা এ সময় চলবে না। প্রাক্কৈশোর কালে (১২ থেকে ১৫ বছর বয়স অবধি) শিক্ষার লক্ষ্য হবে ভবিষ্যতে ব্যবহারিক জীবনযাপন উপযোগী কিছু বৌদ্ধিক চর্চা করা। পরবর্তী পর্যায়ে (১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সে) শিক্ষার্থী পরিণত হয়েছে। অন্তঃকরণ গঠিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে তাকে মিশতে হবে। তাই এসময় শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর আবেগমূলক, নৈতিক এবং ধর্মীয় বিকাশ (emotional, moral and religions development)।

৪.২.৪.৬ পাঠক্রম (Curriculum)

পাঠক্রম হবে শিক্ষার লক্ষ্য অনুসারী। শৈশবে (৫ বছর বয়স অবধি) শিশুর পাঠক্রমে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। দুর্বলতা দুষ্ট কাজের সৃষ্টি করে তাই সমস্ত রকম দুর্বলতা থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে। শারীরিক সুস্থতার ওপর তিনি একসময় জোর দিতে বললেন। তিনি এসময় শিশুর কোনো অভ্যাস গঠনের বিরোধী ছিলেন। তিনি বললেন, "The only habit the child should be allowed to form no habit whatever"। তিনি আরও বললেন, বুদ্ধির সঙ্গে শিশুর প্রয়োজন মেটাতে হবে, তবে তার খামখেয়ালিপাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

বাল্যকালে (৫ বছর বয়স থেকে ১২ বছর বয়স অবধি) শিশুর যুক্তিবোধ নিদ্রিত থাকে, তাই শিক্ষকের তাকে বিরক্ত করা উচিত নয়। "child hood is the sleep of reason and the educator is not to disturb him in this sleep".। শিক্ষার মূল পদক্ষেপ তাই দ্রুত হবে না, গতি হবে ধীর, ক্রমান্বয়িত হবে বিকাশের প্রক্রিয়া। আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ততা সক্রিয়তা, স্বাধীনতা হবে শিক্ষার মূলনীতি সমূহ। শিক্ষা হবে নেতিবাচক। কোনো বাচনিক শিক্ষা এ সময় দেওয়া হবে না। ভাষা শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠক্রমে এসময় অন্তর্ভুক্ত হবে না। অঙ্গ প্রতঙ্গ, ইন্দ্রিয় সুগঠিত করে গড়ে তোলার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে দৈহিক অনুশীলন (Physical exercise) পাঠক্রমের বিষয়বস্তু হবে।

প্রাক্ কৈশোর কালে (১৫ বছর বয়স অবধি) শিক্ষার পাঠক্রমে প্রথম বৌদ্ধিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার্থী ভাষা, বিজ্ঞান বিষয়, গণিত, হাতে কলমে কাজ, মানবিক সম্পর্ক মূলক পাঠ, শিল্প, সংগীত, অঙ্কন ইত্যাদি শিখবে। বিজ্ঞান আবিস্কারের মানসিকতা, গণিত চিন্তার ক্ষমতা, অঙ্কন চোখ হাতের সমন্বয় ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবে। মানবিক সম্পর্ক মূলক পাঠ, সহযোগিতার মনোভাব, মানুষে মানুষে আর্থিক সম্পর্কের মনোভাব গঠনে বা বুঝতে সাহায্য করবে।

কৈশোরকাল এবং তৎপরবর্তী সময়ের (২৪ বছর বয়স অবধি) পাঠক্রমে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, যৌন শিক্ষা নান্দনিক শিক্ষা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে'। যেমন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধিতে ধর্ম, যৌনসম্পর্ক বুঝতে যৌন শিক্ষা, রুচির বিকাশে নন্দনতত্ত্ব শেখাতে হবে।

৪.২.৪.৭ শিক্ষা পদ্ধতি (Method of teaching)

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা দেয় এরকম গতানুগতিক, নীরস সহানুভূতিশূন্য শিক্ষাপদ্ধতি যা সমস্ত স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা দেয় রুশো তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বললেন, শিশুরা কাজের মাধ্যমে শিখবে।

নির্দেশনা হবে সহজ সরল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক। কথা তখনই দরকার হবে যখন কর্মভিত্তিক শিক্ষা একেবারেই কাজে আসবে না। তিনি বললেন, 'Teach by doing whenever you can, and only fall back upon words when doing is out of question''। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক (direct experience) বিষয় শিক্ষণ (object treaching) এর ওপর জোর দিলেন। তিনি বললেন উদাহরণই সব সময় বেশি কাজের হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষাদান পদ্ধতি আবিষ্কার পদ্ধতি (heuristic method)। রুশো বললেন, শিক্ষার্থী ভূগোল শিখবে বনে, প্রান্তরে সূর্য, পৃথিবী, গ্রহাদির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে, নদীর প্রবাহ, বৃষ্টি, তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণ বিচার করে। গাছপালা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভূবিদ্যা শিখবে। একইভাবে পদার্থবিদ্যা, রসায়নের নীতি ও ঘটনাসমূহ শিখবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে। গণি শেখানো হবে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে বিষয়কে যুক্ত করে। ইতিহাস কেবলমাত্র পাঠের মাধ্যমে শেখানো যেতে পারে। আরও বললেন, এগুলির পাঠ গৃহেই শুরু করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় শেখানো যায় ততক্ষণ প্রতীকের মাধ্যমে একেবারেই শেখানো উচিত নয়। কৈশোর সময়ে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত করা যেতে পারে।

৪.২.৪.৮ শৃঙ্খলার ধারণা (Concept of discipline)

রুশো বললেন, 'শিশুদের মুক্ত, স্বাধীন রাখো' ('Leave the Child') তিনি আরও বললেন, 'এমিলে'র জন্য বাইরে থেকে কোন চাপ দেওয়া চলবে না ('There should be absence of restraint for Emile')। চাপহীন মুক্ত পরিবেশেই শিশুর সহজাত ক্ষমতা ও সম্ভাবনার অবাধ বিকাশ সম্ভব। রুশো মনে করেছেন, কোন অন্যায় কাজের জন্য বাইরে থেকে শাস্তি দেওয়া অর্থহীন। শিশু অনেক সময় এই শাস্তির কারণই বোঝে না। দরকারে প্রকৃতিই ডাকে শাস্তি দেবে এবং শিশুর মধ্যে আপন আপনি শৃঙ্খলার বোধ গড়ে তুলবে। রুশো একে বললেন 'প্রাকৃতিক ফলাফলের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা' ('discipline by natural consequences')। রুশো মন্তব্য করলেন, শিশুকে তার কাজের প্রাকৃতিক ফল ভোগ করতে দাও। উদাহরণ স্বরূপ, শিশু আগুনে হাত দিলে, হাত পুড়বে এবং শিশু ফলের ভিত্তিতে শিখবে কী করা উচিত। ("Allow the child to suffer the natural results of his acts. For example it the child puts his hand into fire, let him burn his hand and learn by consequences")। তাঁর এই শৃঙ্খলার তত্ত্ব, 'দগ্ধ শিশু আগুনকে ভয় পায়' ('A burnt child dreads the fire') এই প্রবাদে বাক্য অনুসারী।

এই শৃঙ্খলাকে বলে 'আত্মশৃঙ্খলা' (Self discipline) বা 'মুক্ত শৃঙ্খলা' (free discipline)। এখানে শিশু নিজের কাজের কারণ বুঝে আপনাআপনি নিজেকে শুধরে নেবে।

৪.২.৪.৯ শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teacher)

রুশো বর্ণিত শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা অপ্রত্যক্ষ। শিক্ষক শিশুর বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করবেন না। শুধু দেখবেন, শিশু যাতে বাধাহীনভাবে নিরন্তর বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারে। তিনি শিক্ষার্থীর পরিবেশকে অনুকূল করে রাখার চেষ্টা করবেন, সমস্ত রকম সুযোগের সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেবেন। এক কথায়,

শিক্ষকের ভূমিকা হবে পরিচালকের, বন্ধুর পথ প্রদর্শকের। তিনি শিক্ষার্থীর নিত্যসহচর হয়ে তার জীবনোপযোগী বিভিন্ন পরিবেশ রচনা করবেন।

৪.২.৪.১০ মেয়েদের জন্য শিক্ষা (Education for women)

রুশো তাঁর 'এমিল' উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে মিলের যৌনশিক্ষার জন্য উপস্থিত করলেন 'সোফি' (sophy) নাম্নী এক যুবতীকে যিনি এমিলের জীবনসঙ্গিনী। এখানে রুশো সোফির শিক্ষা কেমন হবে তার বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেন, নারীর শিক্ষা হবে স্বামীর আনুগত্য অনুসারী। তার বৌদ্ধিক শিক্ষার একেবারেই প্রয়োজন নেই, সে তার মায়ের কাছে শৈশবে গৃহস্থালীর শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে। সে সেলাই, বন্ধন এই সব শিখবে। তার বচন হবে সুভাষিত, সে আচরণে হবে সংযত, সংহত। সে সব কিছু শিখবে তার পরবর্তী বিবাহিত জীবনের পারিবারিক সুখের জন্য। স্বামীকে সুখী করাই হবে নারী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। কোনো অবস্থাতেই নারীকে বৌদ্ধিক শিক্ষা দেওয়া যাবে না কেন বলতে গিয়ে রুশো বলেছেন, শিক্ষিত রমণী তা স্বামী, সন্তান ও সকলের কাছে কঠিন ব্যাধিস্বরূপ, তাকে পরিহার করা উচিত (''A woman of culture is to be avoided like pestilence. She is the plague to her husband, to her children, to her servants and to every body'')।

৪.২.৪.১১ মূল্যায়ন (Evaluation)

রুশোকে সর্বতোভাবে আধুনিক শিক্ষার জনক (father of modern education) বলা হয় বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ইচ্ছা বিরোধী প্রাকৃতিক স্বভাবজবিকাশ বিরোধী গতানুগতিক শিক্ষার নিগড় থেকে শিশুকে মুক্তির পথ দেখালেন রুশো। তাই আধুনিক শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতার জনক বলেও তাকে অভিহিত করা হয়।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের সব কিছুই প্রাসঙ্গিক এবং স্ববিরোধী নয় এ কথা বলা যাবে না। তাঁর নিজ জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে নারী শিক্ষার পরিকল্পনা করলে তা অগণতান্ত্রিক এবং বর্তমান সমাজে একেবারেই প্রাসঙ্গিক অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বের ভিত্তিতে শৃঙ্খলার ধারণাও পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে। কারণ, শিশু দগ্ধ হবার আগেই তাকে আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার শিক্ষা দেবার প্রয়োজন আছে।

কয়েকটি সমালোচনার বিষয় থাকলেও রুশোর শিক্ষাভাবনা অসাধারণত্বের দাবি রাখে। তিনিই প্রথম ব্যক্তির শিক্ষাকালকে কয়েকটি পর্যায়, যেমন শৈশব, বাল্যকাল, প্রাককৈশোর, কৈশোর ও তৎপরবর্তীকাল হিসাবে বিন্যস্ত করে সেই অনুযায়ী শিক্ষার ধারণা, পদ্ধতি, পাঠক্রম, উপকরণগুলি বিন্যাস মনস্তত্ত্ব নির্ভর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, আনন্দময় শিক্ষাপ্রক্রিয়া, সক্রিয়তা, আত্মশৃঙ্খলা, সৃজনশীলতা প্রভৃতি নতুন ধারণা গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনল। আধুনিক জগৎ আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উদার অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করল। তাঁর রচিত 'Social Contract' বইয়ে আদর্শ সমাজের যে চিত্র কল্পনা করেছিলেন, সেই সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসাবে রুশো গড়ে তুলতে চেয়েছেন। পূর্বকল্পিত আদর্শ অনুসরণ করার মধ্যে ভাববাদী দর্শন কাজ করেনি। এ কথা বলা যাবে না। রুশোর মতবাদ তাই প্রকৃতিবাদ ও ভাববাদের সংমিশ্রণ বলে মনে করা হয়। উভয়ের সংমিশ্রণে তিনি যে একটি পূর্ণ প্রাকৃতিক মানুষ তৈরি করার ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

রুশো ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় ইতিহাসে এক অবিসংবাদী ব্যক্তিত্ব যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য শিক্ষাকে স্পর্শ করেছিলেন।

পরিবেশকে ভিত্তি করে তাঁর তত্ত্ব গড়ে তুললেও এ কথা বলা যায় তিনি সময়ের জ্বলন্ত সমস্যাকে সঠিকভাবে বুঝে সঠিক চিন্তা করে সেগুলিকে সঠিক পথে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সমাধান করার ক্ষেত্রে ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। বলা যেতে পারে তাঁর হাত ধরেই আধুনিক চিন্তা সমন্বিত আধুনিক যুগ শুরু হল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলন তথা শিশু কেন্দ্রিকতার সৃষ্টিকর্তা।

৪.৩ পেস্তালৎসি (Pestalozzi) (১৭৪৬-১৮২৭)

৪.৩.১ জীবনী (Life History)

জোহান হাইনরিখ্ পেস্তালৎসি (Hohann Heinrich Pestalozzi) ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে সুইজার ল্যান্ডের জুরিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যখন অল্প বয়স তখন চিকিৎসক পিতা প্রয়াত হন। আত্মত্যাগী, দয়াশীল, স্নেহপ্রবণ, ধর্মপ্রাণা মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, যত্নময় পরিবেশে এক ভাই এবং বোনের সাহচর্যে পেস্তালৎসি পারিবারিক অনুকূল পরিবেশে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। বাড়ি থেকে কয়েকমাইল দূরে একগ্রামে বাসকারী ধর্মযাজক স্নেহপ্রবণ মাতামহও তাকে জীবন পথে গড়ে ওঠার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এইরকম স্নেহময় পরিবেশে লালিতপালিত হওয়ায় মানবজাতির প্রতি তার অগাধ আস্থা জাগল এবং তিনি তাঁর সারাজীবন তত্ত্বে ও বাস্তবে দরিদ্র অবহেলিত, অনুন্নত মানুষের উন্নতির স্বার্থে আত্মনিয়োগ করলেন।

পেস্তালৎসির প্রারম্ভিক ও বিদ্যালয় শিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি। তবে পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন চিন্তাবিদের সংস্পর্শে আসেন। সুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Bodmer-এর অনুপ্রেরণায় তিনি সরল জীবনের মাধ্যমে উন্নত চিন্তা করা (plain living and high thinking)-র নীতিতে বিশ্বাসী হন এবং বিলাস, সম্পদ ও জাগতিক সমৃদ্ধিকে ঘৃণা করতে শেখেন। রুশোর আদর্শ তাঁকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করে। তাঁর সন্তান জন্মাবার পর তিনি রুশোর শিক্ষাভাবাদর্শ অনুযায়ী তাকে মানুষ করার চেষ্টা করেন। পেস্তালৎসি সব সময়ই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখতে চেয়েছেন। এই চিন্তানুসারী হয়েই ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'Newhof' (New Farm)-এ দরিদ্র কৃষিজীবীদের কৃষির উন্নতপন্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান বেশিদিন চলল না। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে Stanz -এ দরিদ্র আবাস (Poor House) নামে অনাথ আশ্রয়হীন শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য এবং সমষ্টি জীবনযাপনে (Community living)-র সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য একটি অনাথশিবির তথা বিদ্যালয় খোলেন। নানা কারণে এটিও বেশিদিন স্থায়ী হল না। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে Burgdorf -এ একটি শিশু বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন এবং কয়েকবছর সেখানে সফলতার সঙ্গে কর্মভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়াস পান। এরপরে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে Yverdun এ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবত এখানে যুক্ত থেকে নিজের শিক্ষাসংস্কার মূলক চিন্তাভাবনাকে প্রয়োগের মাধ্যমে সার্থকতা নিরূপণে সচেষ্ট হন। অবশেষে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েক বছর তিনি গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন। সেগুলি তাঁর শিক্ষামূলক নীতিসম্ভার ও সরল গ্রাম্যজীবন কথা নিয়ে লেখা। এগুলি হল 'Father's Journal','The Evening hours of a Hermit', 'Leonard and Gertrude', 'How Gertrude Teaches Her Children', 'The Swan Song', 'My experiences'।

পেস্তালৎসি সন্তান জন্মানোর পর রুশোর শিক্ষাভাবনা জাত 'এমিল'-এর অনুসরণে তিনি নিজের সন্তানকে মানুষ করতে চান। এই প্রক্রিয়া হাত তাঁর শিক্ষাভাবনা 'Fathers Journal'- এ বিকৃত হয়েছে। ''The Evening Hours of a Hermit''-এ তিনি বাড়ির পরিবেশ শিশুর কাছে কীভাবে অনুকূল ও বাঞ্ছিত করা যেতে পারে তা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বিদ্যালয় পরিবেশও হবে 'রূপান্তরিত গৃহ পরিবেশ' (Transformed home)। 'Leonard and Gertrude' একটি কৃষিক পরিবারের জীবন নিয়ে রচিত, যেখানে Gertrude একজন দয়াপরবক্তা, স্নেহময়ী, সৎ রমণীর ভূমিকায় অতি যত্নে সন্তান লালন পালন করেন এবং Leonard কীভাবে পরবর্তীকালে স্ত্রীর ভূমিকায় উদ্দীপ্ত হয়ে সৎ জীবনযাপনের প্রবৃত্ত হয়েছে তাই দেখানো হয়েছে। 'How Gertrude Teacher Her children' এ শিক্ষার নীতি ও পন্ধতি সম্পর্কে পেস্তালৎসির নিজস্ব ধারণার বর্ণনা আছে। মৃত্যুর আগে লেখা 'The Swan Song' এবং 'My Experiences' বই দুটিও পেস্তালৎসির শিক্ষামূলক পরিণত ধ্যানধারণার ফসল।

৪.৩.২ দর্শন এবং শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা (Philosophy & Concept of Education)

রুশো এবং অন্যান্য নবজাগরণ ও নবজাগরণ পরবর্তী শিক্ষাবিদগণের মতো পেস্তালৎসি ছিলেন প্রকৃতিবাদী দর্শন শাখায় বিশ্বাসী একজন চিন্তাবিদ। এই দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে তিনি শিক্ষায় ব্যক্তিস্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন, 'একটি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়াই শিক্ষা'। সব মানবশিশুর জীবনের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। তিনি অনুভব করলেন যে চিরাচরিত গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা পাবার ক্ষেত্রে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, সুবিধাভোগী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। তিনি বললেন, শিক্ষা হবে সার্বজনীন। এতে আছে সবার জন্মগত অধিকার। পুঁথিপড়াই শিক্ষা নয়, টুকরো টুকরো জ্ঞান সামগ্রী আহরণ করাই শিক্ষা নয়। মানব প্রকৃতির সমস্ত ধরনের বিকাশ প্রক্রিয়াই শিক্ষা। এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে তিনি শিক্ষা সংস্কারের তিনটি উপায় বাতলালেন—(১) সংস্কার শুরু হবে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, (২) ব্যক্তিকে আত্ম সহায়তা (Self help) এবং আত্ম সম্মান (Self respect) করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। (৩) এজন্য শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির সহজাত সম্ভাবনা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধন। তিনি বললেন শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের বৌদ্ধিক, নৈতিক ও দৈহিক ক্ষমতাগুলির আভ্যন্তরীণ বিকাশ প্রক্রিয়া, কৃত্রিম বিকল্প মাধ্যমে গড়ে ওঠা নয়।

রুশোর প্রকৃতিবাদী ভাবনায় ভাবিত হয়ে শিশুর প্রকৃতিগত বিকাশকে পেস্তালৎসি বড় করে দেখেছেন এবং দ্বর্থ্যহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আমি শিক্ষা ও নির্দেশনাকে মনস্তত্ত্ব নির্ভর করতে চাই' ('I wish to phychologise education and instruction')। মনস্তাত্বিক ভাবধারার বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষা কৃত্রিম প্রক্রিয়া মানব-প্রকৃতিতে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির বিকাশই হল শিক্ষা। তিনি তার এই ঘোষণাকে কেবলমাত্র তত্ত্ব কথায় সীমাবন্ধ রাখলেন না। একে আন্দোলনের রূপ দিলেন। জন সাধারণ এবং বিশেষ করে শিক্ষকদের সচেতন করলেন শিশুর মনকে সার্বিকভাবে

সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে বুঝতে শিখতে এবং সেই অনুযায়ী তাদের শিক্ষা দিতে। সেজন্য পেস্তালৎসিকে শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলনের অগ্রদূত বলা হয়। এই আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শিক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রকে এক বৈপ্লবিক রূপ দিল। মনরোর (Monroe)-র কথায়, "রুশোর তত্ত্বে এবং পেস্তালৎসির প্রয়োগে, শিশুর বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুর প্রতি সহানুভূতিই শিক্ষা প্রক্রিয়ার এক প্রয়োজনীয় উপাদান" ("Made theory by Roussean, made practice by Pestalozzi, Sympathy with the child, intellectually, morally and physically has come to be recognized as an essential element in the education process")।

শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানিক করে গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে পেস্তালৎসি বললেন শিক্ষা যেন সমাজতাত্ত্বিক হতে পারে এবং সমাজ সংস্কারের উপায় হিসাবে কাজে লাগতে পারে। শিক্ষাকে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন সবার কাছে উন্মুক্ত করার কথা বলে তিনি শিক্ষাকে গণতন্ত্রীকরণের ওপরও জোর দিলেন।

৪.৩.৩ শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

পেস্তালৎসি মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কাজের উৎসাহ (Spontaneous desire for action) কে ভিত্তি করে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে গঠন করা।

মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে 'ব্যক্তির সহজাত সম্ভাবনা ও ক্ষমতার স্বাভাবিক, প্রগতিপূর্ণ, সুসামঞ্জস্য বিকাশ' ('natural progressive and harmonious development of the powers and capacities of the human being')। তিনি আরও বললেন, ব্যক্তির নিজের ভালোর জন্য এবং সমাজের ভালোর জন্য সৎ চিন্তায় সৎজীবনযাপন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর মতে শিক্ষা একাধারে ব্যক্তির আত্ম উন্নয়ন এবং সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

৪.৩.৪ পাঠক্রম (Curriculum)

পুঁথি পড়ার প্রয়োজনীয়তাকে পেস্তালৎসি খুব বেশি গুরুত্ব দেন নি। তিনি বলেছেন, লিখন, পঠন, গণিত (Three R's) শেখার থেকেও প্রয়োজনীয় হল শিক্ষার্থীদের কিছু হয়ে ওঠার শিক্ষালাভ ('really important thing for them is to be something')। শিক্ষকদের কাছে তিনি আবেদন রাখলেন, এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ব্যর্থ হলে তাঁরা কিছু করে দেখান ('You should do for the children, what their parents fail to do for them')। শিশুকেন্দ্রিক, মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক শিক্ষার পথিকৃৎ পেস্তালৎসি, ব্যক্তি শিশুর প্রবণতা, আগ্রহকে ভিত্তি করে সামাজিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রমকে সাজালেন। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হল ভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিপাঠ, খেলাধূলো, নাচগান, হাতের কাজ, শিল্পমূলক কাজ, গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ, রং করা, উৎপাদনশীল কাজ ও নৈতিক শিক্ষা। এগুলি শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশে সহায়তা করবে। শিশুমনের ক্রমান্বয়িত বিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে বয়সোপযোগী সরল থেকে জটিল, জানা থেকে অজানায়, যাবার নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন বয়ঃস্তর অনুযায়ী পেস্তালৎসি পাঠ্য বই লিখলেন।

৪.৩.৫ শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching)

পেস্তালৎসির শিক্ষাদান পদ্ধতিও মনোবৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক ও গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারী। এই নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে তিনি শ্রেণিশিক্ষায় বস্তুনির্ভর পাঠদান পদ্ধতি (Object lesson)-র ওপর জোর দিলেন। এই পদ্ধতির প্রধান কাজ হল শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ সংযোগ (Direct acquaintance, concrete experience) স্থাপন করা। এটি শিশুকে বিষয়টি ভালোভাবে আত্মীকরণে সাহায্য করে। জ্ঞানমূলক বিষয়কে তিনি কাঠিন্য অনুযায়ী ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে শিশুর সামনে পরিবেশিত করতেন। এই খণ্ডাংশগুলির তিনি নাম দিলেন Syllabaries। রুশোর মতো তিনিও শিশুর ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা (Sense traing)-এর ওপর জোর দিলেন। কারণ সুস্থ সবল পরিমার্জিত ইন্দ্রিয় শিশুকে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নে ও পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবে এবং শিশু আত্মশিক্ষনে (Self-learning) উৎসাহিত হবে।

৪.৩.৬ শৃঙ্খলা (Discipline)

পেস্তালৎসি বললেন, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি, সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা শিখবে। এই শৃঙ্খলা আসবে শাস্তির ভয়ে নয়, ভালবাসার কাছে নতিস্বীকারের মাধ্যমে। এই শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়া নয়, শিক্ষার্থীর নিজের ইচ্ছানুযায়ী নিয়মকানুন মেনে নেওয়ার প্রবণতা (Wilful submission to some rules and regulations by the learner)। একে বলে আত্ম শৃঙ্খলা (Self-discipline)।

৪.৩.৭ শিক্ষক (The Teacher)

পেস্তালৎসি দেখেছেন, গতানুগতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে নি, কেবল কতকগুলি বাইরে থেকে ধার করা ধারণা শিক্ষক তার ওপরে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি দেখলেন, শিক্ষকের এতকাল কাজ ছিল বাইরের জ্ঞান ভিতরে (from without to within) চাপান এবং বললেন এখন কাজ হবে শিশুর অন্তঃশক্তিকে বাইরে (from within to without) টেনে আনায় সাহায্য করা। পেস্তালৎসি শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ যাতে সঠিক এবং ত্বরান্বিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বললেন। বললেন ইন্দ্রিয়গুলি পরিমার্জিত হলে প্রকৃতিই শিশুকে পথ বাতলে দেবে কীভাবে বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে হয়। শিক্ষার্থীর সকল রকম সত্তার বিকাশে যাতে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় তা দেখাই শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষক থাকবেন সাহায্যকারীর ভূমিকায়।

৪.৩.৮ বিদ্যালয়ের ধারণা (School Idea)

পেস্তালৎসি বললেন, এমন পরিবেশে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে শিশু যত্ন, শক্তি, ভালোবাসা, মমতা, সহানুভূতি পাবে যেমন গৃহে মার কাছে পায়। বিদ্যালয়ের পরিবেশেও এইভাবে আদর্শ সুসংহতভাবে তৈরি করতে হবে। "The Eening Hours of Hermit" পুস্তকে তিনি এরকম পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন বিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে হবে 'রূপান্তরিত গৃহ' (Transformed home) রূপে।

৪.৩.৯ রুশো ও পেস্তালৎসি

প্রকৃতিবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রুশো শিক্ষা সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক ভাবনা দিলেন, পেস্তালৎসি সেই ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং বাস্তব রূপ দিলেন। রুশো ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী, পেস্তালৎসি ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সমাজকল্যণকে মেলালেন। রুশো সমাজের প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিকে চেয়েছেন, বলেছেন সমাজ ব্যক্তিকে কলুষিত করে। পেস্তালৎসি দেখালেন কীভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তির বিকাশে কাজে লাগান যায়। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে পেস্তালৎসি ইতিবাচক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করলেন। উভয়েই শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা ও সামর্থ্যের বিকাশ রূপে দেখেছেন। উভয়েই স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা, মুক্ত শৃঙ্খলা, স্বতঃস্ফূর্ততা, কর্মকেন্দ্রিকতা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি ভিত্তিক শিশু শিক্ষার কথা বলেছেন। রুশো প্রয়োগ করে দেখাননি, পেস্তালৎসি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। রুশোর শিক্ষায় স্বভাবতই বিদ্যালয়ের কোনো ভূমিকা ছিল না। পেস্তালৎসি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন এবং রুশোর তত্ত্ব এবং নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন কীভাবে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক করা যায়। দুজনেই বলেছেন শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সমার্থক। দুজনেই মনে করেছেন জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে সম্পূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে তোলা যায়। পেস্তালৎসি কোনো এক জায়গায় বলেছেন, 'আমাদের সব ধরনের বিদ্যালয় আছে। আমরা চাই মানুষ তৈরির বিদ্যালয়', রুশো শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান গেয়েছেন, 'প্রাকৃতিক মানুষ' তৈরি করতে চেয়েছেন, পেস্তালৎসি একই সঙ্গে শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক প্রবণতাকে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন।

৪.৩.১০ পেস্তালৎসির শিক্ষায় অবদান (Pestalossi's contribution in Education)

আধুনিক শিক্ষা জগতে পেস্তালৎসি একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর শিক্ষাভাবনা সমগ্র ইউরোপে পেস্তালৎসির আন্দোলন রূপে খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁর জীবনমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা, পাঠক্রম রচনা ও পদ্ধতি নির্বাচনে মনস্তাত্ত্বিকতা, বস্তুপাঠ, স্বতঃস্ফূর্ত কর্মউদ্দীপনাকে প্রাধান্য দেওয়া, অনাথ শিশুদের জন্য ভাবন, শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন, মুক্ত শৃঙ্খলার ধারণার প্রবর্তন, শিক্ষাকে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করা, শিশুমন অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা করা, কৃষি উন্নয়ন, জন শিক্ষা ও শিক্ষায় উৎপাদনশীলতার প্রবর্তন, সার্বজনিন শিক্ষার ধারণা প্রবর্তন ইত্যাদির দ্বারা তিনি সত্যিই শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন ভাবধারার জন্ম দিয়েছেন। এটা আধুনিক কালে সকলেই স্বীকার করেন যে, হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল, স্পেনসর, মন্টেস্বরী প্রমুখ পরবর্তীকালের চিন্তাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারগণ অনেকেই তাঁর কাছে ঋণী। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা নিয়ে বাস্তব পরিকল্পনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা, ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের ধারণা আজ সারা বিশ্বের প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচনায় এবং পদ্ধতি নিরূপণে বহুলাংশে প্রভাব ফেলেছে।

৪.৪ ফ্রয়েবেল (Froebel) (১৭৮২-১৮৫২)

৪.৪.১ সংক্ষিপ্তজীবনী (Short Life History)

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ জার্মানির Thuringian অরণ্যাঞ্চলে এক ছোট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফ্রেডরিক উইলহেম অগাস্ট ফ্রয়েবেল (Fredrich Wilnelm August Froebel)। তাঁর পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। মাতা তাঁর যখন মাত্র নয় মাস বয়স তখন প্রয়াত হন। পিতা আবার বিবাহ করায় একেবারে শিশু বয়সে স্নেহবঞ্চিত পরিবেশে অবহেলিত শৈশব কাটাতে বাধ্য হন। একক অসুখী জীবনযাপনে বাধ্য হন। তাঁর এই জীবন অভিজ্ঞতায় পরবর্তী পরিণত জীবনে তিনি শিশুদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হন এবং তাদের জীবনকে সর্বতোভাবে আনন্দময় দেখতে চান।

দশ বছর বয়সে তাঁর মামা তাকে দত্তক গ্রহণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পাঠে খুব একটা অগ্রসর হতে পারলেন না। পনেরো বছর বয়সে বন বিভাগে শিক্ষানবিশের কাজে যোগদান করেন। দু বছর তিনি এখানে ছিলেন। এখানে নিজস্ব দেয় কাজের চেয়ে তিনি প্রকৃতির কোলে আত্মমগ্ন হয়ে অধিকাংশ সময় গাছপালা, পশুপাখি কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে কাটিয়ে দিতেন। নিবিড় প্রকৃতির পরিবেশে তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক হয়ে উঠলেন এবং প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক 'ঐক্যসূত্র' (Law of Unity) আবিষ্কার করলেন, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে দার্শনিক চিন্তা সৃষ্টিতে কাজে লেগেছিল। সতেরো বছর বয়সে জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে দার্শনিক অধ্যাপক শিলার, (Schiller), ফিকটে (Fichet), শেলিং (Schelling)-এর সংস্পর্শে আসেন। এদের মতবাদ তাঁকে অধ্যাত্মবাদে প্রেরণা জুগিয়েছে। বিখ্যাত প্রাণী বিজ্ঞানী Batsch-র বিবর্তনতত্ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করেছে।

অর্থাভাবের কারণে তিনি জেলা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে প্রায় চার বছর ভাগ্য অন্বেষণে একটার পর একটা কাজ ধরেছেন এবং ছেড়েছেন। এ সবের মধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্টের পেস্তালৎসিয় ইনষ্টিটিউট মডেল স্কুলে শিক্ষকের কাজে যোগদান করে তিনি বুঝতে পারেন শিক্ষকতাই তাঁর আসল পেশা হওয়া উচিত। তিনি বললেন, "এখানে এসে মনে হল, অনেকদিন ধরে চাইলেও যা অধরা ছিল, তার যেন এখানে দেখা পেয়েছি আমার জীবনে যা সহজাত উপাদান তা যেন আবিষ্কার করতে পেরেছি। আমি জলে মাছের মতো, বাতাসে বিহঙ্গের মতো আনন্দ এখানে উপলব্ধি করেছি ("It seemed as if I had found something I had never known, but always longed for — as if my life had at last discovered its native element. I felt as happy as a fish in the water or a bird in the air')। ফ্রয়েবল, ১৮০৭ থেকে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে পেস্তালৎসির অধীনে কাজ করে তাঁর শিক্ষাভাবনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলেন যা পরবর্তীকালে নিজস্ব শিক্ষাভাবনা ও প্রয়োগ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার উদগ্র বাসনায় তিনি আবার Gottimger বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু করেন। তাঁর পড়াশোনা আবার বাধাপ্রাপ্ত হয় দেশের ডাকে মিলিটারিতে যোগ দেবার ফলে। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনি ওই চাকরি ছেড়ে ফিরে আসেন।

পেস্তালৎসির প্রভাব তাঁর পিছু ছাড়ল না। শিশু শিক্ষা বিষয়ে নানা পরীক্ষা, নিরীক্ষার জন্য কিলহাউ (Keilhau) নামে ছোট্ট একটি গ্রামে তিনি ১৮১৬ খ্রিঃ এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নয় বছর ধরে তিনি 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' এবং 'আত্মসক্রিয়তা'র নীতির ভিত্তিকে শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষামূলক গবেষণা চালান। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত বই 'Education of Man' প্রকাশিত হল।

এইসব শিক্ষামূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিশুশিক্ষা বিষয়ে নতুন ভাবনা গড়ে উঠল ফ্রয়েবেলের মানসিক জগতে। অবশেষে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কিলহাউ এর অনতিদূরে Blackenburg-এ মনোরম স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশে স্থাপন করলেন তাঁর প্রথম 'Kindergarten' নামে বিদ্যালয়। 'Kindergarten'-এর অর্থ 'শিশু উদ্যান'। পরবর্তীতে এই জাতীয় আরও বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং 'শিশুউদ্যানে' সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী শিক্ষা উপকরণেরও পরিকল্পনা করেন।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। 'Education of Man' ছাড়া তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তকগুলির মধ্যে 'Pdagogies of the Kindergarten', 'Education by development' 'Mother Play and Nursery Songs' উল্লেখযোগ্য।

৪.৪.২ ফ্রয়েবেলের দর্শন (Froebel's Philosophy)

ফ্রয়েবেল চরম ভাববাদী দর্শনে (absolute Idealism) বিশ্বাসী ছিলেন। জড়, অজড়, আধ্যাত্মিক জগৎ, মননের জগৎ সবকিছুই এক সূত্রে গ্রথিত বলে তিনি মনে করতেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের নীতিই তাঁর দর্শন চিন্তার নির্যাস। তাঁর 'Education of Man' গ্রন্থে তিনি লিখলেন—সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি শাশ্বত নীতি বিরাজ করছে। এই সর্বব্যাপী নীতিটি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান, প্রাণবন্ত, আত্মসচেতন সত্তার ওপরে নির্ভর করছে সেই সত্তা আর কিছুই নয়— এক অখণ্ড ঐক্য। এই ঐক্যই ঈশ্বর। সমস্ত বিষয়ের উৎপত্তি এই ঈশ্বর। বিশ্বের সমস্ত কিছুই এই ঐক্যসূত্রের বাঁধনে আবন্ধ। ("In all things there lives and regins an eternal law. This all-pervading law is necessarily based on an all-pervading, energetic, living, self, conscious being, and hence eternal Unity. This unity is God. All things have come from the Divine Unity, from god, and have their origin in the Divine Unity, in God alone. god is the sole source of all things. All things live and hae their being in and through the Divine Unity, in and through God")। এই তত্ত্বকে বলা হয় সর্বব্যাপকতাবাদ (Pantheism) যা ফ্রয়েবেলের দর্শনের ভিত্তিভূমি। এই মতের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ভাবনার সাদৃশ্য পাই। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরাও উপলব্ধি করেছেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সর্বত্র ঈশ্বর বিরাজমান। ফ্রয়েবেলের ভাবনায় আমরা যেন পাই ভারতীয় শাশ্বত সত্যের সেই অনুরণন।

তাঁর সূচিত ঐক্যসূত্র তাই বলে মানুষ, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর ঐক্যের বন্ধনে আবন্ধ। 'প্রকৃতি' এবং 'মানুষ' বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একে অপরের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে। এই ঐক্যসূত্রের বন্ধনের মধ্যে আবন্ধ থেকেই বিষয়সমূহের বিচিত্র প্রকাশকে উপলব্ধি করতে হবে।

তাঁর 'বিকাশের তত্ত্ব' (theory of development) ও অত্যন্ত স্পষ্ট ও সংহত। ফ্রয়েবেল বললেন, এক পরম

লক্ষ্যকে অনুসরণ করেই প্রত্যেকটি বিষয়ের বিকাশ সম্ভব। প্রত্যেকের মধ্যেই পরম সত্তার অবস্থিতি বিদ্যমান। পরম আনন্দময় স্বতস্ফূর্ত সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় চিন্ময় পরমাত্মার ক্রমান্বয় প্রকাশ ও উপলব্ধিই 'বিকাশ' বলে তিনি মনে করেছেন। ফ্রয়েবেলীয় জীবন দর্শনে তাই যুক্ত হয়েছে আত্মবিকাশতত্ত্ব যা 'বিবর্তনবাদের ফসল' বলে মনে করা হয়।

প্রত্যেকটি প্রাণী, বস্তু নিজস্ব প্রান্তরিক সৃজনশীল সার্বজনীন শক্তির উদ্দীপনায় বিকশিত হয়। এই বিকাশ পরিমাণগত ও পরিধিগত বৃদ্ধি নয়। এটি হচ্ছে অন্তরস্থ উপাদানগুলির নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী সমন্বয়মূলক বিকাশ। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বললেন, মনের তিনটি কাজ হচ্ছে জানা (knowing), অনুভব করা (feeling), ইচ্ছাপ্রকাশ করা (Willing)। এই তিনটি একইভূত হয়ে লক্ষ্যমুখে ধাবিত হলে মনের বিকাশ সম্ভব। এই বিকাশ আত্ম উৎপাদিত (Self produced). আত্মপরিচালিত (Self maintained) এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত (Self directed)। ফ্রয়েবেলের দর্শন তাই বলে, 'প্রত্যেকটি ব্যক্তি সার্বজনীন ঐক্য সূত্রের অনুসরণে আত্মসক্রিয়তা সহকারে কর্মোদ্দীপনার মাধ্যমে অন্তর থেকে বিকশিত হয়' ('develop from within, self active and free, in accordance with the eternal law')। ব্যক্তির এই বিকাশ নিছক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সম্ভব নয়। এর জন্য অনুকূল সামাজিক পরিবেশ অবশ্যই প্রয়োজন।

৪.৪.৩ শিক্ষার ধারণা (Concept of Education)

ফ্রয়েবেল তাই শিক্ষাকে গতানুগতিক ধারণানুসারী কৃত্রিম, জ্ঞান আহরণমূলক প্রথাগত নীরস একটি প্রক্রিয়া বলে মনে করলেন না। তিনি শিক্ষাকে মানব শিশুর আনন্দময়, স্বতস্ফূর্ত আত্ম সক্রিয়, আত্ম বিকাশমূলক একটি প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করলেন যে বিকাশ সম্ভব হবে আনন্দময়, কর্মমুখর, একটি প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে। এই বিকাশের গতি হবে ঊর্ধ্বমুখী ও ক্রমান্বয়ী (Self as cending and gradual)। ফুলের পাপড়ি মেলে ধরার মতো আত্মবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ক্রমে ব্যক্তি সৃষ্টির উৎস অখণ্ড ঐক্য তথা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পাবে। শিক্ষা হচ্ছে এই বিকাশের একটি উপায় (means)।

৪.৪.৪ শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ শিক্ষার ধারণানুসারীই হয়। বিশ্বজগতের আধ্যাত্মিক সত্তার একটি অংশ হল ব্যক্তি মানুষ। ব্যক্তির অন্তরে নিহিত সেই পরমাত্মা ও অখণ্ড ঐক্য জীবনে উপলব্ধি করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। সৃজনশীলতা, সক্রিয়তা ও আনন্দময় অনুভবের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বের মহাপ্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে। শিক্ষার লক্ষ্য তাই ব্যক্তিত্ব গঠন। ফ্রয়েবেল বললেন মানব সমাজে শিক্ষা অন্য মানুষের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ("Education is possible in co-operation with other men")।

তাই বলা যায়, ফ্রয়েবেলের মতানুসারে অন্য মানুষের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সামাজিক পরিবেশে সক্রিয় সৃজনশীল আনন্দময় কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আত্ম অনুভূতি, আত্ম বিকাশ এবং অন্তরে নিহিত পরমাত্মা ও অখণ্ড ঐক্যকে উপলব্ধি করা এবং সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব গঠন করাই শিক্ষার লক্ষ্য।

৪.৪.৫ পাঠক্রম (Curriculum)

ফ্রয়েবেল, শিক্ষায় শিশুর আত্মবিকাশ (Self development) এবং স্বাধীন বিকাশ (free development)-এর নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই নীতি অনুসরণ করে পাঠক্রম নিরূপণ করেছিলেন।*

পাঠক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেল প্রকৃতিপাঠ ও পর্যবেক্ষণ। ফ্রয়েবেল মনে করতেন প্রকৃতির মাধ্যমে ঈশ্বর শিশুর কাছে প্রকাশিত হন ('Nature reveals Godo to the Child), প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য নৈতিক উন্নতি, আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি করে। প্রকৃতিপাঠের সঙ্গে তিনি লেখা, পড়া, ভাষা শিক্ষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, নাচ, গান, ছড়া, গল্প বলা, বিভিন্ন ধরনের খেলা, আঁকা, রং করা, হাতের কাজ, আবৃত্তিকে যথাযথ গুরুত্ব দিলেন। তিনি বললেন, 'লেখা' কে অঙ্কনের বিশেষ প্রয়োগ হিসাবে শেখানো যেতে পারে এবং এটিকে 'পড়া'র আগে শেখানো উচিত। যতখন না পর্যন্ত শিশু কথা বলা না শিখছে ততক্ষণ 'পঠন' শেখানো উচিত নয়। গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, তিনি মনে করেন হৃদয় ও ধর্ম যেমন পৃথক নয় তেমনি গণিত ও বৌদ্ধিক চর্চা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ('human intellect is as inseparable brrom mathematics as the human heart from religion')। তিনি মনে করতেন, নাচগান, ছড়া, আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ মনের ছন্দ ও সুষমা অর্জিত হয়। আঁকার মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যবোধ গড়ে ওঠে। রূপকথার গল্প কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটায়। গল্পশোনা ও বলায় শিশুকে পরবর্তী জীবনে ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী করে তোলে। খেলার দ্বারা দেহ গঠিত হলে গল্প মন তৈরি করে।

৪.৪.৬ শিক্ষা পদ্ধতি (Method of Teaching)

পদ্ধতি রূপায়ণের জন্য ফ্রয়েবেল সৃষ্টি করলেন, গঠনমূলক, সৃজনাত্মক, স্বয়ং শিক্ষণকেন্দ্রিক, কর্মভিত্তিক কিছু উপকরণ যা বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারে, আত্মোপলব্ধিতে, আনন্দ সঞ্চয়নে, দেহমন গঠনে, শিশু ও বালককে সাহায্য করবে। এই উপকরণগুলিকে তিনি নাম দিলেন 'উপহার' (Gifts) এবং 'কাজ' (Occupations)।

উপহার (Gifts) : উপহারগুলি হল বিচিত্র ধরনের — (১) ছয়টি রঙ-এর নরম ছয়টি উলের বল— খেলার ছলে শিশু রং-এর পার্থক্য নিরূপণ করতে শিখবে, নরম বস্তুর ধারণা পাবে। (২) বিভিন্ন মাপের কাঠের ঘনক, গোলক, চোঙ— যাতে শিশুরা বিভিন্ন আকার, আয়তন, কাঠিন্য, মসৃণতা সম্পর্কে ধারণা পাবে। দুই ইঞ্চি কাঠের ঘনকে সমান আটটি ঘনকে ভাগ করে বা আরও বেশি যেমন সাতাশটি ঘনকে ভাগ করে শিশুদের সামনে উপস্থাপিত করলেন। এইভাবে দু ইঞ্চি ঘনককে আটটি সমান্তরিক খণ্ডাংশে বিভক্ত করলেন। এতে শিক্ষার্থীরা জ্যামিতিক গঠন ও ক্ষেত্রের ধারণা পাবে ক্ষেত্র পরিমাপ করতে শিখবে। ভগ্নাংশের ধারণা যেমন অর্ধাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ, এক নবমাংশ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিত হবে। (৩) এছাড়াও তিনি কাঠের তৈরি পাতলা বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন মাপের গোলাকার আংটা (rings) শিশুদের দিলেন। এগুলির ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা গাণিতিক ধারণা, সৃজনশীল কাজ ও বিচিত্রমুখী শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হতে পারল। সমস্ত

---

* "The purpose of teaching is to bring over more out of man rather than to put more and more into him" — Froebel, 'Education of Man' (W. N. Hailmann's translation).

জিনিসগুলিই ছড়া ও গানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করতে শেখানো হত।

ঘনকের গানটি এই রকম ঃ

"Eight corners, and twelve edges see,
And faces six, belong to me ;
One face behind, and one before
One top, One bottom, that makes four,
One at the right, at left side one,
And that counts six, if rightly done."

কাজ (Occupations) : 'কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—মাটির মূর্তি তৈরি করা, কার্ডবোর্ডের মডেল তৈরি, কাগজ কাটা, ভাঁজ করা, কাঠ খোদাই করা, অঙ্কন করা, রং করা, মোমের কাজ করা ইত্যাদি। শরীরের বলবৃদ্ধির জন্য অন্তর্ভুক্ত হল মাটি কাটা, ভার বহন করা ইত্যাদি। মার্চ করে গানের মাধ্যমে বেশির ভাগ অধ্যায়নের বস্তু শেখানো হত। এতে দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুশীলনের মাধ্যমে, পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু সব কিছু জানত, প্রকাশ করতে পারত।

খেলা (Play) : তাঁর পদ্ধতির প্রধানতম উপাদান হল 'খেলা' (Play)। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ করতে পারে। তিনি বলেছিলেন, শৈশবের স্বতস্ফূর্ত খেলায় ভবিষ্যতের মানুষটি চিহ্নিত হয়। শৈশবের খেলাতেই শিশু-চারাগাছ ভবিষ্যতের বিশাল মরীরুহে পরিণত হয় ("The future man can be found through the spontaneous play of the child. Childhood play is the youngplant which will encate the big tree of the future".)। খেলা, নাচগান, নানা কাজের মধ্য দিয়ে শিশু তার আগ্রহ, প্রবণতা, রুচি, সামর্থ্য অনুসারে বিকতি হয়। উপহার নির্বাচনে ফ্রয়েবেল দার্শনিক ভাবনাকে স্থান দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, বল, ঘনক, চোঙ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশু ঐক্য, বৈচিত্র্য, গতিশীলতা সম্পর্কে ধারণা পাবে। নানা রঙের, নানা আকারের প্রভেদ বোঝার সঙ্গে সঙ্গে জীবন জগতের গতিময়তা ও ঐক্যতত্ত্বেও দীক্ষিত হবে।

৪.৪.৭ শৃঙ্খলা (Discipline)

ফ্রয়েবেল তাঁর দর্শন অনুসারে শাস্তি ও অবদমনের মাধ্যমে শৃঙ্খলা আনয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বললেন, শিশুরা স্বাধীন চাপমুক্ত পরিবেশে, আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিখবে। তাই বলা যায় তিনি 'আত্মশৃঙ্খলা' (Self discipline)-র সমর্থক ছিলেন এই 'আত্মশৃঙ্খলা' বাইরের চাপের কাছে নতিস্বীকার নয়, স্বতোৎসারিত আত্মবিকশের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় নিয়মকানুন মেনে চলার মধ্য দিয়ে দিব্য চেতনার উন্মেষ।

৪.৪.৮ শিক্ষক (The Teacher)

তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা পরিমণ্ডলে শিক্ষক হবেন শিশুর বন্ধু, সাথী, পথ প্রদর্শক দাদা অথবা দিদির মত। শিক্ষক এখানে হিতকারী সর্বাধ্যক্ষ (benevolent Superintendent) যিনি শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, নৈতিক, আত্মিক, সামাজিক, নান্দনিক বিকাশে সহায়তা করবেন। উদ্যানে চারাগাছের রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক মালির মতো বিদ্যালয়ে মানব শিশুর তত্ত্ববধান করবেন শিক্ষক।

৪.৪.৯ ফ্রয়েবেলের শিশু উদ্যানের ধারণা (Frobel's Kindergarten)

ফ্রয়েবেল তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম দিলেন 'শিশু উদ্যান' (Kindergarten)। উদ্যানের সহজ নৈসর্গিক মুক্ত পরিবেশ যেমন চারাগাছের বিকাশের পক্ষে অনুকূল, তেমনি বিদ্যালয় হবে আনন্দময়, কর্মমুখর, সহজ একটি পরিবেশ যা মানবশিশুর আত্মবিকাশের পক্ষে যথার্থ পরিমণ্ডল তৈরি করবে। এই বিদ্যালয়ের কাজ শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞান বিতরণ নয়, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে, সৃজনশীল কাজকর্মে সহায়তা করা। নীতি ছিল 'আত্মসক্রিয়তা' (Self activity), মাধ্যম ছিল 'খেলা' (Play)। লক্ষ্য ছিল সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাযুজ্যে দেহমনের অনুশীলন ও ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা (Sense training)-র মাধ্যমে জীবনের ভিত্তিভূমিতে পৌঁছে যাওয়া এবং দিব্য ঐক্যের (Divine Unity) উপলব্ধি। উপকরণ ছিল তাঁরই রচিত কতকগুলি 'উপহার' ও 'কাজ'। পাশে ছিলেন বন্ধুর মতো 'হিতকারী সর্বাধক্ষ্য' (benevolent Superintendent) শিক্ষক।

৪.৪.১০ মূল্যায়ন (Evaluation)

শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের অবদান অপরিসীম এবং অবিস্মরণীয়। তাঁর আগে অনেক দার্শনিকের দর্শন চিন্তা শিক্ষাভাবনার জন্ম দিয়েছে, কিন্তু তাঁর মতো কেউই দর্শনকে শিক্ষাক্ষেত্রে এত সুসংহত এবং সুসংবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তাঁর (১) 'ঐক্যসূত্র' বলে সব কিছুরই একই উৎস থেকে উৎপত্তি (২) তাঁর 'বিবর্তনের তত্ত্ব' ব্যাখ্যা দেয় জীবন বিবর্তনের নীতিতে ক্রম বিকাশমান এবং জীবনের বিকাশ অন্তঃশক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। এরই ওপর ভিত্তি করে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মসক্রিয়তার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই বলেছেন সমাজ বহির্ভূত পরিবেশে মানুষের বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষের বিকাশ সমাজ পরিবেশে সামাজিকতার মাধ্যমে সম্ভব। অন্যদিকে ঈশ্বরকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে তিনি 'প্রকৃতিপাঠ' এর ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দৈহিক অনুশীলন ও ইন্দ্রিয় পরিমার্জনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। খেলার মাধ্যমে আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষার কথা বলেছেন। বিদ্যালয়কে 'শিশুউদ্যান' রূপে গড়ে তোলার ধারণা তাঁকে জগৎবিখ্যাত করেছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির কিছু ত্রুটির দিকও আছে। প্রথমত, তাঁর 'উপহার (Gifts) উদ্ভাবনে অমূর্ত চিন্তা ছোট শিশুদের পক্ষে আত্মীকরণের পক্ষে খুবই জটিল। একটি বল দেখে বা নাড়াচাড়া করে বিশ্ব ঐক্য সম্পর্কে ধারণায় আসা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, তিনি খেলা ও কাজকে বৌদ্ধিক চর্চার থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর শিক্ষা পরিমণ্ডলে আধ্যাত্মিকতা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে যা বর্তমানের ব্যবহারিক জীবনে নিরর্থক মনে হতে পারে। অধিকন্তু কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়ার বিষয়টি খুব জরুরি। জরুরি সঠিক 'উপহার' ও কাজে'র মাধ্যমে শিক্ষা দান।

তাঁর শিক্ষানীতির কয়েকটি ত্রুটি ও সমালোচনার দিক থাকলেও একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায় আধুনিক শিক্ষা চিন্তার সমস্ত রকম প্রবণতা এবং বৈশিষ্ট্য ফ্রয়েবেলের রচিত ও ভাবিত শিক্ষাপরিকল্পনাকে স্বমহিমায় ভাস্কর করে তুলেছে। ফ্রয়েবেলের জীবন দর্শন ও শিক্ষা চিন্তার মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাঁর নিজের বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

"এসো, আমরা আমাদের শিশুদের জন্য বাঁচি"
("Come, Let us live for our children")।

৪.৫ জন ডিউই (John Dewey) ১৮৫৯-১৯৫২

৪.৫.১ সংক্ষিপ্ত জীবনী (Life)

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারমন্ট (Verment)-এর বার্লিংটন (Burlington)-এ আমেরিকার বিখ্যাত প্রয়োগবাদী দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী তথা ব্যবহারিক জীবনে প্রকৃত শিক্ষক জন ডিউইর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সাধারণ দোকানদার। ডিউই শিশু বয়সে গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ হন। শৈশবে তাঁর বাবার দোকানে বসে মন দিয়ে গ্রাম্য লোকেদের মন্তব্য ও আলোচনা শুনতেন। এতে তিনি গ্রাম্য সমাজের বিভিন্ন কার্যকলাপ বিষয়ে দলবন্ধ আলোচনা কতটা শক্তিশালী হতে পারে তা বুঝেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করলেন।

(১) বিদ্যালয়ের চিরাচরিত পদ্ধতিতে শিক্ষা ছিল ব্যর্থ তথা নিষ্ফল।

(২) দৈনন্দিন জীবনে মানুষে সঙ্গে সংস্পর্শ স্বাভাবিক, গতিময়, অনন্ত শিক্ষণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় ঘটায়।

কুড়ি বছর বয়সে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। প্রথম পেশা হিসাবে কিছুদিন স্কুল শিক্ষকতা করেন। পরে আবার দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। এখানে তিনি চার্লস্ পিয়ার্স (Charles S. Peirce)-এর নিকট দর্শন, স্টানলি হল এর কাছে মনোবিজ্ঞান এবং হার্বার্ট বি. এডামসের কাছে রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মিনেসোটা (Minnensota) এবং পরে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকবছর কাজ করে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার যৌথ বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগ দেন এবং দশ বছর এখানে অধ্যাপনা করেন। এই সময়কালেই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীন 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রারম্ভিক বিদ্যালয়' (University Elimentary School) স্থাপন করেন যা 'Laboratory School' নামে খ্যাত। এই বিদ্যালয় 'Experimental School', 'Active School' নামেও পরিচিত লাভ করেছে। এই 'ল্যাবোরেটরি স্কুল' তাঁকে জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দিল। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিষয়ে তিনি এই বিদ্যালয়ে সমস্ত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত থেকে তিনি শিক্ষাবিষয়ে তাঁর সমস্ত মতবাদ হাজির করলেন।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে, ডিউই নিউইয়র্ক্ সিটির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এখানে তিন দশক অধ্যাপক পদে কাজ করে পরে দশবছর এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এখানেই অবসর জীবনে যুক্ত থাকাকালীন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনই তিনি শিক্ষা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র অধিবিদ্যা (Metaphysics), নীতিশাস্ত্র, সমাজ বিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়েই তাঁর জগৎজোড়া খ্যাত বহুপঠিত পুস্তক 'Democracy and Education, (1916)' রচিত হয়।

শিক্ষা বিষয়ে রচিত তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে—'The School and the Society', 'The child and the Curriculum', 'Relation of Theory to Practice in the Education of Teachers', 'The School

and the child', 'Moral Principles in Education', 'How we think', 'Schools of tomorrow' 'Democracy and Educaztion', 'Education to-day' ?

৪.৫.২ দর্শন (Philosophy)

উনবিংশ শতকে জন ডিউই প্রয়াগবাদী দর্শন দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হন। তাঁর শিক্ষাগুরু চার্লস্ পিয়ার্স ছিলেন প্রয়োগবাদ (Pragmatism)-এর প্রবক্তা। পরবর্তীকালে জন ডিউইর মাধ্যমে এই দর্শনের অগ্রগতি ঘটে। প্রয়োগবাদ অনুযায়ী

(১) যা কিছু ব্যবহারে উপযোগী যা বাস্তবে কাজ করে তাই সত্য, যা কাজ করে না তা মিথ্যা।

(২) সত্য পরিবর্তনীয়, চিরন্তন সার্বজনীন, স্থায়ী কোন বিষয় নয়। যা আজ সত্য বলে প্রতিভাত, তা আগামীকাল মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে।

(৩) ঈশ্বর বা পরম সত্তার অস্তিত্বকে প্রয়োগবাদ বিশ্বাস করে না।

(৪) যখন কোনো বিশ্বাস বাস্তবে যথার্থতা প্রমাণে কার্যকরি তখন সেটাকে আঁকড়ে ধরার অধিকার আছে। কোনো বিশ্বাস বা মূল্যবোধ স্থায়ী ও দৃঢ়বন্ধ নয়।

(৫) আমাদের বিশ্বজগৎ অনিশ্চয়তায় ভরা। পরিবর্তন এখানে জীবের নিয়ম। কাজের মাধ্যমে মানুষ যখন সফল হয় তখন অনিশ্চয়তা দূর হতে পারে।

এই দার্শনিক মতবাদ থেকেই তিনি তাই বিশ্বাস করেন,— কাজ করা এবং জানা এক সঙ্গে চলে। জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মতবাদ হচ্ছে সবার আগে স্থান 'কাজ' (action)-এর তার থেকে উৎপত্তি হবে 'অভিজ্ঞতা' (experience)-র। 'অভিজ্ঞতা' সৃষ্টি করবে 'জ্ঞান' (Knowledge)। তাই তার মতবাদে 'জ্ঞান' এর আগে 'অভিজ্ঞতা' ও 'কাজ' এর স্থান।

তিনি মনের যান্ত্রিকতা তত্ত্বে (Instrumental theory of mind) বিশ্বাসী। তিনি বলেন, মন, মানুষের অভ্যন্তরস্থ একটি শক্তিশালী যন্ত্র যা তাকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। পরিবেশের সঙ্গে মনের সংস্পর্শে 'ধারণা'র সৃষ্টি হয়— যা স্বাভাবিক ভাবেই স্থির নয়, পরন্তু পরিবর্তনশীল, বিকাশমান এবং গতিশীল।

৪.৫.৩ শিক্ষার ধারণা (Concept of Education)

জন ডিউই দর্শনকে 'শিক্ষার সাধারণ তত্ত্ব' বলে মনে করেন ('Philosophy may even be defined as the general theory of education')। তাই তাঁর মত অনুযায়ী বলা শিক্ষা দর্শনের গতিশীল বিষয়। শিক্ষা হচ্ছে পরীক্ষাগার যেখানে দর্শনের যথার্থতা পরীক্ষিত ও নির্ণীত হয়।

ডিউই 'অভিজ্ঞতা'র ওপরে জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'শিক্ষা এমনই অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস, যা অভিজ্ঞতাকে অর্থসমৃদ্ধ করে এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতা গঠনের গতিকে পরিচালনা করবার মতো উপযুক্ত শক্তি

বাড়িয়ে তোলে' ('Education is that reconstruction and reorganisation of exprience which adds to the meaning of experience and increases ability to direct the course of subsequent experience')।

ডিউই বললেন, শিক্ষা শিশুর মনোবৈজ্ঞানিক প্রবণতা এবং সামাজিক প্রবণতাকে কাজে লাগাবে। মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতিগত প্রবণতা, আগ্রহ অনুযায়ী শুদ্ধ করা কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সামাজিক অর্থে উপযোগী হলেই তা কার্যকরি হবে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা গঠন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা এগিয়ে চলে বলেই তিনি শিক্ষা ও জীবনকে সমার্থক বলে মনে করেন ('Education is life it self')।

৪.৫.৪ শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of Education)

জন ডিউই বললেন, শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা সহজ কাজ নয়। 'Democracy and Education' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করলেন—শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে না। শিক্ষাপ্রক্রিয়া নিরন্তর অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, পুনসৃজন ও পুনঃ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছে। তাই বিকাশের লক্ষ্য যেমন আরও বিকাশ, শিক্ষার লক্ষ্য তেমনি আরও শিক্ষা ("The educational process has no end beyond itself, it is its own end, and the educational process is one of continual reorganiseing, restructuring, transfaring ... since in reality there is nothing to which growth is relative save more growth, there is nothing to which education is subordinate save more education")।

জন ডিউইর মতে ব্যক্তিকে সদাপরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয় বলে শিক্ষার লক্ষ্য বহুবিধ। শিক্ষার লক্ষ্য, গণতান্ত্রিক, ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থকে সুসংহত করা। মূল্যবোধ পুনঃসৃষ্ট করা, সত্যগুলিকে বাস্তবঘটনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে নেওয়া। ডিউইর মত অনুসারে 'জীবনের জন্য প্রস্তুতি' (preparation for living) শিক্ষার লক্ষ্য নয়, শিক্ষার আসল কথা তথা লক্ষ্য হচ্ছে জীবনচর্যায় প্রতিনিয়ত সক্রিয় অংশগ্রহণ।

৪.৫.৫ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও পাঠক্রম (Stages of Education & Curriculum)

কয়েকজন পূর্বসূরির মতো ডিউই শিশু শিক্ষার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন।

প্রথম স্তর ঃ খেলার স্তর — ৪ থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত। (Play period)

দ্বিতীয় স্তর ঃ স্বতস্ফূর্ত মনোযোগের স্তর (Period of spontaneous attention) — ৮ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত।

তৃতীয় স্তর ঃ প্রতিবর্ত মনোযোগের স্তর (Period of reflective attention) — ১২ বছর বয়সের পর থেকে বিস্তৃত।

প্রথম পর্যায়ে শিশু গৃহপরিবেশে মূলত ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে খেলার জগতেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হবে। এই পর্যায়ের শেষ বছরে লিখন, পঠন ও গণিতের সঙ্গে এবং ভূগোলের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত ঘটানো হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যা সমাধানে দেহ মনে কিছুটা উপযোগী হয়ে ওঠে। সেজন্য শিক্ষাকে কিছুটা সামাজিকীকরণের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ সময়ে সমাজবিদ্যা, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (experimental science) পাঠক্রমে রাখা যেতে পারে। এসব বিষয় শিশুর কৌতূহল নিবৃত্তিতে, সামাজিক প্রক্রিয়া বুঝতে এবং সামাজিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

তৃতীয় পর্যায় শিশুর পরিণত মনশীলতার পর্যায়। এ সময় দৈনন্দিন সমাজ জীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু সমস্যা তৈরি করতে পারে, সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। এ সময়েই বৌদ্ধিক ও কারিগরি ও সামাজিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি, উৎপাদন, পরিবহন ব্যবস্থা, বিনিময় ও বণ্টন ব্যবস্থার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শিশুদের বিভিন্ন ঝোঁক, আগ্রহ, প্রবণতার ও ওপর ভিত্তি করে বহুবিধ নীতিকে কেন্দ্র করে ডিউই পাঠক্রম রচনা করেছেন। নীতিগুলি হল, উপযোগিতা, পরিবর্তনশীলতা, ব্যক্তিবৈষম্য কেন্দ্রিকতা, সক্রিয়তা, সমাজ ও বিজ্ঞান মনস্কতা, বৃত্তিমুখিনতা, বিনোদন, নান্দনিক ও শৈল্পিক উপযোগিতা। তাই পাঠক্রমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা, উৎপাদন, বণ্টন, যোগানের ব্যবস্থা জানার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, শিল্পকলা, গণিত, প্রযুক্তি সব কিছুরই ব্যবস্থা থাকল।

বলা হল পাঠক্রমে বৈচিত্র্য থাকবে, আনন্দদায়ক হবে, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মিলনে শিশুর আগ্রহ ও উদ্যমকে ভিত্তি করে শিশুর বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হবে। বিষয়গুলি পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে অনুবন্ধের নীতিতে বিষয়গুলি শেখানো হবে।

৪.৫.৬ পাঠদান পদ্ধতি (Method of Teaching)

প্রথাবদ্ধভাবে পাঠ্যবিষয় মুখস্থ করা ডিউইর শিক্ষাদান পদ্ধতি নয়। তিনি সব সময়, কাজ, অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে হাতে কলমে জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন। অতএব 'কাজের মাধ্যমে শিখন'-ই (Learning by doing) তার পদ্ধতি ডিউই এই পদ্ধতির নাম দিলেন সমস্যা পদ্ধতি (Problem method)। Kilpatrick এবং Stevenson যার নামকরণ করেছিলেন প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)।

ডিউই বললেন, যে কোনো অভিজ্ঞতার সকল রূপায়ণ তথা যে কোন সমস্যার কার্যকরী সমাধান সম্ভব— যদি (১) সমস্যাটি মনোবৈজ্ঞানিক পর্যায় অনুযায়ী উপস্থাপিত করা যায়, (২) সমস্যা সমাধান পদ্ধতিকে কাজে লাগান যায়, (৩) সামাজিক সহযোগিতামূলক পরিবেশ অনুকূল থাকে।

সমস্যাটির সমাধান যেন শিক্ষার্থীদের ক্ষমতার আওতাধীন হয় সেটা শিক্ষক দেখবেন।

এই সমস্যা সমাধান (Problem Solving) পদ্ধতি চারটি স্তরে বিন্যস্ত।

(১) উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা (Purposing)

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী তার কাজ করার উদ্দেশ্যটি কী তা নিরূপণ করবে।

(২) পরিকল্পনা রচনা করা (Planning)

উদ্দেশ্য নিরূপিত হলে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা রচনা করবে কীভাবে কাজটি সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করা যায়।

(৩) কাজটি সম্পাদন করা (Executing)

এই স্তরে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি সম্পাদন করবে।

(৪) বিচারকরণ (Judging)

কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা একত্রে বসে বিচার তথা মূল্যায়ন করবে কাজটি ত্রুটি মুক্তভাবে শেষ করা গেল কিনা অথবা কোথায় কোথায় উন্নতি করার প্রয়োজন।

এই পদ্ধতি দলগতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। অনুকূল সমাজ পরিবেশে সহযোগিতার মানসিকতায়, মতামত আদান প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

৪.৫.৭ শিক্ষক (The Teacher)

পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত শিক্ষকের ভূমিকা। ডিউইর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষকের ভূমিকা শিক্ষার্থীর বন্ধু, পথ প্রদর্শকের। তিনি শিক্ষার্থীর কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন না, পাশাপাশি থেকে তত্ত্বাবধায়ন এবং পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রবণতা, আগ্রহ বিবেচনা করে তাদের উপযোগী সমস্যা নির্বাচনে তিনি সহায়তা করতে পারেন। সমগ্র পরিবেশটিকে শিক্ষার্থীদের কাজের অনুকূল করে গড়ে তুলতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে পারেন। তিনিই হবেন সমগ্র পরিবেশটির নিয়ামক (Manipulator of the environment)।

৪.৫.৮ বিদ্যালয় (The School)

বিদ্যালয় সংগঠন সম্পর্কে ডিউই একটি আদর্শ ধারণা দিয়েছেন। বিদ্যালয়, সমাজের প্রয়োজনে সমাজের দ্বারাই সংগঠিত। সামাজিক আচার আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতির সঞ্চালন, সংরক্ষণ, উন্নয়ন শিক্ষার কাজ। বিদ্যালয়কেও সেই আদর্শ সামনে রেখে সংগঠিত করতে হবে। তিনি বললেন, বিদ্যালয় হবে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ (The society in miniatur) এই সমাজ হবে 'পবিত্র, সরলীকৃত, ক্রমান্বয়িত, সুষম, অনুপ্রেরণায় জীবন্ত সক্ষম' (Purified, Simplified, Graded, Better Balanced, Vitalised Society)। সমাজের মন্দটা নয়, যা কিছু ভালো, জীবনপথে অনুপ্রেরণামূলক সেগুলিই বিদ্যালয় পরিবেশে পরিবেশিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

৪.৫.৯ শৃঙ্খলা (Discipline)

প্রয়োগবাদী দর্শন অনুযায়ী ডিউই যে শৃঙ্খলার কথা বললেন তা হল—স্বতোৎসাহিত শৃঙ্খলা (Automatic discipline বা auto-discipline)। এই শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীরা, সমাজ পরিবেশে সহযোগিতামূলক, উৎপাদনাত্মক ও অন্যান্য সমাজ প্রয়োজনীয় কাজে স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জন করবে। স্বাধীনতাই সেখানে সার কথা। এই শৃঙ্খলা কখনই আরোপিত নয়।

৪.৫.১০ অবদান (Contributions) :

ডিউইর শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনিই একমাত্র শিক্ষাবিদ যিনি

শিক্ষাদর্শন, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্বকে সমন্বিত করে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। তাঁর প্রয়োগবাদ ব্যক্তি ও সমাজকে, তত্ত্ব ও কাজকে, জানা ও কর্মসম্পাদনকে সমন্বিত করেছে।*

তিনি শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সমার্থক বলেছেন। তিনি বলেছেন, সে অর্থে শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিরূপণ করা যায় না। কারণ দেশকালে, সমাজকল্যাণ ও ব্যক্তিকল্যাণ আপেক্ষিক এবং বিভিন্ন। তিনি 'সত্য' ও 'মূল্যবোধ'কে পরিবর্তনীয় বলে দাবী করেছেন। তাঁর পাঠক্রম ও পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ অভিনব, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর। তাঁর বিদ্যালয় সংগঠন ও শিক্ষকের ধারণা ও শৃঙ্খলাতত্ত্ব আধুনিক শিক্ষাজগতে শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন।

বলা যেতে পারে, গত একশ বছর ধরে দর্শন, শিক্ষা, সমাজচিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ডিউইর প্রভাব অপরিসীম এবং বর্তমানেও অতীতের মত সমান শক্তিশালী এবং এই চিন্তা ভবিষ্যতেও এগিয়ে যাওয়ার দিশারী। 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা', 'অভিজ্ঞতা', 'শিক্ষা' সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অতীতের মত ভবিষ্যতের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিশ্বের সমস্ত অংশের জনগণকে প্রভাবিত করবে।

৪.৬ স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda) (১৮৬৩-১৯০২)

৪.৬.১ সংক্ষিপ্ত জীবনী (Life)

ঊনবিংশ শতক বাংলার তথা ভারতের এক উজ্জ্বলতম শতক। এই সময় বহু মনীষীর এক মহামিলন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মেলবন্ধন, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রকাশ, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নবজাগরণে জোয়ার এনেছিল রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগরের পথ ধরে এল বিবেকানন্দের সমাজ চিন্তা ও শিক্ষা পরিকল্পনা। পরশাসিত পতিত জাতির অধঃপতনের চরম অবস্থায়, পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোয় চক্ষু প্রতিহত হওয়ায় যখন আমাদের দিগভ্রম হবার উপক্রম, দীর্ঘ এক শতকের সংস্কারের ফল চিন্তা করে যখন হতাশ হয়ে কী করব ভেবে উঠতে পারিনি তখন বাঙালি সমাজে জঠর থেকে আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বাজাত্যবোধে প্রবল বিবেকানন্দ দেশের যুবকদের 'স্বদেশমন্ত্রে' দীক্ষিত হবার আহ্বান জানিয়ে সিংহনিনাদে বলে উঠেছেন "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ .... বল ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর। আমায় মানুষ কর।" তথাকথিত উচ্চবর্ণের কিছু লোকের সমাজের সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকারকে অস্বীকার করে তিনি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উত্থান চেয়েছেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন, নতুন ভারত জন্ম নেবে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্য থেকে।

* "It was he who clarly brought out the relationship between individual and the social life and corelated education to it". — B. C. Rai (Theory of Education).

স্বামীজির কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন— যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও তবে স্বামীজি সম্বন্ধে জান, পাঠ করো। তার মধ্যে সব কিছুই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কিছু। পিছিয়ে পড়া বা নেতিবাচক কিছু নেই। (It you want to know India, study Vivekananda, In him everything is positive and nothing negative)।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রাকসন্ন্যাস নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি উত্তর কলকাতার শিক্ষিত বনেদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মেধাবী নরেন্দ্রনাথ অধ্যয়ন, গানবাচনা খেলাধূলা সব ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী ছিলেন। অসাধারণ পড়তে ভালোবাসতেন, তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি পিতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষা (English Education) গ্রহণ করেছেন। অতি অল্প বয়সে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে হিন্দু পুরাণ শাস্ত্র বিষয়ে অবগত হন। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন নানা বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা গতানুগতিক জীবনের প্রতি বীতরাগ করে তুলত। অতি অল্প বয়সে তিনি তাঁর পিতামহকে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করতে দেখেন। এই সময়েও তিনি মাঝে মাঝে মাটির মূর্তির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে পড়বেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। এরজন্য খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তিনি মনের মতো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধেও এজন্য জ্ঞানলাভ করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি কলেজে (বর্তমান স্কটিয়া চার্চ কলেজ, তৎকালীন, জোরেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিউশন) পড়ার সুবাদে অধ্যক্ষ Hastic সাহেবের নজরে পড়েন। তিনি বলেন, দেশ বিদেশের বহু জায়গা ঘুরেও নরেন্দ্রনাথের মত প্রতিভা খুঁজে পান নি। তাঁর কথায়, "Narendranath is really a genius. I have travelled for and wide, but I never ye come across a la of his talents and possibilities, ever in German Universities amongst philosophical students. He is bound to make his markin life")। এই Hastic সাহেবের কাছে পাঠগ্রহণ কালে একদিন Wordsworth এর 'Excursion' কবিতাটি পড়ানোর সময় প্রকৃতির রহস্যময়তা সম্পর্কে কবির ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব এবং এরকম মানুষ বিরল হলেও তিনি দক্ষিণেশ্বরের এক নিরক্ষর সাধুর কথা উল্লেখ করলেন যিনি ভাবসমাধির মাধ্যমে ঈশ্বর 'উপলব্ধি করেছেন শোনা যায়। এ কথা শুনেই নরেন্দ্রনাথ সেই নিরক্ষর সাধু শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে ছুটে গেলেন। ১৮৮১ সালের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে শিষ্য নরেন্দ্রনাথ গুরু শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন, জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন, অমূর্ত বিষয়ের মূর্ত সরল ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হলেন। তারপর বিশ্বাস অবিশ্বাস, যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ উত্তরিত হলেন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ নামে। শ্রী রামকৃষ্ণের মহাপ্রায়ণ (১৮৮৬) এর পর বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে, ইউরোপ, আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভারতের বেদান্ত দর্শন ও হিন্দুধর্মের সারবত্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণে প্রত্যক্ষ করলেন ভারতবাসীর দুর্দশা, তিনি উপলব্ধি করলেন গুরু প্রদত্ত অমূল্য মন্ত্রটির তাৎপর্য জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা। মানুষই ঈশ্বর, তার জন্য অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই, চাই আত্মপ্রত্যয়। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ঘোষণা করলেন নতুন ভারত গড়ে উঠবে অবহেলিত, দরিদ্র, ক্লিষ্ট, পরাধীন শ্রমজীবী মানুষের হাত ধরে। তাই তাঁর কাজ হল আর্তত্রাণ, সমাজসংস্কার ও শিক্ষার প্রসার।

৪.৬.২ জীবনদর্শন (Philosophy of Life)

বিবেকানন্দের জীবনদর্শন বেদান্ত দর্শন দ্বারা লালিত যা বিশ্বের ঐক্যসূত্রের ওপর জোর দেয়। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর হচ্ছেন অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ (God is infinite Existence, Infinite knowledge and Infinite bliss (Sat, chit, Ananda)। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, বিশ্বে প্রবিষ্ট এক অগ্নিপিণ্ড যেমন বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশমান তেমনি এক ঐশ্বরিক সত্তা (দেবতাত্মা) প্রতিটি মানবাত্মায় প্রকাশিত (As the one fere entering into the Universe express itself in various forms, even so, that One soul is expressing itself in every soul and yet is infinitely more besides)। তাঁর দর্শন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে, তাই তাঁর জীবন দর্শনকে মানব দর্শন (Philosophy of man) বলা যায়। তাঁর মতে মানুষ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজাত অনন্ত, সম্ভাবনা ও শক্তির অধিকারী এবং সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং ঐশ্বরিক সত্তা (divinity) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান।

৪.৬.৩ শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of education)

দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণে এমন মন্তব্য করেছেন যা দীর্ঘদিন শিক্ষাতত্ত্ব বিদদের চিন্তার খোরাক জোগায়। তাঁর এই উক্তি ব্যাপকভাবে পরিচিত। তিনি বলেছেন, ''মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই শিক্ষা। চকমকি পাথরের মধ্যে লুকানো আগুনের মতো জ্ঞানও মানুষের অন্তরেই থাকে। উদ্দীপনাই চকমকি ঘষার মতো কাজ করে জ্ঞানের দীপ্তিকে বাইরে প্রকাশ করে (''Education is the manifestation of perfection already in man. Like fire in a piece of flint, knowledge exists in the mind. Sugestion is the friction which brings it out)।

স্বামীজি মন্তব্য করেছেন,—''জ্ঞান মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকে। কোন জ্ঞান বাইরে থেকে আসে না। জ্ঞান সহজাত ভাবে মানুষের অন্তরেই অবস্থান করে। ... অনন্ত জ্ঞানের খনি যে মানুষের আত্মা তার আবরণ উন্মোচন করে সে যা আবিষ্কার করে, তাই শেখে'' (Knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside ; it is all inside ... what a man learns is really what he 'discovers' by taking the cover of his soul which is a mine of infinite knowledge)।

বিবেকানন্দ বলেছেন— মানুষ ভালোমন্দ অসংখ্য, প্রবণতা, ইচ্ছার অধিকারী। 'অগণিত ইচ্ছার প্রবাহ ও প্রকাশকে সঠিক শিক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে ফলদায়ী ইচ্ছার প্রকাশকেই শিক্ষা বলে' ('the training by which the current and expression of will are brought under control and become fruitful, is called education')।

৪.৬.৪ শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of education)

চারাগাছের চারপাশে বেড়া দিয়ে যেমন রক্ষা করা হয়, বৃদ্ধির জন্য যেমন সার, জল সরবরাহ করা হয়, তেমনই অনিষ্ট কর পরিবেশ থেকে শিশুকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমাদের বড়দের, শিক্ষকদের শুধু পাশ থেকে একটু সাহায্য ও নির্দেশ পেলে শিশু আপনা আপনি নিজেরাই শিখবে।

বিবেকানন্দ বললেন, শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য হল চরিত্র গঠন করা, মানসিক বল, বুদ্ধির দীপ্তি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি সৃষ্টি করা। সব শিক্ষার শেষ কথা হল মানুষ তৈরি করা। স্বামীজি দেহমন, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতার বিকাশে এক সম্পূর্ণ মানুষ তৈরির ওপর জোর দিলেন। তিনি বলেন, মানুষের দেহ দেবতামার শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল। সেজন্য একে রাখতে হবে সুস্থ, সতেজ, পরিষ্কার ও পবিত্র। 'লোহার মতো শক্ত মাংসপেশী' এবং 'ইস্পাতের মতো স্নায়ু সৃষ্টির' ওপর তিনি জোর দিলেন। তাঁর কথায়— 'আমাদের দেশে এখন আবশ্যক লোহার মতো শক্ত মাংসপেশী, ইস্পাতের মতো স্নায়ু এবং দুর্দমনীয় বিপুল ইচ্ছাশক্তি। এমন ইচ্ছাশক্তি যা বিশ্বের সকল রহস্য এবং গোপনীয়তা উদঘাটন করতে সমর্থ এবং সংকল্প সিদ্ধির সমুদ্র গর্ভে ডুবে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত। .... এটাই মানুষ গড়ার শিক্ষা, যা আমরা চাই।''

৪.৬.৫ গণশিক্ষা ও পাঠক্রম (Mass education and curriculum)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''আমাদের জাতীয় পাপ হল জনগণের প্রতি অবহেলা এবং ওই পাপেই আমাদের পতন হয়েছে। যতদিন ভারতের জনসাধারণ আবার সুশিক্ষিত না হবে, ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনীয় খাদ্য না পাবে এবং যত্নে লালিত না হবে, ততদিন কোনো রাজনীতিতেই কোনো ফল হবে না।'' উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, ''সুযোগ দাও, শিক্ষা দাও, সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে, কোনো কিছুই তথাকথিত উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকার নহে।''

বস্তুত তিনি চেয়েছেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠন এবং পাঠক্রমে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতির সম্মানজনক স্থান। তিনি বললেন, ছাত্ররা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ইংরেজির মাধ্যমে অধিগত করতে পারে। সংস্কৃত শিখবে, ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য। পাঠক্রমে শারীর শিক্ষা এবং শারীর সঞ্চালনমূলক খেলার ওপর জোর দিলেন। বললেন অসুস্থ শরীর অনেক অনিষ্ট ডেকে আনে। সুস্থ শরীরে দেবতার বাস। তাই একে সতেজ পবিত্র রাখতে দৈনন্দিন গীতা পাঠের চেয়েও শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলা জরুরি।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের শিক্ষার জন্য তিনি এক অভিনব কথা বলেছেন— এরা শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসবেনা। শিক্ষাকে এদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ''দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষার জন্য না আসে, শিক্ষাকে তাহাদের কাছে যাইতে হইবে। আমাদের দেশে সহস্র সহস্র একনিষ্ঠ আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা গ্রামে যাইয়া ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একটা অংশকে যদি লৌকিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্বারে দ্বারে যাইয়া কেবল ধর্মপ্রচার করিবেন না, ব্যবহারিক শিক্ষাও দিবেন।''

৪.৬.৬ শিক্ষার পদ্ধতি (Method of education)

বিবেকানন্দ বললেন, ইন্দ্রিয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং নীতিবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন মানসিক শক্তির অনুশীলন। এজন্য চাই মানসিক একাগ্রতা সৃষ্টি। এর জন্য শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে মনঃ সংযোগ ও ধ্যান। বারো বছর টানা ব্রহ্মচর্য যিনি পালন করেন, শক্তি ও ক্ষমতা তাঁর অধিগত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্রহ্মচর্যের সাহায্যে অপরিমিত স্মরণশক্তিও আয়ত্ত করা যায়। এর ফলে চরিত্র ও মনের শিক্ষা সার্থক হয়। ব্যক্তিত্ব গঠন সহজ হয়।

৪.৬.৭ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Teacher Pupil relation)

তিনি বলেছেন, শিক্ষক হবেন ত্যাগী ও সর্বজ্ঞ। অন্যদিকে সত্যের অনুশীলন হবে শিক্ষার্থীর লক্ষ্য। তাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আরো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মোক্ষের প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধ রাখতে হবে। শ্রদ্ধার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্ররা অস্থাবান হবে। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম'। শিক্ষক হবেন পবিত্র ও নিঃস্বার্থ। তাঁর নাম, যশ, সম্পদের প্রতি অকারণ মোহ থাকলে চলবে না। শিক্ষকের থাকবে শিক্ষার্থী, মানবজাতি, সর্বোপরি নিজের পেশার প্রতি ভালোবাসা। তিনি মনে করেন, শিক্ষার্থীর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা, সহানুভূতি না থাকলে কোনো শিক্ষক ঠিকমতো শেখাতে পারেন না। প্রকৃত শিক্ষকের সর্বোপরি থাকবে জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা, থাকবে অধ্যাবসায় চিন্তা, বাক্যে ও কর্মে পবিত্রতা। শিক্ষক ছাত্রদের বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন এবং এই পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে ছাত্রদের মধ্যে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা, বিশ্বাস, বাধ্যতা ও সম্মান করতে শেখার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

৪.৬.৮ শৃঙ্খলা (Discipline)

শৃঙ্খলার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজি তার পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বললেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজ করার জন্য ছাত্রদের যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়, স্বাধীন চিন্তা করা এবং আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করা যায় তবে, কাজের মধ্য দিয়েই ছাত্রদের মধ্যে স্বতোৎসারিও ভাবে (automatically) শৃঙ্খলা আসবে।

৪.৬.৯ নারীশিক্ষা (Women education)

স্বামীজি বলতেন, এক ডানার ওপর নির্ভর করে কোনো পাখিই উড়তে পারে না। পুরুষ নারী উভয়কেই শিক্ষিত হতে হবে। উভয়েই জাতি গঠনের কাজে সহায়তা করবে। নারীদের স্বাধীন মতামতের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তিনি নারীশিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন। বেশি বেশি সুনাগরিক পেতে গেলে বেশি বেশি সুমাতা চাই। ছেলেবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত মায়ের আদর্শে এবং নেতৃত্বে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। মেয়েদের পক্ষে বেদ অধ্যয়নের অধিকার 'যব' করে পুরোহিত তন্ত্রের ফতোয়ার ফলে সমাজে নারীর স্থান অবনমনের তিনি নিন্দা করেছেন। তিনি মেয়েস্কুল সহ সন্ন্যাসিনী আশ্রমের প্রস্তাব করেন। তিনি মেয়েদের জন্য বিস্তৃত পাঠক্রমের প্রস্তাব করেন তাঁর মতে মেয়েদের পাঠক্রমে থাকবে— ধর্ম, ইতিহাস, পুরাণ, সংস্কৃত, মাতৃভাষা ও সাহিত্য, কিছু ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, গাহস্থ্যবিজ্ঞান, গৃহপালন, পশুপালন, সেলাই, রান্না এবং মাতৃত্বের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে পাঠ ইত্যাদি।

৪.৬.১০ কারিগরি শিক্ষা (Technical education)

বিবেকানন্দ বলেছেন, "কারিগরি শিক্ষা ও শিল্পায়নের জন্য আর যা কিছু করা দরকার, সবই আমাদের চাই, যেন শুধু চাকরি না খুঁজে মানুষ নিজের ভরণপোষণ এবং ভবিষ্যৎ দুর্দিনের সময় ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট আয় করতে পারে। অবশ্য কারিগরি শিক্ষার সাথে তাত্ত্বিক মানবিক বিদ্যা এবং প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানও থাকা দরকার।"

৪.৬.১১ মূল্যায়ন (Evaluation)

বিবেকানন্দ ভারতীয় জীবন, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত বহুবিধ বিষয়, আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র প্রাচ্য ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বাণী পশ্চিমে প্রচারই করেন নি, তিনি ছিলেন একাধারে একজন সমাজসংস্কারক, বিখ্যাত দার্শনিক-শিক্ষক এবং সর্বোপরি মানবতাবাদের প্রচারক। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যা বিবেকানন্দ স্পর্শ করেননি এবং যেটুকুই হোক তিনি সেই ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছেন।

কখনও লিখিত প্রবন্ধে, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতায় বিবেকানন্দের কথা স্বাভাবতই শিক্ষা চিন্তায় আলোড়ন তুলে শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিবেকানন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন— প্রাচ্যের ঐতিহ্যের মূলে জন্ম নিয়ে এবং ভারতের অতীত উত্তরাধিকারের গর্বে পূর্ণ হয়েও বিবেকানন্দ জীবন সমস্যার সমাধানে ছিলেন আধুনিক পথের দিশারি এবং তিনি ছিলেন ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক সেতু স্বরূপ (''Rooted in the Past and full of pride in India's heritage, Vivekananda was yet modern in his approach to life's problems, and was a kind of bridge between the past of India and her present'')।

তাঁর সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বলাই যায়—

> ''তোমার কণ্ঠস্বর ছিল সমুদ্রগর্জনের মত,
> তুমি ছিলে খোলা আকাশের মত প্রকাশিত, মহিমময় ও মুক্ত।''*

৪.৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindra Nath Tagore) (১৮৬১-১৯৪১)

৪.৭.১ জীবনী (Life History)

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মে (বাংলা ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮) রবীন্দ্রনাথ, কলকাতার বিখ্যাত বনেদি সংস্কৃতি সম্মান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কনিষ্ঠ সন্তান। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট ভারতীয় দর্শন, উপনিষদ, সংস্কৃত, জোর্তিবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেন। ইট, কাঠ, পাথরে ভরা পরিবেশে চেয়ার বেঞ্চির ঠোকাঠুকি যেখানে নিরন্তর লেগে আছে, প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ের সেই পরিবেশ তাঁকে কোনোদিন আকর্ষণ করতে পারেনি।

* "Knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside".
"You cannot teach a child any more than you can grow a plant"
"The end of all education, all training, should be man making'.
"There is only one method by which to attain knowledge, that which is called concentration".
"We commit mistakes because we are weak, and we are weak because we are ignorate."
"Without the presonal life of the teacher, there would be no education".
— Exhacts from The Complete works of Swami Vivekananda.

তাই ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মদা স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি যেখানেই তাঁকে ভর্তি করা হোক, বেশিদিন তিনি সেখানে টিকে থাকতে পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি কোনদিন দেশীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণ করেননি। তবে নিজের আন্তরিকতায় এবং পিতা, গৃহশিক্ষক ও দাদাদের তত্ত্বাবধানে বাড়িতেই উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা (High English Education) চলতে থাকে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ষোলোবছর বয়সে তাঁকে আইন বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে ইংল্যান্ড পাঠানো হয়। কিন্তু এতেও তিনি আগ্রহ বোধ না করায় বছর তিনেক পরে দেশে ফিরে আসেন। তবে ঐ সময় তিনি ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বিখ্যাত অধ্যাপকগণের সংস্পর্শ লাভে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন।

ভারতে ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখতে শুরু করেন। তাঁর বাল্যকালের স্কুলজীবনের যান্ত্রিক পরিবেশ তাঁকে চিরকালই পীড়িত করেছে। তাই তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে, প্রথাবদ্ধ কারখানাসদৃশ বিদ্যালয়ের কলে ছাঁটা বিদ্যাগ্রহণ থেকে ছাত্রদের মুক্তি দেবার ভাবনায়, শান্তিনিকেতনে (Abode of Peace) প্রকৃতির কোলে 'ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়' নামে আশ্রমস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় যার ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে, নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কলকাতা, অক্সফোর্ড ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেড ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিখ্যাত 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি এতই প্রবল ছিল যে 'জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডে'র পরে তিনি প্রতিবাদে সেই উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে 'বিশ্বভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়' গড়ে তোলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এই শিক্ষাকেন্দ্র একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি হবে এবং সারা বিশ্ব নিজের পরিবার মনে করে এখানে একজায়গায় মিলিত হবে। তিনি বললেন, 'যত্র বিশ্বম ভবত্যেক নিদ্‌ম' (where the whole world nestles together) 'বিশ্বভারতী' হবে সে রকমই একটি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৪১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কুড়ি বছর ধরে অপরাজেয় মনোভাব নিয়ে এখানে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষে মানুষে মিলনের কথা বলে মানবতাবাদের (humanism) বাণী প্রচার করে গেছেন। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি এই বাণী প্রচার করেছেন এবং সম্বর্ধনা কুড়িয়েছেন। তিনি স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। তিনি ছিলেন কবি, শিল্পী, দার্শনিক, একজন প্রকৃত শিক্ষাবিদ, ঋষি, কর্মযোগী এবং সর্বোপরি মানবতাবাদের প্রচারক। এই মানবতাবাদ তাঁর অধ্যাত্মবোধের দর্শন থেকেই উদ্ভূত।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান হল।

৪.৭.২ জীবনদর্শন (Philosophy of life)

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দর্শনের পরিবেশে লালিত হয়েছিলেন। তিনি মানতেন সব মানুষের ওপর আছেন একজন সৃষ্টিকর্তা যিনি পরম ব্রহ্ম, একমেধাদ্বিতীয়ম্। পৃথিবীতে সমস্ত জীবই, তাঁর দ্বারা সৃষ্ট, প্রকাশিত, বিকশিত। সর্বম খলুঃ ইদং ব্রহ্ম (All are the manifestations of the One Absolute Being.)। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সমস্ত প্রাণীর (তা সে যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন) মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। সেজন্য তিনি মনে করেছেন, সকলকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। তবেই আসবে আনন্দ।

৪.৭.৩ শিক্ষার অর্থ (Meaning of education)

গতানুগতিক শিক্ষাকে তীব্র আক্রমণ করে তিন বলেছেন, এই শিক্ষা জোর করে বাইরে থেকে চালিয়ে দেওয়া কৃত্রিম শিক্ষা, যার সঙ্গে জীবনের এবং শিক্ষার্থীর মনের যোগ নেই। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত এবং জাতীয় কোনো চাহিদাই মেটাতে পারে না। তিনি বলেছেন, "দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। ..... এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে; তাহা বস্তু যোগায়, প্রাণ জোগায় না।"

তিনি মনে করেন, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার মিলনই যথার্থ শিক্ষা। এই যথার্থ শিক্ষা পেতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে মুক্ত পরিবেশে। মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন— "বিশ্ব প্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা দেয়ালগুলোর বাইরে" (আশ্রমের শিক্ষা)।

শিক্ষাকে তিনি ব্যাখ্যা করতেন,— জীবনমুখী, আনন্দময়, স্বতঃস্ফূর্ত এক প্রক্রিয়া রূপে। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, শিক্ষার অর্থ শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়, জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি বা সৌন্দর্যবোধের বা শিল্পবৃত্তির সাধনা এবং কর্মশক্তির বা ইচ্ছাশক্তির সাধনা। একেই বলা হয়েছে পরিপূর্ণতার সাধনা—"Education for fullness".।

রবীন্দ্রনাথ আরও বললেন— সর্বোচ্চ শিক্ষা কেবল আমাদের তথ্য সরবরাহ করে না সর্বোচ্চ শিক্ষা তাই যা সৃষ্টির সকল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে শেখায় (The highese education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existences)।

৪.৭.৪ শিক্ষার লক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণে মন্তব্য করেছেন, "..... সকল বড় দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন"। (বিশ্বভারতী)।

সেজন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে বলা যায় শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর শরীর মন, চরিত্রের উন্নতি এবং আত্মসেবা, আত্মবিশ্বাস, আত্মশৃঙ্খলা উন্নয়নের মাধ্যমে মনুষত্ব লাভ ও মনুষত্বের বিকাশ এবং নিম্নতর লক্ষ্য বা আশু লক্ষ্য হল, জৈব অস্তিত্বকে রক্ষা কল্পে জীবিকা জন্য শিক্ষা।

৪.৭.৫ প্রকৃতির কোলে শিক্ষা (শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম) [(Education in the lap of Nature (Brahmacharyashram at Santiniketan)]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজের পরীক্ষা পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা পেতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়, তপস্যার দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে।" এই কারণেই তাঁর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা। তিনি বলেন, "প্রকৃতির ক্রোড়ে জন্মে যদি প্রকৃতির শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকি, তাহলে শিক্ষা কখনও সার্থক হতে পারে না।" আবার

কোনো জায়গায় মন্তব্য করেন, "অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদারপ্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।"

সেজন্য পল্লিপ্রকৃতির উদারপ্রাঙ্গানে শিলাইদহে তিনি যে প্রথম শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন তাই পরিণত রূপ পেল শান্তিনিকেতনে। তাঁর এই বিদ্যালয় স্থাপন পরিকল্পনা প্রাচীন তাঁর এই বিদ্যালয় স্থাপন পরিকল্পনা প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনুকরণে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে চেয়েছেন।

প্রাচীনকালে ছেলেরা নিজের ঘর ছেড়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে থেকে, গুরুর পরিবারের একজন হয়ে বিদ্যাচর্চা করত। এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। প্রাচীন তপোবনের আদর্শ সামনে রেখে তিনি স্থির করলেন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের নাম হবে "ব্রহ্মচর্যাশ্রম"। ৭ই পৌষ, ১৩০৮ সন, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯০১ সালে বিদ্যালয় খোলা হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল।.... মনুষ্যত্ব লাভের ভিত্তি যে শিক্ষা, তাহাকে তাঁহারা (পিতামহরা) ব্রহ্মচর্য ব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা একাগ্রনিষ্ঠার দ্বারা সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগসাধনার জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য ব্রত।" এখানে প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশে একাত্মতা স্থাপনের জন্য প্রকৃতির কোলে ক্লাস নেবার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেলের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বে একটি ঐক্যসূত্র (Law of Unity) মানুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বরকে এক বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। সেজন্য কতকগুলি বিষয়জ্ঞানের মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে বিশ্বের ঐক্যসূত্রকে উপলব্ধি করে তারই একজন হয়ে তার সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করতে হবে। তাই তিনি প্রার্থনা করলেন—

"চিত্ত যেথা ভয়শূণ্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্রকরি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছসিয়া ওঠে, ...
তুমি সর্ব কর্ম চিতা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত"।

৪.৭.৬ পাঠক্রম (Curriculum)

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত পাঠক্রম ছিল বিস্তৃত। এই পাঠক্রমে ছাত্ররা নিজস্ব রুচি প্রবণতা অনুযায়ী বিকাশের যাতে সুযোগ পায় সেজন্য ভাষা, সাহিত্য (মাতৃভাষা ও কয়েকটি বিদেশি ভাষা সমেত) বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, কৃষি, কারিগরি, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রণ, ভাস্কর্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষাকে আনন্দময় করে গড়ে

তোলার জন্য তিনি নাটক রচনা করেন, অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ঋতু উৎসবের প্রচলন করেন। জ্ঞানমূলক শিক্ষাকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে ছাত্ররা যাতে সক্রিয় হতে পারে সেজন্য প্রথমেই ইন্দ্রিয় পরিমার্জনে (Sensetraining)-র ব্যবস্থা করেন।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাকে কেবল জ্ঞানমুখী না করে তিনি বৃত্তিমুখীও করেছেন। বোলপুরের সন্নিকটে শ্রী নিকেতনে তিনি ব্যবহারিক শিক্ষার নানাবিধ ব্যবস্থা করেন। এখানে চাষ, গোপালন, তাঁতবোনা, কাপড় ছাপানো ট্যানিং, চামড়াও মাটির জিনিস তৈরি হাতে কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন।

৪.৭.৭ শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Instruction)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে বিদেশি ভাষা ইংরেজি। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম যা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ী এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজাত। এর পরবির্তে বোতলের কৃত্রিম দুধের মতো ইংরেজি বিদেশি ভাষাকে গলধঃকরণ করে শিক্ষা নিতে চাইছি বলে আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই উলটাপালটা (lopsided) হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে না। তাই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। তাঁর বারো বছর বয়স পর্যন্ত নিজের শিক্ষা ও ইংরেজি বর্জিত ছিল। তিনি বলেছেন, ''শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোন ভেজাল না দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্ট কর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।'' তিনি আরও বলেছেন— ''তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতি প্রচারিত জীর্ণ বাক্যবলি সাবধান সেলাই করে করে কাঁথা বুনতে হয় না।'

৪.৭.৮ শিক্ষাদান পদ্ধতি (Method of Teaching)

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক, জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, যান্ত্রিক, পুঁথিগত কোনো শিক্ষাদান পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তি বৈষম্যেরনীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, আবেগ, প্রবণতা অনুযায়ী গড়ে উঠবে। এই শিক্ষা হবে আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে, খেলার আনন্দে।

তিনি তাই যে পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করেন, সেগুলি হল—

(১) ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা— ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়

(২) বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা— শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিতর্ক আলোচনার ব্যবস্থা করবে এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা হবে আগে। শিক্ষক সেই জিজ্ঞাসার নিরসন করবেন। পরে শিক্ষার্থী কতটা শিখল তা জানতে প্রশ্ন করবেন।

(৪) কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা বা ইন্দ্রিয় সঞ্চালনার মাধ্যমে শিক্ষা লাফানো ঝাঁপানো বৃক্ষে আরোহন, হাততালি, ড্রিল, নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশল শিক্ষার্থীকে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে সাহায্য করবে।

৪.৭.৯ শিক্ষকের ভূমিকা (Role of the teacher)

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, শিক্ষকের কাজ শুধু পুঁথি থেকে শুষ্ক তত্ত্ব ও তথ্য বিতরণ নয়। শিক্ষকের দান শুধু কর্তব্যবোধের থেকেও উৎসাহিত হবার নয়। শিক্ষকের দান খুশির দান। শিক্ষক সব সময় আনন্দের সঙ্গে, অন্তরের ভালোবাসায় অকৃপণভাবে দান করবেন, ভরে তুলবেন শিক্ষার্থীর সমগ্রজীবন। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। তিনি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে বলেছেন, 'যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার আযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, এই যে দেনা-পাওনার নাড়ির যোগ থাকে না।" রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ থাকা চাই। তিনি বলেন, 'সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তাহলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য।

৪.৭.১০ শৃঙ্খলা (Discipline)

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে শাস্তির কোন জায়গা ছিল না। তিনি বলেন, "শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তাঁরা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রুপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। .... ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান। রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসকের অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।" তাই শৃঙ্খলারক্ষায় তিনি ছাত্র স্বায়ত্তশাসন নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এখানে ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের সংগঠনের মধ্য দিয়ে আত্ম নিয়ন্ত্রণের ভার নিত। একে বলে 'আত্মনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা'। এই প্রথা আধুনিক ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর।

৪.৭.১১ বিশ্বভারতীয় (Viswa-Bharati)

রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনার প্রায়োগিক শ্রেষ্ঠ অবদান বিশ্বভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ, বিশ্বমানবত্ব অর্জনের জন্য মানসিক প্রসারতাই তাঁর এই বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, "বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ ভূগোলের বেড়া ভেঙে গিয়েছে, জাতিরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় আজ সমস্ত পৃথিবী ব্যতিত।" তাই তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের মিলন চেয়েছিলেন। পশ্চিম দেবে বিজ্ঞান শিক্ষা। আর পূর্ব তার আধ্যাত্মিক সম্পদ দিয়ে পূর্ণ করে দেবে শিক্ষার স্বরূপকে। এই ভাবনায় ১৯২১ সালে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে গড়ে তুললেন "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়"। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নতুন নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন, সৃজন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচন। তিনি চাইলেন, এই শিক্ষাকেন্দ্র আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র

হয়ে উঠবে। হবে এমন একটি কেন্দ্র 'যেখানে সারা বিশ্ব একত্রে বাস করবে' ('যত্র বিশ্বম ভবত্যেক নীড়ম্')। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি প্রাচ্যের জ্ঞান ও সত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাণী বিশ্বে ছড়াতে ব্রতী হলেন এবং বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান সঠিকভাবে এখানে পৌঁছানোর জন্য ওখানকার নামী অধ্যাপকদের সমাগম ঘটালেন। কালে কালে 'বিশ্বভারতী' প্রাচীনকালের 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র মতো ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠল এবং ভারত ও বিশ্ব সভ্যতার সংযোগ কেন্দ্র হল। সে কারণে দেশ ও জাতির গণ্ডি পার হয়ে বিশ্বভারতী আজ বিশ্বমানবের তীর্থভূমি। ১৯৫১ সালে স্বাধীনভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এক আইন বলে বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন যার ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থেকে শিক্ষায় পরীক্ষা নিতে পারে এবং ডিগ্রি দিতে পারে।

৪.৭.১২ মূল্যায়ন (Evaluation)

রবীন্দ্রনাথ বারো বছর বয়সে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার আঙিনা থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে বড়ো হয়ে প্রকৃতির কোলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিনিকেতনে। তিনি মানুষ প্রকৃতি ও ঈশ্বরের একাত্মতার বাণী প্রচার করেন বিভিন্ন লেখায় ও কবিতায়। 'বিশ্বকবি' হিসাবে পরিচিত লাভ করলেও তিনি একাধারে ছিলেন উপন্যাসিক, নাট্যকার, রচনাকার, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, গায়ক, অভিনেতা, চিত্রকর এবং শিক্ষক। তাঁরই হাতে গড়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পরে তার বিস্তৃতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটি সহনশীলতা ও বিশ্বজনীনতার কেন্দ্র হিসাবে বিকাশলাভ করল এবং ভারতীয় চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে বিশাল প্রভাব ফেলল।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবিলাসী ভাববাদী ছিলেন না, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখেছেন। তিনি মানবতাবাদকে তথা তার পবিত্রতম প্রতীক শিশুকে ভালোবেসেছেন। তিনি ভালবাসা, স্বাধীনতা, সহানুভূতির পরিবেশে শিশুর আত্মশক্তির উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনের মূলনীতি হল—স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সংযোগ। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত হলেও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পুষ্ট হয়েছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্দেহে ভারতীয় নবজাগরণের সর্বোত্তম নেতা ছিলেন। তাঁর প্রভাব আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছিল। শিক্ষা তার থেকে বাদ যায়নি।" (Rabindranath Tagore was undoubtedly the greatest leader of the Indian Renaissance and his influence was felt in all of our cultural life. Education did not escape it.)।

৪.৮ মহাত্মা গান্ধী (Mahatma Gandhi) (১৮৬৯-১৯৪৮)

৪.৮.১ জীবনী (Life)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, যিনি পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধি বা গান্ধিজি নামে পরিচিত হয়েছিলেন এবং যাকে

'জাতির জনক' রূপে ভারতের জনগণ গ্রহণ করেছিল তিনি, '১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর উত্তর পশ্চিম ভারতের কাথিয়াবারে (গুজরাট)-র পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাজকোটের তৎকালীন দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী)। মাত্র ১৩ বছর বয়সে গান্ধিজির বিয়ে হয় কস্তুরবাইর সঙ্গে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংল্যান্ড যান আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য এবং পরীক্ষায় পাশ করে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ফিরে এসে রাজকোটে আইন ব্যাবসা শুরু করেন। সেই সুবাদে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান একটি সম্পদশালী ভারতীয় সংস্থার আইন বিষয়ে দেখভাল করার জন্য। ওখানে অবস্থান কালেই তিনি 'টলস্টয় ফার্ম' নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যেখানে নিজে নেতৃত্বে থেকে পারিবারিক পরিবেশে আত্ম বিশ্বাস, আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহযোগিতামূলক জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে এবং শ্রমের মর্যাদ বৃদ্ধির জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কিছু বৌদ্ধিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁর আদর্শের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ফিরে এলেন। সেই থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন। তাঁর অসহযোগ আন্দোলন, ডান্ডি অভিযান, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক অনশন আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিখ্যাত আন্দোলন।

গতানুগতিক শিক্ষা থেকে মুক্তি দেবার জন্য সঙ্গে চলল মানুষ্যকে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা। তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সবরমতি আশ্রমে স্থাপন করলেন এবং সেখানে সত্যবাদিতা, অহিংসা, অস্পৃশ্যতা, সৎজীবন যাপনের নীতিতে শিক্ষাশ্রম পরিচালনা করলেন। কুড়ি বছর পর ওয়ার্ধার সেবাগ্রামে ১৯৩৫ সালে আর একটি আশ্রম স্থাপন করেন এবং এখানেই তিনি তার বিখ্যাত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্প শুরু করলেন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, সত্য ও অহিংসার পূজারি মহাত্মা গান্ধি ঘাতকের গুলিতে মারা গেলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি তিনি নিহত হলেন।

৪.৮.২ জীবন দর্শন (Philosophy of life)

যে কোন শিক্ষাবিদের মতোই মহাত্মা গান্ধির শিক্ষা পরিকল্পনা তাঁর জীবন দর্শন ও শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলন আমরা প্রথমে তাঁর জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করব গান্ধিজি ছিলেন মূলগতভাবে ভাববাদী দার্শনিক। এই ভাববাদ 'সত্য' ও 'অহিংসা'র নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি বলেন 'সত্যে' পৌছানোই জীবনের লক্ষ্য। আর 'অহিংসা' হচ্ছে 'সত্যে' পৌছানোর উপায়। 'সত্য'ও 'অহিংসা' পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই আমাদের মহান কর্তব্য হচ্ছে অহিংসার পথে থাকা। সত্যের লক্ষ্যে চললো আরও গভীর সত্য বা পরম সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব এবং এই 'পরম সত্য' হচ্ছে 'ঈশ্বর'।

গান্ধিজি মনে করেন যদিও আমরা মানুষরা বিভিন্ন দেহ নিয়ে অবস্থান করি তবু আমরা এক পরমাত্মা থেকেই উদগত হয়েছি, যেমন সূর্যের কিরণ বহু পথে বিচ্ছুরিত হলেও তার উৎস একই। ("What though we have different bodies? We have but 'one soul. The rays of the sun are many through refraction. But they have the same source") তাই তিনি বলছেন, মানবসেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেই ঈশ্বরের সেবা

করা যায় (Service to man is service unto God') । তাই তাঁর জীবন দর্শন বলে, জ্ঞান যোগ ও কর্মযোগে আত্ম উন্নয়ন ও আত্ম উপলব্ধি ঘটিয়ে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে প্রকৃত সত্যে পৌঁছানো এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব এবং এর পথ হবে অহিংসা। গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার পিছনেও তাই আছে এক দর্শন— জীবনের দিকে যাত্রা (A way of life)। এই দর্শন সমাজে বিপ্লব আনতে পারে, এর সংস্কার করে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে পারে।

৪.৮.৩ শিক্ষার অর্থ (Meaning of education)

গতানুগতিক মত অনুযায়ী সাক্ষরতা অর্জনই শিক্ষা একথা গান্ধিজি বিশ্বাস করেন না। তিনি বলছেন, 'সাক্ষরতা শিক্ষার প্রারম্ভিক বা অন্তিম কোনো বিষয় নয়। এটি শিক্ষার অন্যতম উপায় যার মাধ্যমে নরনারী শিক্ষিত হতে পারে। সাক্ষরতা নিজে কোনো শিক্ষা নয়।' ('Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is one of the means whereby man nad woman can be educated. Literacy it self is no education.')। তিনি বলছেন, "শিক্ষা বলতে আমি বুঝি শিশুর অথচ ব্যক্তির দেহ মন আত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে" ("By education I mean an all round drawing out of the best in the child and man – body, mind and spirit".)। তিনি আরও মনে করেন যে, "প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে শিশুর অভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, শারীরিক ক্ষমতা সমূহের উদ্দীপন ও বিকাশ" ("True education is that which draws out and Himulates the spiritual, intellectual and physical faculties of the children")। তাঁর মতে শিক্ষা মানব বিকাশের কোন দিককেই অবহেলা করে না বরং সার্বিক বিকাশের পথ ধরে তাকে মানব বিকাশে নিয়োজিত করে এবং সামাজিক দক্ষভাবে গড়ে তুলে সত্যের পথে পৌঁছে দেয়।

৪.৮.৪ শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of edcuation)

গান্ধিজির নতুন বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র সুষম, সমন্বয়ী ব্যক্তি তৈরিই নয়, তার সঙ্গে সুষম সমাজ গঠন করা (The ultimate objective of New Education is not only to create a balanced and hurmonious in dividual but also a balanced society)।

এন. সি. ই. আর. টি. প্রকাশিত 'Basic Education - A Fresh look' পুস্তিকায় বলা হয়েছে গান্ধিজির 'নঈ তালিম' বা নয়া শিক্ষার লক্ষ্য ছিল—

সামাজিক অগ্রগতি, জাতীয় উন্নয়ন, সকলের জন্য জীবিকার নিশ্চয়তাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় সংহতি, মানবজাতির সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে— শিক্ষাকে সম্পর্কিত করা।

৪.৮.৫ পাঠক্রম (Curriculum)

শিক্ষার ধারণা ও লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মহাত্মা গান্ধি বিস্তৃত পাঠক্রমের সুপারিশ করেন। পাঠক্রমে থাকবে—

(ক) মৌল শিক্ষা— সুতোকাটা, বয়ন, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি বা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে কোনো একটি শিল্প। (খ) মাতৃভাষা, (গ) গণিত, (ঘ) সমাজ বিজ্ঞান — ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, গ্রাম্য অর্থনীতি ইত্যাদি। (ঙ) সাধারণ বিজ্ঞান— প্রকৃতি পাঠ, জীব বিদ্যা, শারীর বিদ্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, (চ) সংগীত, (ছ) চারুশিল্প, (জ) হিন্দুস্থানী ভাষা।

বুনিয়াদি শিক্ষার ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দুস্থানীতে সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। তাঁর পরিকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষায় একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি উৎপাদনীমূলক হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধের নীতির (Principle of correlation) ভিত্তিতে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি পাঠের কথা বলা হয়।

৪.৮.৬ শিক্ষাদান পদ্ধতি (Method of Teaching)

গান্ধিজি পরিকল্পিত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রকল্প পদ্ধতি (project method)-র অনুরূপ। মতে বিজ্ঞান সম্মতভাবে খেলাচ্ছলে, আত্মপ্রয়াসে, স্বেচ্ছা আবিষ্কারে, উদ্দেশ্য রচনা করে, সঠিক পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য রচনা করে, সঠিক পরিকল্পনা করে, কাজের মাধ্যমে পরবর্তীকালে কর্মলব্ধ অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা কাজটি স্বতোৎসারিতভাবে চলতে থাকে। এখানে শিক্ষার্থীরা থাকে আবিষ্কারকের ভূমিকায়, কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় শ্রোতা বা শিক্ষার্থীর ভূমিকায় থাকে না। এই পদ্ধতির চারটি স্তর— (১) উদ্দেশ্য রচনা করা (purposing), (২) পরিকল্পনা করা (planning), (৩) সম্পাদন করা (executing), (৪) বিচার করা (judging)। বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতি এবং প্রকল্প পদ্ধতি উভয়েই কর্মকেন্দ্রিক। প্রকল্প পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর কৃত যে কোন সহযোগিতামূলক স্বায়ত্তশাসনমূলক বা উৎপাদনভিত্তিক কাজে তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণ করে অপর দিকে বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি হল অবশ্যই কোন হস্ত শিল্প কেন্দ্রিক (craft centred)।

৪.৮.৭ শিখন মাধ্যম (Medium of Instruction)

মহাত্মা গান্ধি শিখনের মাধ্যম হিসাবে বিদেশি ভাষার ব্যবহারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যম শিক্ষার কথা জোর গলায় বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, বিদেশি ভাষা মাধ্যমে শিক্ষণে মস্তিষ্কের স্নায়ুতে চাপ পড়ে। শিক্ষার্থীরা যা শেখে, সেটা শুধু অনুকরণ করতে শেখা। নতুন চিন্তা এবং নতুন কিছু সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীরা অপারগ হয়। তিনি বলেছেন, "বিদেশি মাধ্যম আমাদের শিশুদের নিজভূমেই পরবাসী করেছে। এটাই চালু প্রথার সর্বোত্তম ব্যর্থতা। বিদেশি মাধ্যম আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার বিকাশেও বাধা সৃষ্টি করেছে।" (The forcign medium has made our children practically forcigners in ruir own land. It is the greatest tragedy of the exisiting system. The foreign medium has presented the growth of our vernaculars)।

৪.৮.৮ শৃঙ্খলা (Discipline)

গান্ধিজি আত্ম শৃঙ্খলা (Self discipline)-য় বিশ্বাসী ছিলেন। এই শৃঙ্খলা আত্ম নিয়ন্ত্রণ (Self control) এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এই শৃঙ্খলা ভিতর থেকে উদ্দীপ্ত, বাইরে থেকে অর্জন করা যায় না। এর জন্য এমন শিক্ষা চাই

যা শারীরিক, মানসিক, সাহস, শক্তি, ন্যায়, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মান গড়ে তুলবে। এই ব্যক্তিসত্তার মূল উপাদানগুলি গড়ে উঠলেই মানুষ সামাজিক হয়ে উঠবে এবং সে সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্জন করতে পারবে।

৪.৮.৯ শিক্ষক (The Teacher)

গান্ধিজি বলেছেন, তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনাকে, সার্থক ও কার্যকরীভাবে রূপায়িত করতে গেলে শিক্ষককে ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে। তাঁদের কেবল কারিগর হলে চলবে না, হতে হবে সৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন শিল্পী। আদর্শ শিক্ষকের অন্তরে থাকবে ভালোবাসা, পরম সেবার মনোভাব, সহানুভূতি, অফুরন্ত উৎসাহ, ত্যাগের ইচ্ছা, দেশভক্তি এবং সঙ্গে থাকবে অফুরন্ত জ্ঞান।

শিক্ষকের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা থাকবে এবং তিনি সামাজিক মনোভাবের অধিকারী হবেন। সবার ওপর তাঁর নিজের বৃত্তি বা পেশার প্রতি থাকবে অফুরন্ত ভালোবাসা।*

৪.৮.১০ স্ত্রী শিক্ষা (Women education)

স্ত্রী শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে গান্ধিজি নারীদের বিভিন্ন সংস্কার ও আকারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে বলেছেন এবং তাঁদের প্রবণতা ও জীবনের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, শিশুদের শিক্ষাস্থানের ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা নারীই অধিক উপযোগী। দার্শনিক প্লেটোর গান্ধিজিরও নারীজাতির বুদ্ধি ও যোগ্যতার ওপর ভীষণ আস্থা ছিল।

৪.৮.১১ গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা (Basic Education Scheme of Gandhiji)

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করতে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় (Wardha) গান্ধিজি এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন এবং তাঁর নতুন শিক্ষাপরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। এই পরিকল্পনা ওয়ার্ধায় নেওয়া হয়েছিল বলে এটি 'বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা'র সঙ্গোসঙ্গে 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' নামেও খ্যাত।

এই বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি ছিল শিশুকেন্দ্রিক, জীবনকেন্দ্রিক, শিল্পকেন্দ্রিক ও স্বয়ম্ভর। প্রথমে বলা হল সাত বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকেই বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্পর আওতায় আনতে হবে। এই শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। ইংরেজির কোন স্থান থাকবে না। শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে থাকবে একটি উৎপাদনী শিল্প। উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষার দ্রব্যের বিক্রয়ের মাধ্যমে শিক্ষকের বেতন আসবে। অর্থাৎ শিক্ষা হবে স্বনির্ভর। শিক্ষাতে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করে গ্রাম্যজীবনের উপযোগী করে তুলতে হবে। এই ধরনের শিক্ষার নাম হয় 'বুনিয়াদি শিক্ষা' (Basic Education)। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখতে ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হল। কমিটি ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে দুটি রিপোর্ট পেশ করেন। কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশন রিপোর্টগুলি গৃহীত হয়। ১৯৩৯ সালে সেবাগ্রামে 'হিন্দুস্থানী তালিমি

* "What we need is educationists with originalit fired with true zeal, who will think out from day to day what they are going to teach then pupols." — M. K. Sandhi.

সংঘ' নামে নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। তার নিয়ন্ত্রণে দেশে চালু হয়ে যায় প্রাথমিক শিক্ষার নতুন সংস্করণ বুনিয়াদি শিক্ষা।

এই শিক্ষাকে বুনিয়াদি (Basic) বলা হয়েছে, কারণ, এই শিক্ষাই ভবিষ্যৎজীবন গঠনের ভিত্তিভূমি যার বুঁনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে পূর্ণবিকশিত সার্থক জীবনের সফলতার ইমারত। বুনিয়াদি শিক্ষার মূল কথা—কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ। দেশের মাটি আর দেশের জীবন ধারার সঙ্গে যে প্রাণের যোগসূত্র গড়ে উঠবে, তাই হবে তার ভাবী জীবনের মূলধন আর জাতির অমূল্য সম্পদ। গান্ধিজি মনে করে ছিলেন নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের লুপ্ত গ্রাম্য গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হবে। জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধ তাই গান্ধিজি লিখলেন, 'The scheme is a revolution in the education of the village children'। তিনি আরও বলেছেন যে, তার পরিকল্পনা সমাজ বিপ্লবের বর্শাফলক যা ন্যায় বিচারমূলক সমাজের ভিত্তি রচনা করে ধনী দরিদ্রের বিভেদকে প্রশমিত করবে। ''My plan .... is thus conceived as the spear-haed of a social revolution. It will prove a healthy and normal basis of relationship between the cty and the village, and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatuaral division between haves and have nots.''

এই বুনিয়াদি শিক্ষা কিছু ত্রুটির জন্য সমালোচিত হয়। বলা হল (১) শিক্ষা 'স্বনির্ভর' করতে গেলে শিক্ষালয় কারখানায় পরিণত হবে। অনেকে একে পরিকল্পনা বলে আখ্যা দিলেন। (২) কেবলমাত্র একটি হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে সমস্ত বিষয়কে অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়ানোও এক অবাস্তব পরিকল্পনা। (৩) গ্রামীণ শিল্পের কথা বলা হলেও শহরের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্প নির্ধারণের কথা বলাই হয়নি। (৪) যে ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন তা পাওয়া কষ্টসাধ্য, (৫) শিক্ষার্থীর চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজিতে সম্পূর্ণ বর্জন করার প্রস্তাব পরবর্তীকালের শিক্ষাবিদদের অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

১৯৪৫ সালে জানুয়ারি মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষার্থীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধিজি বলেন, প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষা 'মানুষের জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষা' হয়ে ওঠেনি। সেইভাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার চারটি স্তরের কথা বলেন এবং এই সম্প্রসারিত বুনিয়াদি শিক্ষার নাম দিলেন 'নঈ তালিম' (Nai Talim) অথবা 'নয়া শিক্ষা' (New Education)। 'Nai Talim' বুনিয়াদি শিক্ষার সম্প্রসারণ মাত্র। চারটি স্তর।

১। **প্রাক্ বুনিয়াদি স্তর**— ৭ বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য।

২। **বুনিয়াদি স্তর**— ৭ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য।

৩। **উত্তর বুনিয়াদি স্তর**—১৪ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য।

৪। **বয়স্ক শিক্ষা**—গান্ধিজির মতে বয়স্ক শিল্প বুনিয়াদি শিক্ষার নির্ভরযোগ্য অংশ হওয়া উচিত। তিনি পরবর্তীকালে ইংরেজিকে ভাষা হিসাবে শিক্ষার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ভালো বিষয়গুলি শিক্ষার বিরোধিতা করেন নি। তিনি বলেন, ''আমি চেয়েছি সমস্ত দেশের সংস্কৃতির বাতাস আমার বাড়িতে মুক্ত হয়ে প্রবেশ করুক, তবে আমি চাইনি তাদের দ্বারা আমার নিজের বাসভূমি থেকে উৎপাটিত হতে। আমি

চাইব আমাদের তরুণ ছেলেমেয়েরা সাহিত্যের রুচি তৈরিতে ইংরেজি এবং অন্য বিদেশি ভাষা যতটা পছন্দ করে শিখুক এবং আশা করব তাদের শিক্ষন মাধ্যমে ভারত এবং বিশ্বের যতটা পারে উপকার করুক।"

৪.৮.১২ মূল্যায়ন (Evaluation)

গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা একাধারে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ এবং প্রয়োগবাদের উপাদান নিয়ে গঠিত। গান্ধিজি অন্তরের মর্মমূলে ছিলেন ভাববাদী। অথচ তাঁর আদর্শের রূপায়ণে তিনি ছিলেন একাধারে প্রকৃতিবাদী এবং প্রয়োগবাদী। সমস্ত প্রধান দার্শনিক মতবাদের সম্মেলনে তাঁর নয়া শিক্ষাভাবনা গড়ে উঠেছে। গান্ধিজির শিক্ষাদর্শন শিক্ষার গঠনে ছিল প্রকৃতিবাদী, লক্ষ্যে ছিল ভাববাদী এবং পদ্ধতি ও কার্যক্রমে ছিল প্রয়োগবাদী।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে গান্ধিজির ছিল বিশ্বজনীন, দৃষ্টিভঙ্গি, শক্তিশালী উদ্যোগ এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বিপদে রক্ষাকারী তিনি ছিলেন শক্তিশালী আলোক বর্তিকা, দার্শনিক সততায় শীর্ষে অবস্থানকারী, একজন গঠনমূলক প্রতিভা, একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, মানবতাবাদী, শিক্ষাবিদ এবং সর্বোপরি আধুনিক ভারতের সংস্কার সাধনকারী একজন ব্যক্তি। তিনি সঠিকভাবেই 'জাতির জনক', 'সত্য ও অহিংসার প্রচারক' বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন ভারতের দীপশিখা যার আলোক শিক্ষার বিচ্ছুরণ কেবলমাত্র ভারতের অন্ধকারময় নিভৃত কোণেই পৌঁছায়নি, বিস্তৃত বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বজনীন মানুষের মনকে উদ্দীপ্ত করেছে। এটা বলা একেবারেই অতিরঞ্জিত হবে না যে, তার 'নঈতালিম' বা 'নয়াশিক্ষা'র তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগ স্বাধীনতার পরে ভারতের শিক্ষার পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*

৪.৯ অনুশীলন

১। প্লেটোর ভাববাদী দর্শন ও শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে যা জান লেখো।

২। নীচের বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করে রুশোর শিক্ষাভাবনা আলোচনা কর।

(ক) প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা (খ) বিভিন্নস্তর অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য (গ) নেতিবাচক শিক্ষা (ঘ) প্রাকৃতিক ফলাফলের মাধ্যমে শৃঙ্খলা (ঙ) স্ত্রী শিক্ষা।

৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করে রুশোর অবদানগুলি আলোচনা করো।

(ক) শিক্ষার ধারণা, (খ) শিক্ষার লক্ষ্য, (গ) পাঠক্রম, (ঘ) শিক্ষণ পদ্ধতি।

৪। শিক্ষায় পেস্তালৎসির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ফ্রয়েবেলের চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করো।

---

* Shri Vinoba Bhave remarked, "The old education pays homage to Lakshmi, Shakti, Sarawati, the new education pays homage to humanity, and Values these three-wealth, power and knowledge - only as instrument of sevice." S.N. Mukherjee (Education in India - Today and Tomorrow)

(ক) ঐক্যভাবনা (খ) পাঠক্রম (গ) পদ্ধতি (ঘ) শিক্ষকের ভূমিকা।

৬। ফ্রয়েবেলের কিন্ডারগার্টেন বলতে তুমি কী বোঝ? এই প্রসঙ্গে তাঁর 'উপহার', 'কান' ও 'খেলা'র তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো।

৭। শিক্ষার ধারণা পাঠক্রম, পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে জন ডিউইর ধারণা আলোচনা করো।

৮। সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা বিবৃত করো।

৯। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন স্কুল ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বধে যা জান লেখো।

১০। বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনা বিবৃত করো।

১১। গান্ধিজি প্রস্তাবিত বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা এবং এর প্রসারণে 'নঈ তালিম' পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করো। এই পরিকল্পনা বুনিয়াদি নামে চিহ্নিত হল কেন?

১২। গান্ধিজির প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা, শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, শিক্ষণ মাধ্যম, শৃঙ্খলা, স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা আলোচনা করো।

১৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ—

(ক) প্লেটোর সাংস্কৃতিক ভাববাদ।

(খ) রুশোর প্রকৃতিবাদ।

(গ) রুশোর ইতিবাচক শিক্ষা ও নেতিবাচক শিক্ষা।

(ঘ) রুশোর শৃঙ্খলাতত্ত্ব।

(ঙ) রুশো ও পেস্তালৎসির শিক্ষাভাবনার তুলনা।

(চ) ফ্রয়েবেলের ভাববাদী দর্শন।

(ছ) ফ্রয়েবেল বর্ণিত 'উপহার' ও 'কাজ'।

(জ) কিন্ডার গার্টেন।

(ঝ) জন ডিউইর প্রয়োগবাদী দর্শন।

(ঞ) জন ডিউইর সমস্যা সমাধান পদ্ধতি।

(ট) জন ডিউইর বিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা।

(ঠ) রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির কোলে শিক্ষা সম্পর্কে ভাবনা।

(ড) রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী।

(ঢ) বিবেকানন্দের জীবন দর্শন।

(ণ) বুনিয়াদি শিক্ষার ওয়ার্ধা পরিকল্পনা।

১৪। সঠিক উত্তরটি লেখো—

(ক) কার উক্তি?

"জন্ম মুহূর্তে মানুষ স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ"

—ডিউই, ফ্রয়েবেল, রুশো, গান্ধিজি।

(খ) 'আধুনিক শিক্ষার জনক' কাকে বলা হয়?

—রুশো, পেস্তালৎসি, প্লেটো, রবীন্দ্রনাথ।

(গ) 'আমি শিক্ষা ও নির্দেশনাকে মনস্তত্ত্ব নির্ভর করতে চাই'—কার উক্তি?

—ফ্রয়েবেল, পেস্তালৎসি, ডিউই, বিবেকানন্দ।

(ঘ) 'বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ'—কার উক্তি?

— ডিউই, রুশো, প্লেটো, ফ্রয়েবেল।

(ঙ) কার উক্তি—

"হে বীর সাহস অবলম্বন করো, — সদর্পে বল — আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।"

—রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধিজি, জাকির হোসেন।

(চ) কার উক্তি—

"যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও তবে স্বামীজিকে পাঠ কর। তাঁর মধ্যে সব কিছুই ধনাত্মক, ঋণাত্মক কিছু নেই।"

—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজি, রাধাকৃষ্ণণ, ফ্রয়েবেল।

(ছ) কে শিক্ষার এই সংজ্ঞা দিয়েছিলেন?

(১) 'মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশই শিক্ষা'

—বিবেকানন্দ, গান্ধিজি, রুশো, ফ্রয়েবেল।

(২) 'সর্বোচ্চ শিক্ষা আমাদের তথ্যই সরবরাহ করে না, সৃষ্টির সকল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করে।'—গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণণ, কোঠারি।

(৩) 'শিক্ষা বলতে আমি বুঝি দেহ, মন, আত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ'— গান্ধিজি, ফ্রয়েবেল, রবীন্দ্রনাথ, রুশো।

১৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কোনটি কোন শিক্ষাবিদের নামের সঙ্গে জড়িত?

(ক) 'বুনিয়াদি শিক্ষা'।

(খ) 'শান্তিনিকেতন'।

(গ) 'এমিল'।

(ঘ) 'বস্তুপাঠ'।

(ঙ) 'সিলেবারিস'।

(চ) 'ল্যাবোরেটরি স্কুল'।

(ছ) 'সমস্যা সমাধান পদ্ধতি'।

(জ) 'প্রয়োগবাদী দর্শন'।

(ঝ) 'কিন্ডার গার্টেন'।

(ঞ) 'উপহার' ও 'কাজ'।

একক ৫ ❑ শিক্ষা সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয় (Some issues in Education)

গঠন

৫.১ শিক্ষায় স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা

৫.১.১ শৃঙ্খলা ও শাসন

৫.১.২ শৃঙ্খলার বিভিন্ন ধারণা (প্রাচীন ধারণা, চাপ সৃষ্টি করা শৃঙ্খলা, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা, আধুনিক ধারণা)

৫.১.৩ স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা।

৫.২ শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শে

৫.২.১ গণতন্ত্রের অর্থ

৫.২.২ আদর্শ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

৫.২.৩ শিক্ষায় গণতন্ত্র

৫.৩ শিক্ষা ও মানবসেবা

৫.৩.১ মানবসেবার প্রাচীন ধারণা

৫.৩.২ আধুনিক ধারণা

৫.৩.৩ মানবিকতার সমস্যা

৫.৩.৪ মানবসেবার সমস্যা সমাধানে শিক্ষা

৫.৪ শিক্ষায় আন্তর্জাতিকতা বোধ

৫.৪.১ আন্তর্জাতিকতাবোধ বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার অর্থ

৫.৪.২ আন্তর্জাতিকতা বোধে শিক্ষায় ভূমিকা।

৫.১ শিক্ষায় স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা (Freedom and Discipline in Education)

৫.১.১. শৃঙ্খলা ও শাসন (Discipline and Order)

গতানুগতিক শিক্ষা অনুযায়ী প্রথাবদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার পরিবেশ বা শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য বহুবিধ নিয়মকানুন প্রচলিত আছে। এগুলি একদিকে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজ, ছাত্রভর্তি, ছাত্র উপস্থিতি, শ্রেণিকক্ষ, সময় তালিকা নির্ধারণ, ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা সংক্রান্ত

অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষকগণের আদেম মান্য করে চলা, পড়ার সময় নীরবতা বজায় রাখা, বিদ্যালয়ের শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত না করা ইত্যাদি। শিক্ষার্থী নিজের অন্তরের বাইরের পরিস্থিতির এবং শাস্তির ভয়ে এই নিয়ম গুলি মেনে চলেতে বাধ্য হয়। এর জন্য এর কৃত্রিম শান্ত পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়। দৃঢ়বন্ধ নিয়ম কানুন প্রয়োগ করে বাহ্যিক শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার বিধিকে শিক্ষাবিদগণ 'শৃঙ্খলা' আখ্যা না দিয়ে 'শাসন' (Order) বলার পক্ষপাতী।

অপরদিকে আধুনিক অর্থে শৃঙ্খলাকে শিশুর অন্তর্জাত বলে মনে করা হয়। প্রকৃত শৃঙ্খলা জীবন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে শিশুর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়। এই মনোভাব বাইরের থেকে চাপ দেওয়া কোন শাসনের বশতা নয়। প্রকৃত শৃঙ্খলা হচ্ছে ইচ্ছাপূর্বক পরিবেশের ও নিজস্ব বিকাশের তথা প্রকৃতির নিয়মকে ইচ্ছাপূর্বক মান্যতা দান করা।

সেজন্য আমরা বলতে পারি শৃঙ্খলার দুটি দিক আছে একটি নেতিবাচক অপরটি ইতিবাচক। নেতিবাচক হচ্ছে যা নিজের ও সমাজের যা কিছু খারাপ তার থেকে দূরে থাকা এবং ইতিবাচক হচ্ছে ব্যক্তির নিজের ও সমাজের যা কিছু মঙ্গল করবে সে দিকে ব্যক্তির আত্মবিকাশকে তরান্বিত করা বা এগিয়ে নিয়ে চলা। এখন আমরা 'শাসন' ও 'শৃঙ্খলা'র মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা সহজেই নিরূপণ করতে পারব।

(১) শাসন বাইরের থেকে চাপানো, শৃঙ্খলা অন্তর্জাত।

(২) শাসনের ধারণা, সঙ্কীর্ণ, নেতিবাচক, কঠোর অবদহনমূলক। প্রকৃত শৃঙ্খলা ধারণায় ইতিবাচক, মুক্ত ও মানবিক।

(৩) শাসনে শিক্ষার্থীর ভুলত্রুটিগুলি নির্দেশিত করে শিক্ষক তাকে সেগুলি থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন। শৃঙ্খলা আনয়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যযুক্ত কাজে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেন।

(৪) শাসনে আনন্দ, স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। শৃঙ্খলার মধ্যে আনন্দ, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে।

(৫) শাসনে থাকা বাধা, নিষেধ। সব কিছুই 'ক'র না' (Don't) দিয়ে শুরু করতে হয়। শৃঙ্খলা শুরু করতে হয় 'কর' (Do) বলে।

(৬) শাসনের একটি উদ্দেশ্য বর্তমান। শাসনের উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা গড়ে তোলে। অপরপক্ষে শৃঙ্খলার উদ্দেশ্য শৃঙ্খলাই।

৫.১.২ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে শৃঙ্খলার ধারণা (Different approaches to discipline)

বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শৃঙ্খলার ধারণা সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি।

● **প্রাচীন ধারণা (Ancient Concept) :** প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে মনে করা হত জন্ম অপরাধী, পাপী। এই পাপ থেকে শিক্ষা তাকে মুক্ত করতে পারে কঠোর শৃঙ্খলাবিধি তার ওপর বাইরে থেকে জোর করে আরোপিত করে—এই রকম মনে করা হত। এই শৃঙ্খলা ছিল অবদমন মূলক। শিশুর ইচ্ছা, আকাঙ্খা, রুচি আগ্রহ সব কিছুই এই শৃঙ্খলার ফলে অবদমিত হয়। শাসনের দণ্ড ছিল শিশুকে বশে আনার একমাত্র উপায়। একটি আপ্তবাক্য খুব

প্রচলিত ছিল দণ্ডকে ছুটি দলে শিশু নষ্ট হয়ে যাবে (Spare the rod and spoil the child)। প্রাচীনকালে ধর্মীয় ভাববাদীগণ অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব নির্দিষ্ট মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে শিষ্য বা শিক্ষার্থীদের ওপর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই রকম অবদমনমূলক অনুশাসন শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিতেন। মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষাবিদগণও কতকগুলি প্রস্থাকরণ নির্দেশ যান্ত্রিকভাবে অনুশীলন করতে বলতেন। এই শৃঙ্খলা ছিল আরোপিত, নেতিবাচক এবং অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপানো। শিশু বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল এই ধরণের শৃঙ্খলকে আধুনিক শিক্ষা জগৎ আদৌ গ্রহন করতে পারেননি।

● **ছাপসৃষ্টি করা শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Impressionistic Theory) :** অনেক প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ মনে করেন যোগ্য শিক্ষক তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করতে পারেন। একজন স্নেহ প্রবণ, আত্মনিয়ন্ত্রিত, সৎ, মর্যাদাবান শিক্ষক তাঁর চিন্তা, অনুভূতি এবং কাজের দ্বারা শিশুর চিন্তা, অনুভূতি এবং কাজের দ্বারা শিশুর ওপর বিরাট প্রভাব বা ছাপ ফেলতে পারেন এবং শিশুরা সচেতনভাবে বা অবচেতনে শিক্ষককে অনুসরণ করে থাকে। শিক্ষক শৃঙ্খলাপরায়ণ হলে শিশুরাও শৃঙ্খলা পরায়ন হয়। যে সব শিক্ষাবিদ শিশুদের জীবনে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তাদের বলা হয় অনুসরণমূলক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী (Impressionists) এবং শৃঙ্খলার ধারণাকে বলা হয় অনুসরণমূলক বা ছাপ সৃষ্টি করা শৃঙ্খলা (Impressionistic discipline)। এই শৃঙ্খলা অবদমনমূলক শৃঙ্খলা থেকে কিছুটা উন্নততর, কিন্তু এটিও সম্পূর্ণভাবে শিশুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা আত্ম নিয়ন্ত্রণমূলক নয়। এখানেও একটি চাপ অপ্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। গুরুর ব্যক্তিত্বের প্রভাব কীভাবে শিষ্যের বা ছাত্রের শৃঙ্খলা আনয়নে সাহায্য করে তার উদাহরণ আমরা ইংলণ্ডের আর্নোল্ড এবং থ্রিং (Arnold and Turing) আমেরিকার মার্ক হপকিং (Mark Hopking) এবং বাংলার রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাই।*

● **প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বা মুক্তিকামী শৃঙ্খলা (Naturalistic or Emancipationistic discipline) :** প্রকৃতিবাদী দর্শন অনুযায়ী শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক বিকাশমান প্রক্রিয়া। বাইরে থেকে আরোপিত অনুশাসনে শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। শিশু সমস্ত বিষয়ে জানা, বোঝা ও ইচ্ছাপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা পেলেই সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারে। এই দর্শনে বলা হল শিশু পরিবেশে নিজস্ব একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলার ধারণা পায়। কাজের ফলাফলের তত্ত্বের ভিত্তিতে সে শেখে কোন্‌টি করা উচিত এবং কোন্‌টি করা উচিত নয়। যেটি বেদনাদায়ক সেটি পরিত্যাগ করে এবং যেটি সন্তোষজনক ফলদায়ক সেটি সে অনুসরণ করে। এই ধরনের শৃঙ্খলাকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা' বা 'মুক্ত শৃঙ্খলা' (Free discipline) এই শৃঙ্খলার ধারণার জনক প্রকৃতিবাদী রুশো। হার্বার্ট স্পেনসারও মনে করেন অপরাধ অনুযায়ী প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকৃতিই শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়। শিশুর জীবনে শৃঙ্খলা আনতে প্রকৃতিই যথাযোগ্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। মুক্ত শৃঙ্খলার তত্ত্বে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদদের বলা হয় প্রকাশবাদী (Expressionise) বা মুক্তিকামী

---

* "It is equally true that impression has profound effect. We do got our moral sentiments, attitude, and enthusiasms in the first instance by contagion from admiored personalities".

(Emancipationist) শৃঙ্খলাবাদী, কারণ তাঁরা শিক্ষার্থীর অবাধ আত্মপ্রকাশ বা কৃত্রিম অনুশাসনের বন্ধন থেকে শিশুর মুক্তি চান।

প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বের ভিত্তিতে শৃঙ্খলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী অবাধ স্বাধীনতা পায় যা শিক্ষার্থীর বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয়—তা আমরা জানি। আগুনে হাত দিয়ে ছাত্রের হাত পুড়েছে—পুড়ুক। শিশু জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবতে বসেছে, ডুবুক। সব সময় ও পরিস্থিতিতে এরকম ভাবলে শিশুরা প্রকৃতিপ্রদত্ত শাস্তির ফলে শুধরানোর সময় পাবে না— তার আগেই সর্বনাশ ঘটে যাবে। এ কথা মনে করেন আধুনিক শিক্ষাবিদগণ। তাঁরা এও মনে করেন প্রথাবদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেখানে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে পড়তে আসে, সেখানে অবাধ সাধীনতা অনেক সময় স্বেচ্ছাচ্চারে পরিণত হতে পারে। তাই তারা বলেন শিশুর সার্বিক বিকাশ লাভের প্রশস্ত করতে সঠিক পরিবেশ রচনা করতে শিক্ষকের অপ্রত্যক্ষ নির্দেশনা জরুরি।

● **আধুনিক ধারণা (Modern Concept) :** আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান অনুযায়ী বলা হয়, বিদ্যালয়ে গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে নিয়োজিত করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শৃঙ্খলাকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আপনা আপনি গড়ে ওঠে। সৃজনশীল দলবদ্ধ, উৎপাদনী, সহযোগিতামূলক ও গঠনমূলক কাজ ও সহজোগিতা মূলক জীবন যাত্রার মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আধুনিক শৃঙ্খলার সারকথা।

এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় হবে আদর্শ সমাজ পরিবেশ। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কাজের উদ্দেশ্য ঠিক করবে। পরিকল্পনা করবে, সম্পাদন করবে এবং নিজেদের কাজের মূল্যায়ন নিজেরাই করবে। শিক্ষক পাশে বন্ধুর মত থেকে প্রয়োজনে পরামর্শ দেবেন। আদর্শ সমাজ পরিবেশ রচনা করে দেবেন। এই আধুনিক শৃঙ্খলা হচ্ছে স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলা (automatic discipline)। এটি শৃঙ্খলার ইতিবাচক ধারণা এবং এর মুখ্য প্রবক্তা হচ্ছেন প্রয়োগবাদী আমেরিকান দার্শনিক জন্ ডিউই। সামাজিক শৃঙ্খলা (Social discipline)-র ধারণাও এমনিই।

শিক্ষার্থীদের গঠিত স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে অতি সহজেই শিক্ষামূলক মুক্ত স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলা গড়ে তোলা যায়।

৫.১.৩ স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা (Freedom & Discipline) :

মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন। তার মানবতার প্রকাশ স্বাধীন ইচ্ছার দোলাচলে। তাই আধুনিক কালে শিশুকে আর জন্ম অপরাধী বলে মনে করা হয় না।

স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বাধীনতা হচ্ছে 'স্ব + অধীনতা' অর্থাৎ নিজের ওপরে নিজের নির্ভরতা।

এখন প্রশ্ন হল স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা কী একই অর্থবোধক?

প্রাচীন ধারণায় শৃঙ্খলা যখন আরোপিত কতকগুলি অনুশাসন মেনে চলা তখন শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার ধারণা পরস্পর বিরোধী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। একটি তখন মানুষকে অগ্রগমনে সাহায্য করে, অপরটি পশ্চাতে টেনে ধরে।

আমরা জানি স্বাধীনতা যখন ব্যক্তির স্বভাবিক সহজাত আকাঙ্খা বা চাহিদা প্রকৃত শৃঙ্খলা তখন প্রয়োজনীয় স্ব-উপার্জিত বিষয়। শৃঙ্খলা যখনই আধুনিক ধারণায় বিবর্তিত হতে থাকে তখন শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সমর্থন হতে থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সহাবস্থানের মাধ্যমে সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারে। উভয়েরই লক্ষ্য নির্দিষ্ট। উভয়েরই লক্ষ্য ব্যক্তির সার্বিক ও সমন্বিত বিকাশ যে ব্যক্তি বাইরে ও ভিতরে নিজস্ব কর্তৃত্বকে উপলব্ধি করে এবং সঙ্গে নিজের ভিতরে ও বাইরে সমাজে স্বাধীনতার স্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

৫.২ শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ (Democratic Ideals in Education)

গণতন্ত্রের ইংরেজি শব্দ Democracy দুটি গ্রিক শব্দ 'Demos' (যার ইংরাজি অর্থ 'people') এবং 'Kratis' (যার ইংরাজি অর্থ 'Power') থেকে উদ্ভুত। তাই গণতন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় 'জনতার ক্ষমতা'। চিরাচরিত মত অনুযায়ী এটি রাজনৈতিক অর্থ গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করে এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের মত অনুযায়ী রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলতে 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের পরিচালন ব্যবস্থা তথা সরকার' কে বোঝায় ('Democracy is government of the people, by the people and for the people')।

বর্তমানে গণতন্ত্রের অর্থ বহুধা বিস্তৃত। এটি একটি জীবনদর্শন, আদর্শ জীবন যাপনের দিকে যাত্রা। আদর্শ গণতন্ত্রে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দলের সঙ্গে অপর দলের দ্বন্দ্ব অদৃশ্য হতে থাকে। ব্যক্তি লক্ষ্য ও সামাজিক লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যকেই জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যেমন মূল্য দেওয়া হয় তেমনি তার সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক এবং সমাজের প্রতি তার দায়িত্বকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সকলের জন্য সমসুযোগ, দৈনন্দিন নাগরিক জীবন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার আধুনিক গণতন্ত্রের মূলকথা। এই গণতান্ত্রিক ধারণা এমন এক সমাজের কথা বলে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি নিজস্ব প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবিকাশে সমর্থ হয়। এই সমাজে একজন ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির বা দলের ওপর খবরদারির কোনো জায়গা নেই।

৫.২.২ আদর্শ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ideal Democracy)

আদর্শ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

(১) সহযোগিতামূলক সামাজিক জীবনযাপনের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মউপলব্ধির সর্বাত্মক সুযোগ।

(২) জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বোধ।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শোষণের মনোভাবের পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব।

(৪) শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণি বৈষম্যের অনুপস্থিতি।

(৫) সঠিক বিচারকরণের জন্য ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন।

(৬) উন্নত নাগরিকতা অর্জন।

(৭) সকলের মুক্ত কণ্ঠে ও ইচ্ছায় সকলের জন্য মিলিত সরকার।

(৮) উন্নত গণতন্ত্রের সব সময়ই লক্ষ্য থাকবে কাউকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে না দিয়ে সকলের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

এই রকম শ্রেণিহীন, গতিশীল, কর্তৃত্বের বাধায় লাঞ্ছিত নয় যে গণতন্ত্র তাই মানুষের সর্বাধিক কাম্য। তাই গণতন্ত্র বলতে এখন শুধু সংকীর্ণ গতানুগতিক অর্থে রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বোঝায় না। গণতন্ত্র বলতে এখন অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, সামাজিক গণতন্ত্র ইত্যাদিও বুঝিয়ে থাকে।*

এ কারণে শিক্ষাক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের ধারণাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়।

৫.২.৩ শিক্ষার গণতন্ত্র (Democracy in Education) :

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন মন্তব্য করেছেন যে, 'গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য এন সমাজ গঠন করা যেখানে ব্যক্তি সক্রিয়তার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের সাথে সাথে অন্য ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধন করতে পারে।.....গণতন্ত্রে শিক্ষা বিদ্যালয়ে তথা বিদ্যালয়ের বাইরে প্রতিটি ব্যক্তির অভ্যন্তরে জ্ঞান, আগ্রহ, আদর্শ, অভ্যাস এবং ক্ষমতার সঞ্চার ঘটায় যাতে সে সমাজে নিজস্ব সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ খুঁজে বার করতে পারে এবং সেই সম্ভাবনাকে নিজের এবং সমাজের আরও মহত্তর কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করতে পারে।*

বুর্জোয়া, সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব পরায়ণ শাসনাধীনে আগে থেকে নির্ধারিত শিক্ষা জোর করে শিশুর ইচ্ছার বিরুধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কর্তৃত্বের ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব নির্দিষ্ট পথে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

গণতন্ত্রে শিশুরা আপন ইচ্ছায় শেখে। সাম্রাজ্যবাদী শসনে সরকার গণশিক্ষা চায় না। গণতন্ত্রে শিক্ষা সার্বজনীন। পুঁজিবাদী শাসনে গতানুগতিক শিক্ষায় একটি দৃঢ়বদ্ধ পূর্ব নির্দিষ্ট শিক্ষা সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। গণতন্ত্রে শিক্ষা নমনীয়, বৈচিত্র্যপূণ্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গণতন্ত্রে শিক্ষা শুধু সার্বজনীন নয়, বাধ্যতামূলক, সকলের জন্য সমান, শিশুকেন্দ্রিক, মানবিক, লক্ষ্য স্পষ্ট চিন্তাকরা, স্পষ্ট কথা বলা নিজের মত স্পষ্ট করে লেখা, চরিত্র গঠন, বৌদ্ধিক ক্ষমতা অর্জন, সঠিক বিচারকরণ এবং গণতান্ত্রিক নাগরিকতা অর্জন।

শিক্ষার পদ্ধতি সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত কাজের মাধ্যমে স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এখানে ইতিবাচক শৃঙ্খলা। প্রকৃত গণতন্ত্রে বিদ্যালয়কে সরল, পবিত্র, সুসমন্বিত গণতান্ত্রিক সমান হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অবাধে বিকাশের সুযোগ পায়।

---

* Economic democracy means that economic power will be in the hands of the people as a whole, not in the hands of a few capitalist or of a particular class."—B.D. Bhatia.
* "Social democracy cannotes absence of all distinctions leased on cless, birth or possession of birth."
—B. D. Bhatia.
* "The aims and objectives of a true democractic ducation should be to develop habits attitudes, and qualities of character".— Secondary Education Commission (1952–53)

প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু, দার্শনিক, পথ প্রদর্শকের! তিনি সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক, অত্যাচারী শাসক নন। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত বাধাকে তিনি দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি শিশুকে জানতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর প্রবণতা ও চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন যাতে শিশুর সর্বাত্মক বিকাশ সম্ভব হয়। শিক্ষক নিজে মনাভাবে গণতান্ত্রিক হবেন এবং বাস্তবে গণতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করে দেখাবেন।

৫.৩ শিক্ষা ও মানবসেবা (Education and Humanity)

৫.৩.১ মানবসেবার প্রাচীন ধারণা (Ancient Concept)

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে তপোবনে গুরুর নিকটে বসে অধ্যায়ন করে উপনিষদের বাণী শুনত শিষ্যরা। উপনিষদের দর্শন শেখাল লোকালয় থেকে দূরে অরণ্যে প্রাকৃতিক কোলে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হলে ব্যক্তি আত্মসত্তার বিকাশ ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে নিরাকার পরম সত্ত্ব বা পরমসত্তাকে ছোঁয়া যায়। নির্জনে একাকী সত্যের সাধনায় মানবের নিজের কল্যাণই সাধিত হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্তবাদ ও মানবতাবাদে কোন বিরোধ থাকে না। মানবিক অন্তরশক্তির উন্নয়ন ও বিকাশেই অধ্যাত্মশক্তির উপলব্ধি সম্ভব। প্রাচীন শিক্ষাদর্শনও তপোবনে ধ্যান ও গভীর মননের সাহায্যে ব্যক্তির আত্মশক্তির বিকাশেই মানবকল্যাণ সাধিত হয় তা মনে করল। ধমেনর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'প্রতিটি বস্তুর গভীর অন্তরে যা ধরা আছে তা বাইরে প্রকাশিত হতে দেওয়া মানব ধর্ম। সেজন্য ধর্ম ও মানবতার প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষা এই মানবিকতার, মানবকল্যাণের কথা বলে। ভারতের মহান দার্শনিক তথা শিক্ষাবিদগণ যেভাবেই তাঁদের দর্শন চিন্তাকে ব্যাখ্যা করুন না কেন তাঁরা প্রত্যেকেই মানবিক স্বার্থে শিক্ষার কথা বলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানবত্ব অর্জনের কথা বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের কাছে মন্ত্র পেলেন 'জীবে দয়া নয় জীবে সেবা' তাই মানুষই ঈশ্বর, তার জন্য অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই, চাই আত্ম প্রত্যয়। সেজন্য বিবেকানন্দ ঘোষণা করেন নতুন ভারত গড়ে উঠবে অবহেলিত দরিদ্র, ক্লিষ্ট, পরাধীন শ্রমজীবী মানুষের হাত ধরে, সকলের জন্য সকলের মঙ্গল করে। গান্ধিজি বললেন, জ্ঞানযোগে ও কর্মযোগে আত্ম উন্নয়ন ও আত্ম উপলব্ধি ঘটিয়ে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে প্রকৃত সত্যে পৌছানো যায় এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়।

৫.৫.২ আধুনিক ধারণা (Modern Concept)

আধুনিক যুগে মনে করা হয় যে মানুষই নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান। বিজ্ঞান ও কারিগরি জগতে উন্নতির ফলে, প্রাকৃতিক শক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি অর্জনের ফলে মানুষের এই বিশ্বাস এসেছে যে মানব কল্যানের জন্য, মানুষের উন্নতি সাধনের জন্য, নিরাকার পরম সত্তার ওপর নির্ভর ব্যতিরেকে মানুষ নিজেই নিজের ক্ষমতায় বলীয়ান। এই বিশ্বাস হল বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ (Scientific

Humanisim) উদ্ভূত। মানবকল্যাণ সাধনা মানববর্জিত পরিবেশে ঈশ্বর আরাধনায় সম্ভব নয়। মানবকল্যাণ, সমাজ পরিবেশে নিজস্ব সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে, অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে করা সম্ভব।

একজন ব্যক্তি শৈশবে পিতা মাতা, ভাই বোন, আত্মীয়ের মধ্যে পরিবারে বড় হয়। তার সুখে দঃখে, মঙ্গলে অমঙ্গলে, বিভিন্ন কাজে তার চিন্তাভাবনা ধারণা পরিবারের থেকেই বিকশিত হয়। তারপর সে পাড়া প্রতিবেশী ও অন্যদলের সঙ্গে তার সঙ্গী সাথিদের সঙ্গে কাজ, ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে বড় হতে থাকে। নিজের চাহিদা ও অপরের চাহিদা কী তা বুঝতে শেখে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই নিজের ও দলের কল্যাণের মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে। এইভাবেই সে আরও বৃহত্তর দল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং নিজেও যে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এই সমাজ বন্ধনের অনুভূতি যদি অর্জন করে এবং সামাজিক দক্ষ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে তবে নিজের ও সমাজের উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।

জীবনের প্রাথমিক শর্ত তাই এককভাবে নয় সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেই মানবকল্যাণ সম্ভব। প্রাথমিক চিন্তা এই নয় যে কীভবে 'আমি' নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের মাধ্যমে কাল্পনিক সত্যের আরাধনা করব, চিন্তা হচ্ছে এই যে কীভাবে আমি বাঁচব এবং অন্যেরা কীভাবে আমাকে নিয়ে বাঁচবে। জীবনে বাঁচার ন্যূনতম প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ভালোবাসা, সহানুভূতি। এই প্রয়োজন গুলি অন্যের কাছ থেকে কীভাবে আমি মেটাব? অন্যেরাই বা আমার কাছ থেকে কী পাবে? সেজন্য মানবসেবা ও মানবকল্যাণ একক অনুভূতির বিষয় নয়। এগুলি একই সময়ে একই স্থানে বহুলোকের মধ্যে বাসের মাধ্যমে সকলের মিলিত অনুভূতি।

৫.৩.৩ মানবিকতার সমস্যা (Problems of Humanity) :

কোন দলের তথা ভারতের মানবিকতা সম্পর্কিত সমস্যা হচ্ছে ঃ

ক) কল্পনা বিলাসে একাকি বিকশিত হবার বদলে বাস্তব পরিবেশে বিকাশ।

খ) অন্য ব্যক্তি বা সমাজের সম্পর্কে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পর্ককে বোঝা।

গ) ব্যক্তি সমাজকল্যাণে যোগ্য অংশ নিতে পারে এরকম কাজের পরিকল্পনা করা।

ঘ) প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিকাশ।

ঙ) শিক্ষা ও চাকরির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন।

চ) সমাজের একজন হয়ে নিজেকে ভাবা সেজন্য আমাদের জীবন দর্শন হবে জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচা নয়, জীবনের বিভিন্ন কাজে নিজেকে আরও বেশি করে জড়িয়ে নেওয়া। আমাদের এই চিন্তা খুব প্রয়োজন যে আমাদের ব্যক্তিগত চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সঙ্গে সমাজের চাহিদা কিভাবে মেটানো যাবে। আমাদের নৈতিকতার বিকাশ ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন চিন্তার মধ্যে সম্ভব নয়, সম্ভব সার্বিকভাবে অনেকের নৈতিক ও বস্তুগত চাহিদা মেটে এরকম যৌথ কাজের মধ্য দিয়ে।

৪.৩.৫ মানবসেবার সমস্যা সমাধান শিক্ষা (Education for Humanity)

এই মানবসেবার সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন শিক্ষা ও স্বাধীনতা। জ্ঞানের মাধ্যমে আত্ম উন্নয়ন এবং কর্মের মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধিই এই শিক্ষা। এই শিক্ষা হবে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা। সমাজের উপকারে লাগে না

এরকম জ্ঞান বাঞ্ছনীয় নয়। এই শিক্ষা দিতে হবে অবাধ স্বাধীন পরিবেশে। লাজপতরাই বললেন, 'স্বাধীনতা কিনা কুশ আসে না' ('There is no happeness without freedom'), 'স্বাধীন হবার দিকে এগিয়ে যাওয়াই বিকাশ' ('Grown towards freedom is progress')। এই স্বাধীনতা হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যা আমরা ভারতবাসীরা পেয়েছি। আর স্বাধীন হতে হতে বাস্তব থেকে পালিয়ে বাঁচার ইচ্ছা থেকে। অরণ্যে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে একাকি ঈশ্বরোপলব্ধিতে প্রকৃত মানবসেবা সম্ভব নয়। এই মানব সেবায়েতই প্রকৃত সত্যে পৌঁছানো যায়। ড. রাধাকৃষ্ণান বলেছেন, 'There is no contradiction between seeing the truth in solitude and engaging in human affairs'।

'তাই শিক্ষার প্রকৃতি হবে তত্ত্ব ও বাস্তবের সমন্বয় ভিত্তিক। এই শিক্ষা মানবকল্যাণে কাজে লাগে এরকম কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হবে। শিক্ষা হবে সকলের সমান অধিকার, শিক্ষার্থীর সামর্থ্য প্রবণতা, আগ্রহ ভিত্তিক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি অনুযায়ী বৈষম্য করা চলবে না। সর্বশ্রেণীর জন্য মুক্ত থাকবে। গ্রামে শহরে বৈষম্য চলবে না। শিক্ষা হবে মূলত কর্মভিত্তিক হাতে কলমে শিক্ষা। এই শিক্ষা হতে সমাজের প্রয়োজন ভিত্তিক। নাগরিকতা অর্জনের শিল্প। মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। কারিগরি ও বিজ্ঞান শিখতে হবে মানুষের প্রয়োজনে লাগাবার জন্য। উৎপাদন ও মানবশক্তিকে পরস্পর সম্পর্কিত করতে হবে। বিদ্যালয় হবে পবিত্র, সুষম, গণতান্ত্রিক, নাগরিক সমাজ। স্বাভাবিক সমাজ পরিবেশে উৎপাদনী কর্ম ও সহযোগিতামূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শিখবে। শিক্ষক সুষ্ঠু সমাজ পরিবেশ তৈরি করে দেবেন। সামাজিক জ্ঞানে গুণসম্পন্ন হবেন। ছাত্রদের দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক হয়ে প্রয়োজনে পরামর্শ দেবেন। 'সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বা মানব উন্নয়নে সঞ্চালিত করা প্রয়োজন তাও লেখাবেন। তাই শিক্ষা হবে প্রয়োজনভিত্তিক বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং কর্মমূলক।

৫.৪ শিক্ষায় আন্তর্জাতিকতাবোধ (Intrnationalism in Education)

৫.৪.১ আন্তর্জাতিকতাবোধ বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার অর্থ (Meaning of Internationalism or International Understanding)

লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, বিজ্ঞানের আর্শীবাদে জড়জগতের যতটুকু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে তত পরিবর্তন আসেনি। সংকীর্ণ অন্ধ জাতীয়তাবোধের কবলে পড়ে মানুষের মন অনেক ক্ষেত্রেই আদিম স্বার্থ, হিংসা ও বিদ্ধেষে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই দেখি শোষণ ও হস্তক্ষেপের প্রয়াস, ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক অনুদারতা, জাতি ও কৃষ্টিগত দ্বন্দ্ব, সাম্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদে দ্বন্দ্ব, ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব এবং বিশ্বে ভ্রাতৃত্ববোধের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।*

* "Nationalism is most dangerous vice of our time for more dangerous than drunkennes or commercial dis homesty or any of other vice, against which conentional moral education is directed ... owing to nationalism the continuance of civiized life is in jeopardy".—Berterand Rursell (Education and socid order)

মানব সভ্যতার এই দুর্দিনে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের প্রশ্ন তাই মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে তাই যথাযথ মন্তব্য করা হয়েছে, "There is no more dangerous maxim in the world of to day than 'My country, right or wrong & the whole world is now so intimately interconnected that no nation can or dare lie along and the development of a sens of world citizenship has become just as important as that of national citizenship."

এই কমিটি আরও মন্তব্য করেছে যে, প্রকৃত অর্থে তাই দেশপ্রেমই যথেষ্ট নয়— এর পরিপূরক হিসাবে প্রত্যেক দেশবাসীর মনে এক জীবন্ত উপলব্ধি জাগিয়ে তুলতে হবে যে, প্রত্যেকেই এক বিশ্বের সদস্য এবং সেই অনুভূতি অনুযায়ীই প্রত্যেকে যাতে মানসিক ও আবেগমূলক দিক থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারে তা দেখতে হবে। আজকের সভ্যতার সংকটে এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তোলার একমাত্র উপায় হচ্ছে সুশিক্ষা। এখন আমরা দেখি আন্তর্জাতিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধের মানে কী? এ সম্পর্কে অলিভার গোল্ড স্মিথ (Oliver Goldsmits) বলেন, "Internationalism is a teaching that the individual is not only a member of his state, but a citizen of the world"। আন্তর্জাতিক একটি অনুভূতি যা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে যেমন ভাবায়, তেমনি বিশ্বনাগরিক হিসাবে ভাবাতে পারে। ঠিক এই ভাবধারার প্রতিধ্বনি হিসাবে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সম্পর্কে ড. ওয়াল্টার এইচ. সি. লেভস (Dr. Walter H.C. Laves)-এর উক্তি প্রাণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "International Understanding is the ability to observe critically and objectively and appraise the conduct of men everywhere to each other, irrespection of the nationalityor culture to which they belong."। অর্থাৎ, দেশ ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানুষ পরস্পরের আচার-আচরণকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশংসা বা সমালোচনা করতে পারে, আর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার ক্ষমতাই হল আন্তর্জাতিকতাবোধ। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "If human race is to survive we have to subordinate national pride to international feeling". অর্থাৎ, মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখতে বিশ্বজনীন সৌহার্দ্যের চিন্তাভাবনাকে উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

৫.৪.২ আন্তর্জাতিক বোধে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education with reference to Internationalism)

আধুনিক পৃথিবীর সমস্যাবলি শিক্ষাবিদদের সামনে প্রতিবিধানের গুরুদায়িত্ব নিয়ে এসেছে। শিক্ষাকে বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের অনুকূলে পুনর্গঠিত করতে না পারলে 'মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য' নিম্ন উপায় অবলম্বন করলে এই ধ্বংস রোধ করা যেতে পারে।

শিক্ষায় যুযুৎসা প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ঃ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির একটি হল যুযুৎসা প্রবৃত্তি। শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গঠনমূলক করে তোলা যায়। যুগে বিবর্তনে মানুষ আদিম

পশু প্রবৃত্তি ত্যাগ করে সমাজ জীবনের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। মানুষের এই ঐতিহাসিক পরিক্রমায় শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। তাই যুযুৎসা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে সংগঠনমুখী করে তুলতে হবে। সুসমন্বিত ও প্রয়োজন ভিত্তিক পাঠক্রম ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে সুসমন্বিত ও প্রয়োজন ভিত্তিক পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাধ্যমে মানব সম্পদের বিকাশ এবং সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগানো সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, তাদের জনগণ, তাদের জনপ্রণালী, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, নানা ক্ষেত্রে সমস্যা ও প্রগতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য শিক্ষার্থীদের জানতে দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের ছাত্রদের বয়স ও শিক্ষাস্তর বিবেচনা করে পাঠক্রমে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদির পাঠ সন্নিবেশিত করে ভিনদেশি মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে তাদেরকে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বিষয়ে সচেতন করে তোলা সহজ।

ভূগোলের ভূমিকা ঃ আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করতে পাঠক্রমে ভূগোলের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ম্যাপ ও গ্লোব নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ভূগোল অনুশীলন করতে পারে তার সুযোগ রাখতে হবে। এতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বে নানা দেশের অবস্থান, পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করবে এবং কিভাবে দেশগুলির যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয়েছে তা সহজে অনুধাবন করবে। বিদ্যালয় স্তরে ভূগোলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা ব্যবসা বানিজ্য, শিল্প উৎপাদন, যাতায়াত ও যোগাযোগ ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলি যে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল তা জানতে পারে।

ইতিহাস কেন পড়ব ? ঃ ইতিহাসই হল বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার। এই জ্ঞানভাণ্ডার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাছে পারস্পরিক পরিচয় প্রদান করে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মানবজাতির সমৃদ্ধি ও প্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিটি জাতিরই কম বেশি অবদান থাকে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সকলের ইচ্ছাই সমান। জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া ও মানবিক সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করে তোলাই ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা হওয়া বিধেয়। ইতিহাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই চেতনায় উদ্ভূত করা দরকার যে, মানব সভ্যতার আধুনিক অবস্থা একটি দেশ বা একটি জাতির চেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। এই উন্নত সভ্যতা যুগ যুগ ধরে বিশ্বের ছোট বড়, অগ্রসর অনগ্রসর সকল দেশ ও জাতির অবদানের ফল।

পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা ঃ এই বিষয়টির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ দেশের সঙ্গে ভিনদেশের রাজনৈতিক ও পৌর প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে। এই বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সম্মিলিত জাতি পুঞ্জ (UNO), ইউনেস্কো (UNESCO), ইউনিসেফ (UNICEF) ইত্যাদি বিশ্বসংস্থা সম্পর্কে জানতে পারে এবং এই সব সংস্থার উদ্দেশ্য, সংগঠন এবং কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তর্জাতিকতাবোধ সম্পর্কে ধারণা হতে থাকে।

বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা ঃ বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের অবদান এবং সে সবের প্রয়োগ সম্পর্কে লব্ধজ্ঞান বিশ্বচেতনা সঞ্চারের পরম সহায়ক। বিজ্ঞান ও গণিতের ভাষা ও প্রতীকগুলি। (Symbols)

নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ভূষিত। তাই এসব বিষয় অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার (Logical thinking) সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি (Scientific attitude) সৃষ্টি হয়।

ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা ঃ বিশ্বের মহাকাব্য ও সাহিত্যগুলিতে রয়েছে মানবিক নানা উপাদান—সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জয়-পরাজয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যা সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্পদ। ভাষা ও চিন্তাধারা ইত্যাদির বাহন যা বিশ্বমানবতাবোধ, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বচেতনা বিকাশের পরম সহায়ক।

অন্যান্য বিষয় ঃ শিক্ষালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় যেমন— অর্থনীতি, নৃেতত্ত্ব, নানাস্তরের শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে শিল্পকলা বা শিল্পকর্ম বিশ্বজনীন আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়।

শিক্ষকের ভূমিকা ঃ আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানসিক কাঠামোকে যথাযথভাবে তৈরি করতে পারেন শিক্ষক। এজন্য তাঁকে হতে হবে কল্পনাপ্রবণ এবং নতুন উপায় উদ্ভাবনে নিপুণ যেন তিনি বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিকতাবোধ সহপাঠক্রমমূলক কার্যাবলি সংগঠিত করতে পারেন। আন্তর্জাতিকতাবোধ সঞ্চারের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে শিক্ষক অভিনয়, বিতর্কসভা, আলোচনা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন। এইভাবেই শিক্ষার্থীদের মানসিকস্তরে তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষকের এই সম্পর্কে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব। এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে সার্থক শিক্ষণ নেওয়া দরকার। এজন্য জাতীয় শিক্ষা-নীতিতে বিশ্বজনীন শিক্ষাদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আর বিশ্বশান্তির বাতাবরণের মধ্যেই এই প্রার্থিত বিশ্বজনীন ঠিকাদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে।*

অনুশীলনী ঃ—

১। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শৃঙ্খলার ধারণা ব্যাখ্যা করো।

২। গণতন্ত্রের অর্থ কী? শিক্ষাকে আদর্শ গণতান্ত্রিক করে কীভাবে গড়ে তোলা যায়?

৩। মানবসেবায় (Himanity) প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা বিবৃত কর। শিক্ষাকে কিভাবে মানবসেবার কাজে লাগান যায়?

৪। আন্তর্জাতিকতাবোধ বলতে কী বোঝ? আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা বর্ণনা করো।

৫। সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো ঃ

(ক) শৃঙ্খলা ও শাসন।

(খ) স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা।

---

* " We need a cosmopolitan education which will produce a loyalty to world citizenship, an international understanding and which will engender and foster love, not of the country alone but of the humanity. Such a system of education implies education for peace, for internationalism as an ideal can flowish only is peace."
—B.D. Bhatia.

(গ) আদর্শ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) গণতন্ত্র ও শিক্ষা।

(ঙ) শিক্ষা ও মানবসেবা।

(চ) আন্তর্জাতিকতা বোধ।

৬। সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

(ক) কার উক্তি?

"আন্তর্জাতিকতা একটি অনুভূতি যা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যেমন ভাবায়, তেমনি বিশ্বনাগরিক হিসাবে ভাবাতে পারে।" — আলিভার গোল্ড স্মিথ, রাধাকৃষ্ণাণ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজি।

(খ) কার উক্তি?

"মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখতে জাতীয় অহংকারকে বিশ্বজনীন সৌহার্দ্যের চিন্তাভাবনার অধীনে স্থান দিতে হবে।" — রাধাকৃষ্ণাণ, গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ।

REFERENCES :

সে সব বই-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

Indian Philosophy - A popular Introduction - Debi prasad Chattopahdyay.

Contemporary Indian Philosophy - Basant Kr. Lal.

Ancient Indian Education - R. K. Mukherjee.

Building a Philosophics of Education - Broudy.

Modern Philosophy of Education - Brubacher.

A Modern Philosophy of Education - Sir G. Thompson

An Introduction to Philosophy of Education - D.J.O. Conner

Philosophy and Principles of Education — Archana Bandyopadhyay

Modern Education (Its aims & principles) - J. C. Chakraborty.

Education and contemporary society - H. L. Elvin.

Education (Some problems and principles) - Sachibhusan Ghosh.

Educational Though and Practice - V. R. Taneja.

Principles and Methods of Education - J. S. Walia.

Education : Its data and firt principles I. P. Nunn.

The Education of whole man - Ralph Barsodi.

The problems of National Education in India - Lajpat Rai.

The Faith of an Educationist - K. G. Saiyidain.

Some Great Educators of the world - K. K. Mukherjee.

The doctrines of Great Educations - R. Rusk.

The life of Vivekananda and The Univesal Gospel - Romain Rolland.

Mahatma Gandhi - Romain Rolland.

Basic Education : A Fresh Look (NCERT)

শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি —অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষা প্রসঙ্গ — স্বামী বিবেকানন্দ।

একক ৬ ❑ বৈদিক যুগ এবং বেদ পরবর্তী যুগ বা ব্রাহ্মণ্য যুগ

গঠন ঃ

৬.১ সূচনা

৬.২ বৈদিক যুগের শিক্ষা

৬.২.১ বৈদিক যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য

৬.২.৩ বৈদিক যুগের পাঠক্রম

৬.২.৪ বৈদিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতি

৬.২.৫ বৈদিক যুগের শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক

৬.২.৬ বৈদিক যুগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

৬.২.৭ বৈদিক যুগের নারীশিক্ষা

৬.৩ বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি

৬.৪ বৈদিক পরবর্তী যুগের শিক্ষা উপনিষদের যুগ

৬.৪.১ আরণ্যক

৬.৪.২ উপনিষদ

৬.৪.৩ উপনিষদের মূলবাণী

৬.৪.৪ শিক্ষার লক্ষ্য

৬.৪.৫ গুরুর স্থান

৬.৪.৬ পাঠ গ্রহণের স্থিতিকাল

৬.৪.৭ পাঠদান পদ্ধতি

৬.৫ বৈদিক পরবর্তী যুগের শাখা

৬.৫.১ চরণ

৬.৫.২ পরিষদ

৬.৫.৩ গোত্র অথবা কুল

৬.৫.৪ শিক্ষায় জাতিভেদ

৬.৫.৫ পাঠক্রম

৬.৫.৬ শিক্ষার্থীদের দৈনিক সময়সূচি ও কৃত্যাদি

৬.৫.৭ ব্যবহারিক শিক্ষা

৬.৫.৮ মানসিক শিক্ষা

৬.৫.৯ নৈতিক শিক্ষা

৬.৫.১০ নারী শিক্ষা

৬.৬ সমাবর্তন

৬.৭ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক

৬.৮ ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষা
৬.৮.১ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য
৬.৮.২ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পাঠ্যক্রম
৬.৮.৩ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার শিক্ষাদান পদ্ধতি
৬.৮.৪ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সময়কাল
৬.৮.৫ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শৃঙ্খলা
৬.৮.৬ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক
৬.৮.৭ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৬.৮.৮ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি
৬.৮.৯ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার অবদান
৬.৯ প্রশ্নাবলী

৬.১ সূচনা ঃ

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কিছু আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গিরিপথ দিয়ে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। আর্যদের আগেও ভারতে ছিল আদিম অধিবাসী ও দ্রাবিড় জাতির বাস। বহিরাগত আর্যদের কাছে আদিম অধিবাসী বা অনার্যরা পরাজিত হলেও প্রাচীন অনার্য সংস্কৃতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। প্রাচীন ভারতের জাতীয় চরিত্র আর্য ও অনার্য উভয়েরই বৈশিষ্ট্য দিয়ে রচিত হয়েছিল। গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চলে স্থায়ী বাসভূমি গড়ে বৈদিক ভারতবাসী সুযোগ পেয়েছিল সে যুগের জ্ঞান সাধনাকে অনুশীলন করার। এরই ফলে গড়ে উঠেছিল বেদ, উপনিষদ ও দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি।

৬.২ বৈদিক যুগের শিক্ষা ঃ

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়কালকে বৈদিক যুগ হিসাবে ধরা হয়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে কয়েকটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন—বৈদিক যুগ, বেদ পরবর্তী যুগ এবং সূত্র সাহিত্যের যুগ (এটির আলোচনা এখানে করা হবে না)।

৬.২.১ বৈদিক যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

- বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরম ব্রহ্মের উপলব্ধিই ছিল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মনে করা হত তপস্যার মাধ্যমে পরম সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। সুতরাং ভক্তি ও ধর্মীয় ভাবের প্রেরণা সৃষ্টি করা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মূলত ধর্মতত্ত্বকে ভিত্তি করেই যাবতীয় শিক্ষাচিন্তা গড়ে উঠেছিল। আর জীবনের অন্তিম লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ ও মুক্তি।*

* "Learning in India through the age had been prized and pursued not for its own sake, but for the sake and as a part, of religion. It was sought as the means of salvation or self-realization, as the means of highest end of life, viz., Mukti or Emancipation."—*R. K. Mukherjee (Ancient Indian Education)*

- চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ—অরণ্য প্রকৃতির উন্মুক্ত ক্রোড়ে কঠিন ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে শিক্ষা পরিচালিত হত। সরল জীবনযাপনের অভ্যাস ও অনুশীলনকে তাই প্রাধান্য দেওয়া হত গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থায়।
- ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন—ছাত্রদের আত্মসম্মানবোধ, আত্মোপলব্ধি, আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযমের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত, প্রশংসা করা হত।
- সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্যের চর্চা—ছাত্রদের সৌন্দর্য জ্ঞান বৃদ্ধির শিক্ষা, গুরুগৃহ পরিত্যাগের পর সংসার জীবনের প্রস্তুতির শিক্ষা, পরিবার ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা, গৃহপালিত পশুপাখিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন প্রভৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রক্ষণ ও বিস্তার—আর্য সম্প্রদায় বৈদিক সাহিত্য রক্ষণে বাধ্য ছিলেন। প্রত্যেক আর্যকে বেদের কিছু না কিছু অংশ অধ্যয়ন করতে হত। সমগ্র বেদ পুরোহিত সম্প্রদায় মুখস্থ করে রাখতেন এবং সেগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঞ্চালন করা ছিল বাধ্যতামূলক।

৬.২.৩ বৈদিক যুগের পাঠক্রম ঃ

বৈদিক যুগে পাঠক্রম ছিল শুধুমাত্র বেদাধ্যয়ন। বেদ-এর আবৃত্তিই ছিল একমাত্র শিক্ষা। নির্ভুল যতি, মাত্রা ও ছন্দের সাহায্যে বেদ-অধ্যয়ন শেখানো হত। বেদে সাতপ্রকার ছন্দ প্রচলিত ছিল। শুধু আবৃত্তি নয়, এর সঙ্গে চিন্তন ও মননশীলতার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হত। আবৃত্তিতে সঠিক উচ্চারণের উপর জোর দেওয়া হত। বৈদিক মন্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দ ও ভাষার উপলব্ধি ছিল বাধ্যতামূলক। তবে বৈদিক যুগের পাঠক্রমে শুধু যে ধর্মতত্ত্বই শিক্ষা দেওয়া হত তা নয়। সাধারণভাবে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬.২.৪ বৈদিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতি ঃ

শিক্ষাদানের প্রথম পর্যায়ে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করা হত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছাত্রদের সমষ্টিগত শ্রেণি থেকে পৃথক করে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। নিঃশব্দ ও নিঃসঙ্গ যোগ তপস্যার সাহায্যে প্রত্যেকেরই আত্মার উন্নতি সাধন করতে হত। মানসিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে ছাত্রদের নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হত। উচ্চ শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণ সংঘে যোগ দিত। ব্রাহ্মণ সংঘে উচ্চ স্তরের ছাত্ররা যোগ দিত। আলোচনা সভা ও সংস্কৃতি পরিষদ এর দ্বারা তাদের জ্ঞানের পরীক্ষা হত।

এছাড়াও ছাত্রদের প্রতিদিন নানা আধ্যাত্মিক নিয়মশৃঙ্খলার মেনে চলতে হত যেমন অগ্নিকে স্মরণ ও আহুতি দান, ইন্দ্রিয় দমন, কঠোর সংযম, পবিত্র ও ত্যাগপূর্ণ জীবনযাপন করা এবং গুরুকে যথাসাধ্য উপহারদানে সন্তুষ্ট রাখা।

৬.২.৫ বৈদিক যুগের শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ঃ

গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর ও আন্তরিকপূর্ণ। ছাত্ররা তাদের শিক্ষককে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন।

৬.২.৬ বৈদিক যুগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঃ

বৈদিক ভারতের মৌলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল গুরুকুল। প্রতিটি গুরুকুলের পৃথক অস্তিত্ব থাকলেও সর্বোচ্চ জ্ঞান প্রচারের কেন্দ্র ছিল ব্রাহ্মণ সংঘ। বিভিন্ন গুরুকুলের ছাত্ররা সমাবিষ্ট হয়ে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের অবদান আলোচনা করতেন। আশ্রম-বালক রূপে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য তপোবনে সমাগত হতেন ছাত্রদল। একটি পূর্ণাঙ্গ আশ্রমে থাকত বিভিন্ন বিভাগ

যেমন—অগ্নিস্থান, ব্রহ্মস্থান, বিষ্ণুস্থান, মহেন্দ্রস্থান, সোমস্থান, গড়ুরস্থান, কার্তিকেয়স্থান ইত্যাদি। নৈমিষারণ্যে কুলপতি সনকের আশ্রমে ছিল দশ হাজার ছাত্রের এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই আশ্রমই বৈদিক ভারতে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে।

বৈদিক ভারতে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল পরিষদ। এর সহজ অর্থ সমবেত উপবেশন। এখানে অগ্রসর ছাত্রদের জ্ঞানের স্পৃহা কিছুটা পূরণ হত। পাঞ্চাল পরিষদ এ যুগের একটি খ্যাতনামা পরিষদ।

৬.২.৭ বৈদিক যুগের নারীশিক্ষা ঃ

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন সম্প্রদায়ের নারীদের বেদাধ্যায়নের পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁরা অনেকেই অধ্যাপনার কাজ করতেন। এই যুগের বিদূষী নারীদের মধ্যে বিশ্ববারা, রোমশা, লোপামুদ্রা, কাক্ষীবতী, ঘোষালা, অপালা, মমতা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।*

৬.৩ বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি ঃ

- বেদই ছিল শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু।
- বিষয়গত উন্নতির চেয়ে আত্মিক উন্নতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হোত।
- শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।
- গুরুগৃহে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনকে সুদৃঢ় করা হোত।
- ব্রহ্মচর্য ছিল বাধ্যতামূলক।
- শিক্ষা ছিল অবৈতনিক।
- শিক্ষকরা ছিলেন প্রজ্ঞাবান এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো।
- ব্যক্তিগত শিক্ষালাভের সুযোগ ও ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের ব্যবস্থা করা হত।
- দর্শন, ব্যাকরণ, ধর্ম ও সংস্কৃতি, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি ছিল অধ্যয়নের বিষয়।
- সমাজে নারীদের মর্যাদাদান এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ প্রদান।

৬.৪ বৈদিক পরবর্তী যুগের শিক্ষা উপনিষদের যুগ ঃ

"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has bean the solace of my life it will be the solace of my death."—Sohopenhaner

বৈদিক পরবর্তী যুগ বলতে সাধারণত খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত কাল অর্থাৎ ঋকবেদ যুগের সমাপ্তি কাল থেকে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের সূচনা কাল পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এই ব্যাপ্তিকালকে নিখুঁতভাবে

* এই প্রসঙ্গে Altekar উল্লেখ করেছেন যে—"Home, of course, was the main centre of the education of girls in the domestic science."

সময়কালে ধরা যাবে না। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ এবং হোমের একটি বিশেষ স্থান ছিল। পরবর্তী কালে এই যাগযজ্ঞ প্রাধান্য লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ এই সব অনুষ্ঠান সম্পাদনকারী হিসাবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ধরন অনুসারে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ হোত্রী, উদ্‌গাতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণি হিসাবে সমাজে পরিগণিত হয়েছিলেন।

বৈদিক যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল — যা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তিলাভ। বৈদিক পরবর্তীকালেও একই লক্ষ্য শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত হল এবং এই উপনিষদের যুগে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান সমূহের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হল। এর ফলে আধ্যাত্মিক ধ্যানযোগের অনুশীলনের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকল। অপর দিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হল যেমন পদার্থবিজ্ঞান, হাতের কাজ, জ্যামিতি, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। পাশাপাশি শারীর-স্থান-বিদ্যা শিক্ষা শুরু হল। বেদির (যজ্ঞবেদি) আয়তন, আকৃতি, পরিমাণ — তার স্থান কাল ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। এই বৈদিক পরবর্তী যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণসমূহ, আরণ্যকসমূহ এবং উপনিষদ সমূহের ব্যাপক চর্চা শুরু হল। এই সমস্ত কর্ম প্রয়াসের অনুসন্ধানের দ্বারা আমরা এই বৈদিক পরবর্তী উপনিষদ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামোটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

৬.৪.১ আরণ্যক ঃ

আরণ্যক গ্রন্থসমূহ হল ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট। এই আরণ্যকগুলি রচিত হয়েছিল অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীদের জন্য যাঁরা নির্জনে বসবাস করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য তপস্যা করে যাবেন।

৬.৪.২ উপনিষদ ঃ

উপনিষদে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ শিরোবিন্দুতে পৌঁছেছিল। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা একটি কল্পনাতীত স্তরে পৌঁছায়। তাই পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সোপেনহাওয়ার থেকে আরম্ভ করে ম্যাক্সমুলার, ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি দার্শনিকগণ উপনিষদের ব্যাখ্যা ও অনুশীলন করে এর আশ্চর্য দার্শনিক চিন্তাসমূহের দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই ধরনের জ্ঞানের উপলব্ধি অন্য কোন চিন্তাশাস্ত্রে দেখা যায় নি। এ জন্য Paul Denson তাঁর "Philosophy of the Upanishads" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "Philosophical conceptions unequalled in India or perhaps any where in the world."

৬.৪.৩ উপনিষদের মূলবাণী ঃ

উপনিষদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা থাকলেও এর মূল কথা হল আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা পরম ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি। সুতরাং পরম ব্রহ্মের ধারণা লাভ করাই হল উপনিষদের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য। 'উপনিষদ' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'নিকটে এসে বসা' অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক অন্যান্য পাঠ সমাপন করে শিষ্য গুরুর কাছে এসে বসবে এবং পরম গোপনীয় অন্তর্নিহিত জ্ঞান গুরুর কাছ থেকে লাভ করবে। সেই জ্ঞান অবশ্যই ব্রহ্মকে জানা, তার স্বরূপ উপলব্ধি এবং তা হলেই সে মোক্ষলাভের উপায় খুঁজে পাবে।

৬.৪.৪ শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

উপনিষদের মূল মন্ত্র হল — সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। এই মন্ত্রের অর্থ হল শিক্ষার মাধ্যমেই পরম জ্ঞানের উপলব্ধি হতে পারে। আর এই পরম জ্ঞান হল অসীম অনন্ত অব্যক্ত সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি।

৬.৪.৫ গুরুর স্থান ঃ

উপনিষদের শিক্ষায় গুরুর একটি উচ্চ স্থান রয়েছে। গুরু শিষ্যকে আত্মশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করবেন। গুরুর পদপ্রান্তে শিষ্য তার নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করবে এবং পরম জ্ঞানী গুরুদেবের বাণী মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে। তিনিই পরম গুরু যিনি পরমজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেছেন। সমগ্র বেদ যাঁর কণ্ঠস্থ। যিনি ব্রহ্মের একান্ত উপাসক এবং স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানী। আর এই গুণের জন্যই তিনি শিষ্যের কাছে পথপ্রদর্শক, নেতাস্বরূপ এবং সমাজের উচ্চাসন লাভ করার অধিকারী হয়েছেন।

৬.৪.৬ পাঠ গ্রহণের স্থিতিকাল ঃ

বৈদিক যুগের শিক্ষার চেয়ে উপনিষদের যুগের শিক্ষায় যদিও পাঠ্য বিষয় অনেক বেড়েছে তবুও পাঠ গ্রহণের সময়সীমা একই প্রকার থেকেছে অর্থাৎ মোট ১২ বছরই হল পাঠ গ্রহণের স্থিতিকাল। উল্লেখ আছে, শ্বেতকেতু ও সত্যকাম ১২ বছর ধরে গুরুর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছিল।

৬.৪.৭ পাঠদান পদ্ধতি ঃ

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যামন — এই তিনটি সোপান হল পাঠদান ও পাঠগ্রহণের পদ্ধতি। সমস্ত পাঠদানই হত মৌলিক এবং শিষ্য তা শ্রুতিতে নিবদ্ধ রেখে আবৃত্তির মাধ্যমে অনুশীলন করে আত্মস্থ করত। সমস্ত পাঠ্য বিষয়টি শিষ্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করত এবং ধ্যানযোগের মাধ্যমে তা চিরস্থায়ী শিক্ষণ হিসাবে গৃহীত হত। বৈদিক পরবর্তী যুগের এই আত্মধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞানলাভের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ আছে যে পুত্র ভৃগু ব্রহ্ম পিতার কাছ থেকে এই পরম জ্ঞান লাভ করার পর চারবার এই ধ্যান যোগ অনুশীলন করে অনন্ত ব্রহ্মের অনুভূতি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই পদ্ধতি ছাড়াও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যেও শিক্ষাদান করা হত। প্রকৃতপক্ষে এই উপনিষদের শিক্ষাযুগে এই পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল। কেনোপনিষদে আছে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করছে কোন সেই শক্তি যে শক্তির সাহায্যে হৃদয়, আত্মা এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে? —এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। গুরু শিষ্যের এই প্রশ্ন ও উত্তরদান এমনই একটি পাঠানুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করত যে পাঠ্য বিষয়ে শিষ্যের মনঃসংযোগ আপনা আপনিই হয়ে যেত যে কোনোরূপ গুরু কর্তৃক ভর্ৎসনা, শাস্তিদানের আশঙ্কা বা শিষ্যের মনোবিদোনন ঘটতো না — এটিই হল আদর্শ শিক্ষাদান পদ্ধতি যা আধুনিককালের শিক্ষাবিদরাও স্বীকার করবেন।

৬.৫ বৈদিক পরবর্তী যুগের শাখা ঃ

বেদসমূহকে অবলম্বন করে অনেকগুলি শাখা সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদিক মন্ত্রগুলির উচ্চারণ ও তার ব্যাখ্যার বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছিল। গুরুকুল অর্থাৎ শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বিশেষ কোন শাখার পরিচিতি বহন করতো। মন্ত্রগুলির আদর্শ উচ্চারণ রীতি কোনও কোনও অঞ্চলে পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হত না। তাছাড়া নতুন নতুন শ্লোক বা মন্ত্র রচিত হয়ে তা বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হত। বলা বাহুল্য, বেদ একান্তভাবে মৌখিক এবং স্মৃতি নির্ভর হওয়ায় এর ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তরকে অবলম্বন করে নানান শাখার উদ্ভব হয়েছিল।

৬.৫.১ চরণ ঃ

সাধারণভাবে শাখা এবং চরণ সমার্থক। তবে চরণ বলতে পাণিনির মতে একটি শিষ্যগোষ্ঠিকে বোঝায় যারা বিশেষ কোন একটি শাখার অধীনে পাঠ গ্রহণ করেছে।

৬.৫.২ পরিষদ ঃ

উপনিষদে পরিষদ বলতে বিদ্বান ব্যক্তিদের পরামর্শ সভাকে বোঝায়। পরবর্তীকালে যে সমস্ত অঞ্চলে অধিক সংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন সেই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে পরিষদ নামে অভিহিত করা হত। এই পরিষদের ধারণাটির সঙ্গে বর্তমানকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক সম্মেলনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ রামকৃষ্ণ [illegible], "We may say in modern phraseology that a 'Parishad' corresponds to a University comprising student belonging to different Colleges Called Charans." (Ancient Indian Education)

৬.৫.৩ গোত্র অথবা কুল ঃ

পারিবারিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গোত্র অথবা কুলের উদ্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন গোত্র এবং কুলগুলি বিশেষ বিশেষ ঋষিকে তাদের পূর্বপুরুষ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সম্প্রদায় এইভাবে কোন কোন ঋষিকে তাদের নিজ নিজ পূর্বপুরুষ হিসাবে ধরে নিয়েছিল। বর্তমানকালেও বিবাহের ক্ষেত্রে সমাজে এই গোত্র বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যে সমস্ত মুনি-ঋষিদের নামে গোত্রগুলির উদ্ভব হয়েছিল সেই সকল মুনি ঋষিরা হলেন — যামদগ্নি, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, অগস্ত্য এবং শান্ডিল্য। এঁদের আবার নানা বিভাগ এবং উপবিভাগ রয়েছে। ছোট ছোট উপবিভাগগুলি এক-একটি পরিবারে সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে গেছে।

৬.৫.৪ শিক্ষায় জাতিভেদ ঃ

বৈদিক যুগে বৃত্তিকে ভিত্তি করে জাতিপ্রথা (Caste System) গড়ে উঠেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ওই নীতি অনুসরণ না করে বংশধারাকে ভিত্তি করে নানা ধরনের সামাজিক দল গড়ে উঠল। ফলে এই ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণির জাতি বৈশ্য এবং শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদা আরও নিম্নগামী হল। কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত বিরাট সংখ্যক বৈশ্যগণ কালক্রমে কর্মকার, স্বর্ণকার, রথ নির্মাণকার প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করতে থাকল। আর বলা বাহুল্য, শূদ্র সম্প্রদায় সমস্ত মান মর্যাদা হারিয়ে অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হল।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে এই জাত ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা গেল। অবশ্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের কেউ কেউ শিক্ষার অধিকার লাভ করেছিল। জনকরাজা, কাশীর রাজা অজাতশত্রু প্রভৃতি কিছু কিছু ক্ষত্রিয় মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ আচার্যদের স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। সে যাই হোক, এ কথা বলা যায় যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির জাতির শিক্ষা দানের বিশেষ কোনও স্বীকৃত ব্যবস্থা ছিল না।

৬.৫.৫ পাঠ্যক্রম ঃ

ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমার সংবাদ এই যুগের পাঠ্যক্রমের উপর আলোকপাত করেছে। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল — চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বৈদিক ব্যাকরণ, কল্প, গণিত, দৈবজ্ঞান, বিধিশাস্ত্র, অধ্যাত্মবিদ্যা, ছাত্রবিদ্যা,

জ্যোতির্বিজ্ঞান, সর্পবিদ্যা, নৃত্য, গীত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্কের কথোপকথনেও উপনিষদসহ বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের উল্লেখ আছে।

৬.৫.৬ শিক্ষার্থীদের দৈনিক সময়সূচি ও কৃত্যাদি ঃ

উপনিষদে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক কর্ম-কর্তব্যের বর্ণনা আছে। আশ্রমে থাকা সকল শিক্ষার্থীদের ব্রয়চর্য পালন আবশ্যিক। তিন প্রকার শিক্ষার এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল — ব্যবহারিক (Practical), মানসিক (Mental) এবং নৈতিক (Moral) শিক্ষা।

৬.৫.৭ ব্যবহারিক শিক্ষা ঃ

(১) ভিক্ষা করা, (২) যজ্ঞাগ্নি সর্বদা প্রজ্জ্বলিত কথা, (৩) আশ্রমের পশুপালন, (৪) কৃষিকার্য — এইগুলি অবশ্য পালনীয় ব্যবহারিক শিক্ষা।

৬.৫.৮ মানসিক শিক্ষা ঃ

শ্রবণ (কানে কানে), মনন (ধ্যান করা), নিদিধ্যামন (উপলব্ধি করা) এই তিন উপায়ে মানসিক শিক্ষালাভ হত। ওই তেরো আরণ্যকে উল্লেখ আছে যে, গুরু যখন মহাব্রত পাঠ দান করবেন তখন শিষ্য কখনই দাঁড়িয়ে থেকে বা পদচারণা করে বা আরাম কেদারায় বসে পাঠ গ্রহণ করবে না। তাকে কুশাসনে গুরুদেবের সমীপে বসে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। এই মানসিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে স্বয়ং পাঠে (Self Study) নিয়োজিত করা।

৬.৫.৯ নৈতিক শিক্ষা ঃ

নৈতিক শিক্ষা মানে সদাচরণ করা, চরিত্র গঠন করা, সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করা, সাধারণ বেশ বিধান করা, বিলাস্ দ্রব্য ব্যবহার না করা, মদ্য মাংস পরিহার করা, যৌনাচরণ না করা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অহংকার পরিত্যাগ করে মনকে স্থির পবিত্র ও প্রশান্ত রাখা, অধ্যয়নকে তপস্যা হিসাবে মনে করা — এইগুলিই হল নৈতিক শিক্ষার উপায়।

তৈত্তিরিয় উপনিষদে বলা হয়েছে শিক্ষার্থিগণ যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে মন্ত্রপাঠ করে যেত যাতে নিজেদের মঙ্গল, আশ্রমের মঙ্গল এবং জগতের সর্বজীবের মঙ্গল সাধন হয়।

৬.৫.১০ নারী শিক্ষা ঃ

বৈদিক যুগে নারীর সামাজিক ও শিক্ষাগত যে সুযোগ সুবিধা ছিল বৈদিক পরবর্তী যুগে তা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। তবুও বলা যায় এই উপনিষদের যুগেও নারী স্বামীর সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের অধিকারী হতেন। জনক রাজা যে ধর্ম সম্মেলন করেছিলেন তাতে যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নালোচনা বিখ্যাত ঘটনা হয়ে আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম স্ত্রী মৈত্রেয়ী একজন বিদুষী নারী ছিলেন। তিনি এমনকি তাঁর স্বামীরও ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতেন। নারীরাও শিক্ষিকা হিসাবে, সঙ্গীত, নৃত্য, চারুশিল্প প্রভৃতিতে, পারদর্শিনী ছিলেন। আর. কে. মুখার্জি

মন্তব্য করেছেন, "Women were taught some of the fine arts like dancing and singing, which were regarded as accomplishments unfit for men."

৬.৬ সমাবর্তন ঃ

শিক্ষা শেষ করে শিষ্য যখন গুরুকুল ত্যাগ করে নিজের ঘরে ফিরে যেতে যাবে তখন শিষ্যের সেই বিদায় ক্ষণটিতে গুরু তাকে সর্বশেষ উপদেশ দান করবেন যা তার ভবিষ্যৎ জীবনে চিরকালের পাথেয় হয়ে থাকবে। গুরুর এই নির্দেশারণীকে সমাবর্তন ভাষণ বলা যেতে পারে। এই ভাষণের অংশ বিশেষ হল ঃ

"সত্য কথা বল, ধর্মাচরণ কর, সত্য থেকে কখনও বিরত হয়ো না। দৈনিক প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন কর, বেদাধ্যয়ন কর, পিতাকে দেবতুল্য মনে করবে, মাতাকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করবে। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করবে, ব্রাম্নণকে শ্রদ্ধা করবে, বিনয়ের সঙ্গে দয়ালু চিত্তে দরিদ্রকে দান করবে" ইত্যাদি।*

৬.৭. গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ঃ

বৈদিক যুগের মতো বৈদিক পরবর্তী উপনিষদের যুগেও গুরু শিষ্যের মধ্যে নিবিড়, আদর্শ সম্পর্ক ছিল। যজ্ঞবেদির অগ্নি স্বামী রেখে শিষ্যকে শপথ নিতে হত এই বলে যে, সে গুরুগৃহে যতদিন থাকবে সেই সময়কাল গুরুর সেবা করে যাবে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে। অপর পক্ষে, গুরু এই শিষ্যের আহার, বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষাদান এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও সেবা কার্যে ব্যাপৃত থাকবেন। তাই দেখা যায় এই ১২ বৎসরকাল গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিষ্য পরম ব্রম্নলাভের পথে নিজেকে সমর্পিত করত। এমনকি এও দেখা যেত পাঠ সমাপনান্তে শিষ্য নিজ গৃহে ফিরে না গিয়ে বাকি জীবন গুরু গৃহেই কাটিয়ে দিল। বলা বাহুল্য, এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক ছিল তা বোঝা যায়।

৬.৮. ব্রাম্নণ্য যুগের শিক্ষা ঃ

পরবর্তী বৈদিক যুগে স্থিতিশীল সমাজে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত ব্রাম্নণদের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার যুগকে বলা হয় ব্রাম্নণ্য শিক্ষার যুগ।**

৬.৮.১ ব্রাম্নণ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

বৈদিক শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান লাভ বা আত্মোপলব্ধি। দৃশ্যমান জগৎ একান্ত ক্ষণস্থায়ী। অবিনশ্বর সত্য হোল ব্রম্ন বা ঈশ্বর। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে সেই পরম সত্তাকে জানাই হল মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যা হল সেই জ্ঞান ও দক্ষতা যা মানুষকে সবরকম জরা, ব্যাধি, দাসত্ব ও হীনতা থেকে যুক্ত করে।

* "These words read almost like chancellors' convocation address of modern universities."—*R. K. Mukherjee*.

** "It was the Aryans, and especially the priestly class, the Brahmans, who moulded the religion, philosophy, science, and art, as well as the social organisation which is spread all over India." F. E. Keay (A History of Education in India and Pakistan).

৬.৮.২ ব্রাম্মণ্য শিক্ষার পাঠ্যক্রম ঃ

বৈদিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের দুটি ভাগ ছিল। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার লক্ষ্য ছিল মোক্ষলাভ বা আত্মার মুক্তি। বেদ অধ্যয়ণ ছিল এই বিদ্যার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুযায়ী যে সব বিষয় পাঠ্যক্রমে গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল চারিটি বেদ (ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব), ছয়টি অঙ্গ (শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প), ইতিহাস, পুরাণ, ব্রম্মবিদ্যা, দেববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, ক্ষাত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, রাশিবিদ্যা, বাক ও বাক্যম্ ইত্যাদি।

অপরাবিদ্যার লক্ষ্য ছিল বাস্তব জীবনোপযোগী জ্ঞান অর্জন। এই পাঠ্যক্রম ক্ষত্রিয়রা অনুশীলন করতেন রাজনীতি, অস্ত্রবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, দণ্ডনীতি ইত্যাদি। বৈশ্যরা প্রধানত যে বিষয়গুলি অনুশীলন করতেন সেগুলি হল পশুপালন, কৃষিকাজ, ব্যাবসা-বাণিজ্য, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, ধাতুশিল্প ইত্যাদি।

প্রাচীন ঋষিগণ পরাবিদ্যার অনুশীলনে উৎসাহ দিলেও অপরাবিদ্যার বিষয়গুলিকেও কম গুরুত্ব দেননি।

৬.৮.৩ ব্রাম্মণ্য শিক্ষার শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ

শিক্ষা ছিল মৌখিক। গুরুর মুখ থেকে শুনে শিক্ষার্থীকে প্রতিদিনের পাঠ মুখস্থ করতে হত। উচ্চারণ ও আবৃত্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিনটি ধাপ ছিল জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ পথ। প্রথম স্তরে গুরু বাক্য বা উপদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। দ্বিতীয় স্তরে, বিষয়বস্তুকে যুক্তি সহকারে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে ও তৃতীয় স্তরে, একাগ্র চিত্তে সাধনার দ্বারা পরম সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। একেই বলা হত নিদিধ্যাসন। সে যুগের পাঠদান পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

- প্রথমে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে পাঠের 'উপক্রম' বা প্রস্তুতি তৈরি হত।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে 'অভ্যাস' স্তরে পঠিত বিষয়টির নিরন্তর আবৃত্তি বা অভ্যাস করানো হত।
- তৃতীয় পর্যায়ে 'অপূর্বতা' স্তরে বিষয়বস্তুর অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করা হত।
- চতুর্থ পর্যায়ে 'ফল' স্তরে বিষয়বস্তু উপলব্ধির পরীক্ষা করা হত।
- পঞ্চম পর্যায়ে 'অর্থবাদ' স্তরে বেদের ভাষ্য ব্রাম্মণ গ্রন্থ পাঠ করানো হত।
- ষষ্ঠ পর্যায়ে 'উপপত্তি' স্তরে ছাত্ররা মর্মার্থ গ্রহণে সমর্থ হত।

এ সবের ফলে ছাত্ররা সত্য উপলব্ধি করতে পারত। শেষ পর্যায়ে ছাত্ররা একক প্রচেষ্টায় মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে বেদ ও উপনিষদের প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারত।

৬.৮.৪ ব্রাম্মণ্য শিক্ষার সময়কাল ঃ

প্রাচীন বৈদিক সমাজ চতুরাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলি হল ব্রম্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ব্রম্মচর্য ছিল বিদ্যার্জনের সময়। এই সময় বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। উপনয়নের পর গুরুগৃহে শিক্ষা শুরু হত। সাধারণত আট বছর বয়সে ব্রাম্মণদের উপনয়ন হত। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে এগারো বছর ও বৈশ্যদের জন্য বারো বছর বয়স নির্ধারিত ছিল।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী গুরুগৃহে বারো বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করত। অধ্যয়ন শেষে হত সমাবর্তন উৎসব। উৎসব শেষে স্নাতক শিক্ষার্থী সাধ্যমত গুরুদক্ষিণা প্রদানের পর নিজগৃহে ফিরে যেত।

৬.৮.৫ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শৃঙ্খলা ঃ

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষার্থীদের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হত। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে সংযম ও কৃচ্ছ্র সাধন করতে হত। স্ত্রী সঙ্গ, দিবানিদ্রা, গন্ধদ্রব্য ও মালা চন্দনের ব্যবহার, গুরুপাক খাদ্যগ্রহণ, মাদক দ্রব্য গ্রহণ, সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস নিষিদ্ধ ছিল। সংযম ও শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলা হত।

৬.৮.৬ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঃ

প্রাচীন ভারতে বিদ্যাদান কর্মে নিয়োজিত আচার্যগণ ছিলেন জ্ঞান, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে স্বগৃহে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিতরণ করতেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে পিতৃতুল্য মনে করত এবং ভক্তিভরে শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ এবং পালন করত।

৬.৮.৭ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

গুরুকুল বা গুরুর আশ্রমই ছিল ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আশ্রমে ছাত্রসংখ্যা সীমিত হওয়ায় প্রত্যেক গুরু ছাত্রদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুধাবন করে পাঠদান করতে পারতেন। পরবর্তীকালে পরিষদগুলি হয়ে উঠেছিল শিক্ষাগ্রহণের প্রাণকেন্দ্র। পরিষদে মিলিত হতেন জ্ঞানলোকের শ্রেষ্ঠ মনীষীরাই। বিশেষজ্ঞদের এই সভায় সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধানের সংশয়াধীন প্রশ্নের মীমাংসা হোত। যে সব স্থানে ঘন ঘন পরিষদ বসতো সেখানে ধীরে ধীরে পণ্ডিত উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এর ফলে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠীর। গুরু-শিষ্যের এই যৌথ উপনিবেশই প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য যুগে কিন্তু এটি অতিবাহিত হয়েছিল বৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত। এই উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রে সারা ভারত থেকে ছাত্র সমাবেশ ঘটেছিল। এসেছিলেন বহু পণ্ডিত ও সমাদৃত শিক্ষকবৃন্দ। কুষাণ যুগ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। যুগে যুগে কালে কালে এই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর বহিঃআক্রমণ হয়ে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সমান্তরাল ভাবে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। তথাপি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সমুজ্জ্বল থেকেছে।*

৬.৮.৮ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি ঃ

বেদ পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।

- সে সময়ের ভারতীয় সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। আত্মজ্ঞান লাভ বা আত্মোপলব্ধিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

* "When the Muslim invasions burst upon India both Brahman and Buddhist educational institutions suffered severly and those of the Buddhists afterward decayed and disappeared, a process which was helped by the assimilation of Buddhism in India with Hinduism. But Brahman education continued in spite of the difficulties, and as the Buddhist centres of learning decayed those of the Brahmans became more prominent."—F. E. Keay.

- পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে এই যুগে সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।
- শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল প্রধানত মৌখিক। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত।
- শিক্ষা ছিল অবৈতনিক ও কঠোর শৃঙ্খলা নির্ভর।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্নেহ এবং জ্ঞান পিপাসার উপর নির্ভরশীল।

৬.৮.৯ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার অবদান ঃ

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রগতিশীল দিকগুলো নিম্নরূপ।

- **ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঃ** ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য অপরাবিদ্যা, গুরুকুলের অনুশাসন, শৃঙ্খলা প্রভৃতি যুক্ত হয়েছিল সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থায়।
- **ব্যক্তিভিত্তিক পাঠদান ঃ** শ্রেণি পঠন পাঠন তখন ছিল না। গুরুকুলে ছাত্র সংখ্যাও ছিল সীমিত। ফলে আচার্য বা শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের ক্ষমতা ও সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে সচেতন থাকা সম্ভব হত। ছাত্রের অগ্রগতিও শিক্ষক বুঝতে পারতেন সহজে। এসবের ভিত্তিতেই শিক্ষক ছাত্রের শিক্ষার গতি নির্ধারণ করতেন।
- **ভবিষ্যৎ জীবন প্রস্তুতিতে সহায়তা ঃ** আধ্যাত্মিক বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ব্যবহারিক দিকের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হত।
- **আবাসধর্মী শিক্ষা ঃ** শিক্ষা ব্যবস্থা আবাসিক হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা একাগ্র চিত্তে নিজ নিজ কাজ করতে পারত। এর ফলশ্রুতিতে তাদের দেহ মনের সম্পূর্ণ বিকাশ ও অধ্যয়ন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠত।
- **চরিত্র গঠনের শিক্ষা ঃ** নিছক জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি জীবন সম্পর্কে একটা আদর্শ ধারণা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা হত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায়। ফলে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক গঠনটি সুদৃঢ় হত।
- **সু-অভ্যাস গঠনের শিক্ষা ঃ** গুরুগৃহে বসবাসকারী ছাত্রদের যজ্ঞানুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি, ভিক্ষা, গুরুসেবা, বৈদিক মন্ত্রোচারণ ও আবৃত্তি প্রত্যেকটি কাজই অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে দীর্ঘদিন অনুশীলন করতে হত। এর ফলে তাদের মধ্যে সু-অভ্যাসগুলি সুন্দরভাবে গড়ে উঠত।
- **উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান ঃ** উদার উন্মুক্ত পরিবেশ মাধুর্য শিক্ষার্থীদের মনে পরিতৃপ্তি ও সুস্থতা প্রদান করত। প্রকৃতির অন্তরঙ্গতা তাদের প্রকৃতি অভিমুখী, যত্নশীল ও পরিবেশ সচেতন করে তুলত। সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীরা মনোরম পরিবেশে জ্ঞানচর্চার দুর্লভ সুযোগ লাভ করত। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে যথার্থই বলা হয়েছে যে, "Few countries, and certainly no western ones, have had systems of education which have had such a long and continues history with so few modifications as some of the educational systems of India."–F. E. Keay.

৬.৯ প্রশ্নাবলী

১। বৈদিক যুগ বলতে কোন সময়কে বোঝান হয়?

২। বৈদিক যুগের শিকার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত করো।

৩। বৈদিক যুগের শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করো।

৪। বৈদিক যুগের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

৫। বৈদিক যুগের শিক্ষার সামগ্রিক রূপরেখাটি বর্ণনা করো।

৬। উপনিষদের মূল বাণীটি কী?

৭। উপনিষদের যুগে শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পাঠ পদ্ধতি ও মূল্যায়নের বিবরণ দাও।

৮। উপনিষদের যুগের প্রবর্তিত গোত্র, কুল, শাখা, চরণ প্রভৃতি ধারণাগুলির পরিচয় দাও।

৯। উপনিষদের যুগের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কেমন ছিল?

১০। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈদিক যুগের সঙ্গে বৈদিক পরবর্তী উপনিষদের যুগের তুলনামূলক আলোচনা করো।

১১। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

১২। ব্রাহ্মণ শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

১৩। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার অবদান নির্ণয় করুন।

১৪। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কোন দিকগুলি বর্তমান কালের শিক্ষাক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

৭.০ গ্রন্থপঞ্জি :

★ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ (১৯৯৫) ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, সেন্ট্রল লাইব্রেরি, কলকাতা-৭৩।

★ Attekar, A. S. (1957) Education in Ancient India, Nandkishore, Varanasi, U-P.

★ Mukherji, R. K., Ancient Indian Education.

★ Rai, B.C., History of Indian Education. Prakashan Kendra, Aminabad, Lucknow.

একক ৭ ❑ বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ও মধ্যযুগের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা

গঠন ঃ

৭.১ বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা
৭.২ বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য
৭.৩ বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠক্রম
৭.৪ বৌদ্ধ শিক্ষার শিক্ষাদান পদ্ধতি
৭.৫ বৌদ্ধ শিক্ষার শিক্ষাকাল
৭.৬ বৌদ্ধ শিক্ষায় শৃঙ্খলা
৭.৭ বৌদ্ধ শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক
৭.৮ বৌদ্ধ শিক্ষায় নারী
৭.৯ বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান
৭.১০ বৌদ্ধ শিক্ষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী
৭.১১ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার তুলনা
৭.১২ বৌদ্ধ শিক্ষার অবদান
৭.১৩ মধ্যযুগের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা
৭.১৪ মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্য
৭.১৫ মুসলিম শিক্ষার স্তর
৭.১৬ মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষা
৭.১৭ মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি
৭.১৮ মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও ভাষা মাধ্যম
৭.১৯ মক্তবের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা
৭.২০ মাদ্রাসার উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা
৭.২১ মাদ্রাসার উচ্চতর শিক্ষার পাঠ্যক্রম
৭.২২ মাদ্রাসার শিক্ষণ পদ্ধতি
৭.২৩ মাদ্রাসার শিক্ষার ব্যপ্তিকাল
৭.২৪ মাদ্রাসার শিক্ষার পরীক্ষা ব্যবস্থা
৭.২৫ মুসলিম শিক্ষায় ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক
৭.২৬ মুসলিম যুগে নারী ও শিক্ষা
৭.২৭ মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবাচক দিকসমূহ
৭.২৮ প্রশ্নাবলী
৭.২৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিল যাগযজ্ঞাদি, ক্রিয়াকাণ্ড, বর্ণভেদ ও অন্যান্য সংস্কারের প্রতিক্রিয়া রূপে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পাশাপাশি বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

৭.২ বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

বৌদ্ধ যুগের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল জাগতিক সর্বপ্রকার বন্ধনের অবসান ঘটিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করা। অজ্ঞতা দূরীভূত হলে মানুষের দুঃখ দূর হবে। এবং সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। এজন্য বৌদ্ধ শাস্ত্রে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল সম্যক্ দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ বাক্য, সৎ কার্য, সৎ জীবন, সৎ জীবিকা, সৎ স্মৃতি, সম্যক সমাধি। এই নীতিগুলি শিক্ষা করতে পারলে চিত্তের উন্নতি হয় এবং পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরম জ্ঞান লাভ করলে মানুষের নির্বাণ লাভ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি ঘটে।

তাই বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানুষকে নীতিপরায়ণ হতে সাহায্য করা। এজন্য তাকে অসত্য, অন্যায়, অসৎ আচরণ, চৌর্য ও জীবহিংসা পরিত্যাগ করতে হবে। এগুলি পঞ্চশীল নামে পরিচিত।

৭.৩ বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠ্যক্রম ঃ

বৌদ্ধ যুগে লৌকিক জ্ঞানের পরিবর্তে ত্রিপিটক ধর্মগ্রন্থ পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। আচার্য ত্রিপিটক থেকে সময়োপযোগী কোন অধ্যায় পাঠ দিতেন এবং বুঝিয়ে দিতেন। তিনি ছাত্রদের কাছে কোন বিষয় অস্পষ্ট রাখতেন না। বিনয় পিটক পাঠে পারদর্শী হবার পাঁচ বছর পরে ছাত্র গুরুর কাছ থেকে পৃথক হতেন। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই বিনয় আয়ত্তের পর আরও দশ বছর কোন গুরুর কাছে তাকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হত।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু ও জৈন দর্শন, বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, উপনিষদ, সাংখ্য, তন্ত্র, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭.৪ বৌদ্ধ শিক্ষার শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ

শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল প্রধানত মৌখিক। তবে বৌদ্ধযুগে লিপির প্রচলন ছিল। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় লিপির ব্যবহার কমই হত। মুখস্থ করা ও আবৃত্তি করা এ দুটিই ছিল শিক্ষার প্রধান উপায়। বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতিতে বিতর্ক ও আলোচনার একটা বিশেষ স্থান ছিল।

৭.৫ বৌদ্ধ শিক্ষার শিক্ষাকাল ঃ

সাধারণভাবে বৌদ্ধ শিক্ষার কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১) **প্রব্রজ্যা ঃ** শিক্ষার্থী আট বছর বয়সে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করত। এই সময় তাকে পঞ্চশীল সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হত। এই মঠবাসী শিক্ষার্থীদের বলা হত ভিক্ষু।

২) **শ্রমণ ঃ** প্রব্রজ্যা নেওয়া শিক্ষার্থীদের বলা হত শ্রমণ। শ্রমণের শিক্ষার কাল ছিল বারো বছর ব্যাপী। শ্রমণকে গুরুর অধীনে থাকতে হত।

৩) **উপসম্পদা ঃ** কুড়ি বছর বয়স হওয়ার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে শ্রমণকে উপসম্পদা দেওয়া হত। দশ বছর উপস্পদা জীবন অতিবাহিত হত। এর পরে শিক্ষার্থী উপাধ্যায় স্তরে উন্নীত হতেন।

৭.৬ বৌদ্ধ শিক্ষায় শৃঙ্খলা ঃ

মঠবাসী শিক্ষার্থীকে কঠোরভাবে মঠের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হত। কোন ভিক্ষু অপরাধ করলে দশ জন প্রধান ভিক্ষু মিলে অপরাধীর শাস্তি বিধান করতেন। গুরুতর অপরাধ করলে তাকে সংঘচ্যুত করা হত।

৭.৭ বৌদ্ধ শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঃ

বৌদ্ধ শিক্ষায় গুরু শিষ্য সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। গুরু যেমন শিষ্যদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তেমনি শিষ্যরাও গুরুর আদেশ মেনে চলাকে একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করত।

৭.৮ বৌদ্ধ শিক্ষায় নারী ঃ

বুদ্ধদেব নারীদের বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যাদের মধ্যে রাণী ক্ষেমা, সুজাতা, শুভা, অনুপমা ও সুমেধার নাম উল্লেখযোগ্য। ভিক্ষুণীদের শিক্ষার জন্য একজন ভিক্ষুকে মনোনীত করা হত। তিনি অন্য এক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভিক্ষুণীদের শিক্ষা দিতেন। দুবছর পরীক্ষাধীন থাকার পর ভিক্ষুণীকে দীক্ষা দেওয়া হত। প্রথম অবস্থায় সংঘগুলিতে শিক্ষা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করতে পারত।

৭.৯ বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ঃ

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিহারগুলিই ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহারের পাশাপাশি রাজানুকূল্যে গড়ে ওঠা বৃহৎ বিহারগুলিই ছিল বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এরকম খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিক্রমশীলা মহাবিহার।

নালন্দা—সম্রাট অশোকের যুগে প্রাথমিক সূচনা হলেও নালন্দা সমধিক খ্যাতি অর্জন করে মহাযান বৌদ্ধমতের সময়ে। 'হিউ-এন-সাঙ'-এর বিবরণে জানা যায় বিশালায়তন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। এই আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা ও ঔষধ বিনামূল্যে লাভ করতেন। এখানে স্নাতকোত্তর বিশেষীকরণের শিক্ষা দেওয়া হত। উচ্চমানের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ছিল নিয়ন্ত্রিত। নালন্দার পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ, ধর্মীয়-লৌকিক, দার্শনিক ও ব্যবহারিক, বিজ্ঞান ও কলা প্রভৃতি সকল জ্ঞানের সমন্বয়ে। ১৫০০ শিক্ষক ৮৫০০০ ছাত্রকে ১০০টি বিষয়ে বিভিন্ন পাঠকক্ষে নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট অনুসারে পাঠদান করতেন। উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও নৈতিক শিক্ষা ছিল বলেই নালন্দার ছাত্র উত্তর জীবনে সুখ্যাতি অর্জন করত।

বিক্রমশীলা—বিক্রমশীলা মহাবিহার ছিল পাল সম্রাটদের অবদান। মোট ১০৮টি মঠ নিয়ে গঠিত বিহারে ছিলেন ১০৮ জন মঠাধ্যক্ষ এবং আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায় ও কর্ম পরিদর্শক। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এবং অভয়কর গুপ্ত ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপকদের অন্যতম। বিক্রমশীলায় ছিল ছয়টি মহাবিদ্যালয়। বিক্রমশীলার পাঠ্যক্রম ও নিয়মবিধি প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ নেই তবে অনুমান করা চলে ধ্বংসাবশেষ ও অতীত পুঁথি পরীক্ষার মাধ্যমে। বিক্রমশীলার শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেণিগত ও ব্যক্তিগত উভয় প্রথাই চালু ছিল। বক্তৃতার সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্ক থাকায় শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

অন্যান্য বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র—নালন্দা, বিক্রমশীলা ছাড়া বল্লভী, ওদন্তপুরী, জগদ্দল, সারনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

৭.১০ বৌদ্ধ শিক্ষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

- ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সংস্কার রূপে বৌদ্ধ শিক্ষার উদ্ভব।
- বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হত।
- সংঘ বিদ্যালয়ে প্রব্রজ্যা, সংযম, ভিক্ষা, কর্তব্য, নৈতিকতা প্রভৃতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।
- প্রাকৃত ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হত।
- শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও মৌখিক।
- শিক্ষা ছিল অবৈতনিক।
- রাষ্ট্র ও রাজানুকূল্যে বৌদ্ধবিহারগুলি হয়েছিল বৃহদায়তন।
- শিক্ষায় সর্বজনীনতা স্বীকৃত হয়েছিল।
- মানবতা, সেবাদর্শ ও গণতান্ত্রিকতা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি।
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল বৈদিক শিক্ষার মতো পিতা-পুত্র তুল্য তবে অপেক্ষাকৃত উদার।

৭.১১ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার তুলনা ঃ

সাদৃশ্য ঃ

- উভয় শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মভিত্তিক।
- উভয়েরই আদর্শ ছিল ত্যাগমন্ত্র।
- কঠোর অনুশাসন (সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন ও ভিক্ষাবৃত্তি) উভয় শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।
- বৌদ্ধশিক্ষার ভিত্তি সংঘজীবন এবং ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার ভিত্তি আশ্রম জীবন। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা আবাসিক জীবন যাপন করতেন।

- ব্রাহ্মণদের উপনয়ন ও বৌদ্ধদের প্রব্রজ্যা মোটামুটিভাবে সমধর্মী।
- উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই অবৈতনিক।
- মৌখিক পাঠদান উভয় শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।
- উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় নারীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।
- উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের ন্যায়।

বৈসাদৃশ্য ঃ

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা	বৌদ্ধ শিক্ষা
১। বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।	১। বেদ বিরোধী কিন্তু উপনিষদ্ প্রভাবিত।
২। শিক্ষায় শূদ্রের কোনও অধিকার ছিল না।	২। শিক্ষা ছিল গণতান্ত্রিক ও উন্মুক্ত।
৩। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত।	৩। শিক্ষার মাধ্যম ছিল প্রাকৃত ভাষা বা পালি।
৪। অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। সমাবর্তন ছিল গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান।	৪। বৌদ্ধ ভিক্ষু কোনক্রমেই গৃহস্থ হতে পারত না। উপসম্পদা ছিল চিরতরে গৃহত্যাগের অনুষ্ঠান।
৫। গণশিক্ষা বিস্তারে অবদান সামান্য।	৫। গণশিক্ষা বিস্তারে অবদান অসামান্য।

৭.১২ বৌদ্ধ শিক্ষার অবদান ঃ

- সংঘশিক্ষা বৌদ্ধ শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট অবদান। এই সংঘশিক্ষা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ।
- জাতি-বর্ণ নিরপেক্ষতা—বৌদ্ধ সংঘে কোন জাতি বিভাগ ছিল না। সকল বর্ণের শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করত। নিজ যোগ্যতার বলে যে কেউ আচার্যের অধিকারী হতে পারতেন।
- গণশিক্ষার ব্যবস্থা—বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ গণশিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকতেন।
- আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিনিময়—বৌদ্ধ মহাবিহারগুলিতে বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়নের সুযোগ থাকায় চিন, তিব্বত, নেপাল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করতে আসতেন। ফলে মহাবিহারগুলি আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিক বিনিময় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।
- পাঠ্যবিষয়ের বৈচিত্র্যসাধন—প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রিপিটক, সূত্রপিটক, বিনয়পিটক, অভিধর্মপিটক পঠনের ব্যবস্থা থাকলেও ধীরে ধীরে পাঠক্রমে বৈচিত্র্য ঘটে বিষয়বস্তুর। বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ভাস্কর্য, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, সংগীত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের ন্যায় এবং প্রয়োজনবোধে পারস্পরিক সমালোচনার সুযোগ উভয়েরই অধিকার বলে চিহ্নিত ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা বলতে বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার সম্মিলিত রূপ ও সময়কালকে বোঝায়। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম রাজশক্তির আধিপত্য বিস্তারের ফলে ঐতিহ্যমন্ডিত বৈদিক শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষার অবনতি ঘটে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে পা বাড়ায়।

৭.১৩ মধ্যযুগের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ থেকে ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত। ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। মহম্মদ ঘোরি এই সময় ভারত আক্রমণ করেন এবং মুসলিম রাজত্ব কায়েম করেন। মুসলিম বিজয়ের পর ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। এক নতুন সংস্কৃতির ধারা এদেশে প্রবাহিত হল। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে চালু হল তা মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা বলে পরিচিত।

৭.১৪ মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

মুসলমানদের আগমনের ফলে শিক্ষা সংস্কৃতিতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটল। সংস্কৃতের পরিবর্তে পার্শি, হিন্দু পণ্ডিতদের বদলে মুসলমান উলেমাদের দল, বৈদিক স্তোত্র বা বুদ্ধের ত্রিশরণের পরিবর্তে জায়গা নিল কোরানের বয়েঙ বা মহম্মদের হাদিস্। সুতরাং মুসলিম ধর্মভিত্তিক শিক্ষার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি প্রকট হয়ে উঠল।

১। মহম্মদের নীতি অনুসরণ করা—মুসলিম শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মহম্মদের নীতি অনুসরণ করে মুসলিম সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা। মহম্মদের মতে জ্ঞানই অমৃত। তাই জ্ঞানার্জনই মুক্তির একমাত্র উপায়। প্রত্যেকের মধ্যে জ্ঞানার্জনের চাহিদা তৈরি করে তোলা ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

২। ইসলাম ধর্মের প্রচার—ইসলাম ধর্মের প্রচার মুসলমানদের কাছে প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। তাই শৈশবাবস্থা থেকে কোরান পড়ানো হত।

৩। ইসলামীয় নীতিবাদের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন রীতিনীতি পালন, সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার শিক্ষা প্রদান করা।

৪। ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাও ছিল মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্য। কারণ, মুসলিম সমাজে উচ্চশিক্ষিতদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হত। বিচারক, আইনজ্ঞ, মন্ত্রী প্রভৃতি পদে শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হতেন।

৫। ধার্মিক ও চরিত্রবান মানুষ তৈরি করাই ছিল মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৭.১৫ মুসলিম শিক্ষার স্তর ঃ

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টামূলক এবং উলেমারদের দ্বারা পরিচালিত। স্বাভাবিকভাবে দুটি স্তরে শিক্ষা পরিচালিত হত। মক্তব ও মাদ্রাসায় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা পরিচালিত হত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পরিচালিত হত মক্তবগুলিতে। এইসব মক্তবগুলি মসজিদ সংশ্লিষ্ট ছিল এবং জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হত। মাদ্রাসাগুলিতে উন্নততর শিক্ষা বা কলেজীয় স্তরের শিক্ষা দেওয়া হত। সাধারণভাবে নবাব বা কোন বিখ্যাত মুসলমান বা ফকিরের

সমাধিস্থলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হত। সমাধিস্থল অঞ্চলে বহু ঘর থাকত। এগুলি ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহৃত হত। এছাড়া কিছু ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল যেগুলি বংশপরম্পরায় উচ্চশিক্ষা পরিচালনা করত।

৭.১৬ মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যারম্ভ সূচিত হত বিসমিল্লাহ্ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শিশুর বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন তখন তাকে সূচিবস্ত্র পরিধান করিয়ে তাকে অক্ষর, সংখ্যা, কোরানের কিছু অংশ সামনে রেখে সুরা-ই-ইক্‌রা আবৃত্তি করান হত। এরপর কোরাণের উপর্যুক্ত দুটি অধ্যায় পড়িয়ে মোল্লাসাহেব শুভকামনা করতেন। সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান শেষ হত।

৭.১৭ মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি ঃ

মৌলবীর উপস্থিতিতে ছাত্ররা কাঠের বোর্ড বা তক্‌তিতে রাখা ধুলোয় শরের তৈরি কলমে লেখা অভ্যাস করা হত। প্রথমে অক্ষর, ছোট থেকে বড় অক্ষর শেখানো ও পড়ানো হত। পরে শুদ্ধভাবে পাঠের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হত। পরে এই জটিল ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতির সংস্কার করেছিলেন মহামতি আকবর।

৭.১৮ মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও ভাষা মাধ্যম ঃ

মক্তবগুলির পঠনপাঠন মাধ্যম ছিল পার্শি। এখানে কোরান পাঠ, পাটিগণিত সাধারণভাবে শেখান হত। আমির খসরু এই পর্যায়ে মিযান এবং পঞ্চগঞ্জ—এ দুটি আরবী ব্যাকরণ পাঠের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সুন্দর হস্তাক্ষর, সাহিত্য, ধনুর্বিদ্যাও শেখানো হত। ছাত্ররা ইউসুফ ও জুলেখা, লয়লা-মজনু, সিকন্দরনামা প্রভৃতি কাব্যকথা অধ্যয়ন করতেন। এছাড়া চিঠিপত্র লেখা, আবেদনের খসড়া, উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রভৃতি শেখানো হত।

৭.১৯ মক্তবের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

মক্তবগুলিতে যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রদান করা হত। পাঠ্যক্রমের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ ছিল বলে জানা যায়। গদ্যজাতীয় রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইন্‌সা-ই-ইউসুফী, মোল্লাজামি ও মোল্লা মুনীর-এর মার্কুমৎ, আবুল ফজলের মক্‌তুবত্, শেখ ইনাতুল্লার গুলদস্তা ইত্যাদি। কবিতা জাতীয় রচনার মধ্যে ইউসুফ জুলাইখা, সিকিন্দরনামা, আমীর খস্রুর ইজ্জাজ-ই-ঘুসরভি প্রভৃতি। গল্পের মধ্যে বকসির তুতিনামা, শেখ্ আব্দুল ফজলের আয়ার দানিস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসে ফিরদৌসীর শাহ্‌নামা, সাফউদ্দিন আলির জাফরনামা, আকবরনামা, জাহাঙ্গীরের ইক্‌বালনামা ইত্যাদি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন শাস্ত্রে নাসিরির আখলক্, নজহতুলের আরওহা, সনাই-এর হাদিশ ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে এইসব পাঠ্যক্রমিক বিষয় বিধিবদ্ধভাবে প্রতিটি মক্তবে মানা হত না।

৭.২০ মাদ্রাসার উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

সাধারণভাবে কলেজের শিক্ষাস্তরকে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ধরে নেওয়া যায়। সাধারণত মাদ্রাসা দিনে দুবার বসত। সকাল থেকে দুপুর এবং বিকাল থেকে রাত অবধি।

৭.২১ মাদ্রাসার উচ্চতর শিক্ষার পাঠ্যক্রম ঃ

এই স্তরে কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। এছাড়া ব্যাকরণ, যুক্তিবিজ্ঞান, সাহিত্য, ঈশ্বরতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র এই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবরের আমলে নক্ষত্র বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র ও দর্শণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যাকরণ কাফিয়া, সারহজামি, ছন্দ (মুখতেসর), দর্শন (হিদায়াতুল হিকমহ এর ব্যাখ্যা), তর্কশাস্ত্র (সামসিহর ব্যাখ্যা), চিকিৎসা শাস্ত্র (আবু আলি ইবন সিনার-এর সংক্ষিপ্তসার) ইত্যাদি।

৭.২২ মাদ্রাসার শিক্ষণ পদ্ধতিঃ

মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানতঃ ছিল মৌখিক। শিক্ষকগণ বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। ছাত্রদের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম, তর্কশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতির পঠন পাঠনে সংশ্লেষণী ও আরোহী পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। পড়ার পরে লিখন পদ্ধতি চালু ছিল। মধ্যযুগীয় মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মগঠন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

৭.২৩ মাদ্রাসার শিক্ষার ব্যপ্তিকাল ঃ

মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় কোন শিক্ষাক্রমের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক ছিল না। ছাত্রদের মেধার উপর নির্ভর করে পাঠ সমাপন হত। সাধারণভাবে কোন ছাত্রের উচ্চশিক্ষার জন্য ১৫/১৬ বছর প্রয়োজন হত।

৭.২৪ মাদ্রাসার শিক্ষার পরীক্ষা ব্যবস্থা ঃ

সাধারণভাবে কোনও পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও বিশেষ বিষয়ের দক্ষতা ওই বিষয় শিক্ষকের প্রশংসাপত্রের দ্বারা নির্ণীতি হত। মাঝে মাঝে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হত। এসব থেকে শিক্ষকরা ছাত্রদের বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতেন।

৭.২৫ মুসলিম শিক্ষায় ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ঃ

ইসলামিক যুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। মৌলবী ও মিঞাজী যারা শিক্ষাদান কর্মে নিয়োজিত থাকতেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নয়নে সাহায্য করা এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকরূপে কাজ করা। অন্যদিকে ছাত্ররাও শিক্ষকদের বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতেন। গুরুসেবা ছাত্রদের পরম পবিত্র কর্ম বলে বিবেচিত হত।

৭.২৬ মুসলিম যুগে নারী শিক্ষা ঃ

প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য নারীশিক্ষা তেমনভাবে প্রসারিত হয়নি মধ্যযুগের মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং নারী শিক্ষা স্বীকৃতি লাভ করে। নারীশিক্ষার প্রসার কম হলে বহু শিক্ষিতা মহীয়সী মুসলমান নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চাঁদ সুলতানা, বানুবেগম, নূরজাহান, মুমতাজ, জাহানারা, উন্নেসা, সুলতানা রিজিয়া প্রভৃতি।

৭.২৭ মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবাচক দিকসমূহ ঃ

এই শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। নানা উত্থান ও পতনের ভিতর দিয়ে যে সব ইতিবাচক দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেগুলি হল —

- মুসলিম শিক্ষা বাস্তব জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।
- শিক্ষাই জীবনের অপরিহার্য উপাদান — একথা মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় সমর্থিত হয়েছে।
- ইতিহাস ও সাহিত্যের অগ্রগতি মুসলিম শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। মুসলিম শাসকরা তাঁদের স্মৃতিকথার মাধ্যমে ইতিহাস লিখে গেছেন। মুসলমানদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও বিলাস বাহুল্যের ছাপ ওই সময়কার সাহিত্যে পাওয়া যায়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল সহযোগীতার। শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত যত্ন নিতেন এবং যোগ্য ও বুদ্ধিমান ছাত্ররা তাদের যোগ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ পেতেন।

মধ্যযুগে ইসলামী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম শিক্ষার সূচনা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অতিরিক্ত ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়নি। এই শিক্ষা প্রধানত কোরান ভিত্তিক না হয়ে যদি লৌকিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করত তবে ভারতের শিক্ষা মানচিত্রে একটি স্থায়ী অবস্থান চিহ্নিত করতে পারত।

৭.২৮ প্রশ্নাবলী

১। বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? এর বৈশিষ্টাবলী আলোচনা করুন।

২। বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠদান পদ্ধতি কিরূপ ছিল?

৩। বৌদ্ধ শিক্ষার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করুন।

৪। বর্তমানে বৌদ্ধ শিক্ষার কোন কোন দিক এখনও প্রাসঙ্গিক বলে তুমি মনে করুন?

৫। বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে নালন্দার গুরুত্ব বিবৃত করুন।

৬। মধ্যযুগের মুসলিম শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিত করুন।

৭। মক্তবগুলিতে শিক্ষার কোন স্তর পর্যন্ত পরিচালিত হত? মক্তব ভিত্তিক শিক্ষার একটি রূপরেখা অংকণ করুন।

৮। মাদ্রাসা শিক্ষা কাদের জন্য নির্ধারিত ছিল? মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করুন।

৯। মুসলিম শিক্ষার উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।

৭.২৯ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

- আচার্য, পরমেশ (১৯৮৯), বাংলার দেশজ শিক্ষাকরা, অনুষ্টুপ, কলকাতা।
- দাশগুপ্ত, নলিনীভূষণ, ভারতের শিক্ষার ইতিহাস ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা, কলকাতা বাক্ সাহিত্য।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, পঃ বঙ্গ।
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী (১৮৯১), ইতিহাসের আলোকে বৈদিক শিক্ষা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ (১৯৯৫), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কলিকাতা - ৭৩
- Altekar, A. S. (1957) Education in Ancient India, Nandkishore, Varanasi, U.P.
- Mookerji, R. K., Ancient Indian Education
- Law, N. N. (1916), Promotion of Learning in India during Muhummadan rule, Longman Gnen & Co. London.

একক ৮ ❑ ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রচেষ্টা

গঠন ঃ

৮.১ সূচনা

৮.২ অ্যাডামের রিপোর্ট

৮.২.১ অ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট

৮.২.২ অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট

৮.২.৩ অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট

৮.৩ ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য

৮.৩.১ সূচনা

৮.৩.২ প্রেক্ষাপট

৮.৩.৩ মেকলের মন্তব্য

৮.৩.৪ ফলাফল

৮.৩.৫ সমালোচনা

৮.৪ প্রেক্ষাপট

৮.৪.১ ডেস্‌প্যাচের বর্ণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য

৮.৪.২ শিক্ষার মাধ্যম

৮.৪.৩ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি

৮.৪.৪ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা

৮.৪.৫ সমালোচনা

৮.৫ প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হাণ্টার কমিশন

৮.৫.১ প্রেক্ষাপট

৮.৫.২ কমিশনের বিচার্য বিষয়

৮.৫.৩ কমিশনের সুপারিশ

৮.৫.৪ দেশীয় শিক্ষা

৮.৫.৫ প্রাথমিক শিক্ষা

৮.৫.৬ মাধ্যমিক শিক্ষা

৮.৫.৭ শিক্ষার মাধ্যম

৮.৫.৮ শিক্ষক-শিক্ষণ

৮.৫.৯ উচ্চশিক্ষা

৮.৫.১০ বিশেষ শিক্ষা

৮.৫.১১ নারী শিক্ষা

৮.৫.১২ সমালোচনা

৮.৬ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

৮.৬.১ প্রেক্ষাপট
৮.৬.২ কমিশনের সুপারিশ
৮.৬.৩ সমালোচনা
৮.৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন
৮.৭.১ প্রেক্ষাপট
৮.৭.২ কমিশনের সুপারিশ
৮.৭.৩ সমালোচনা
৮.৮ যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনা বা সার্জেন্ট রিপোর্ট
৮.৮.১ প্রেক্ষাপট
৮.৮.২ সুপারিশ
৮.৮.৩ সমালোচনা
৮.৯ প্রশ্নাবলী
৮.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.১ সূচনা ঃ

ভারতে নতুন শিক্ষা ধারার শুরু হয় ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে প্রবেশের পর। পাশ্চাত্য বণিকরা এদেশে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিশনারিরাও উপস্থিত হল। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তারা দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, খ্রিস্টের বাণী প্রচার ও দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার শুরু করেন। ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসনভার লাভ করায় ভারতীয় শিক্ষারভার কোম্পানির হাতে চলে যায়। ফলে ওই সময়ে ভারতবর্ষের প্রচলিত দেশজ শিক্ষার ধারা কেমন ছিল তা অনুধাবনের প্রয়োজন কোম্পানির কাছে প্রকট হয়ে উঠল।

৮.২ অ্যাডামের রিপোর্ট (১৮৩৫—১৮৩৮) ঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এর নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশের প্রাদেশিক গভর্নর লর্ড বেন্টিকের আদেশে উইলিয়াম অ্যাডাম নামে একজন শিক্ষাব্রতী মিশনারি ১৮৩৫—১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে বাংলাদেশের দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন। এগুলিই এ্যাডামের রিপোর্ট নামে পরিচিত। তাঁর প্রথম রিপোর্টটি পূর্ববর্তী সরকারি অনুসন্ধানগুলির একটি সংক্ষিপ্ত দলিল। দ্বিতীয় রিপোর্টটি বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার একটি থানাকে (নাটোর) কেন্দ্র করে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তৃতীয় রিপোর্টটি তৎকালীন বাংলা-বিহারের পাঁচটি জেলাকে কেন্দ্র করে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৮.২.১ অ্যাডামের প্রথম রিপোর্টঃ

১৮৩৫ খ্রিঃ ১লা জুলাই এই বিবরণীটি পেশ করা হয়। মূল বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক জ্ঞানের (অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যা, পরিচিতি ইত্যাদি) আলোচনা হত।

(২) বাংলাদেশে (বিহার নিয়ে) এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ।

(৩) লোকসংখ্যার হিসাবে প্রতি চারশ জনের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল।

(৪) গ্রামের সংখ্যা হিসাবে প্রতি তিনটি গ্রামের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল।

মনে রাখতে হবে সে সময় দেশীয় বিদ্যালয় বলতে বোঝান হত যে স্থানে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। এই অর্থে পরিবারভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকেও বিদ্যালয় বলা হত।

৮.২.২ অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট ঃ

১৮৩৫ খ্রিঃ ২৩ শে ডিসেম্বর দ্বিতীয় রিপোর্টটি পেশ করা হয়। এই রিপোর্টের মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) নাটোর থানার লোকসংখ্যা ছিল ১,৯৫,২৯৬ জন। এদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৬৫,৬৫৬ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ১,২৯,৬৪০ জন।

(খ) নাটোর থানার অধীনে গ্রামের সংখ্যা ৪৮৫টি।

(গ) মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭টি এবং ছাত্রসংখ্যা ২৬২ জন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
বাংলা বিদ্যালয়	১০	১৬৭
ফারসি বিদ্যালয়	৪	২৩
আরবি বিদ্যালয়	১১	৪২
বাংলা ও ফারসি মিশ্র বিদ্যালয়	২	৩০
	২৭	২৬২

(ঘ) পারিবারিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৫৮৮টি। এইসব পরিবার ২৩৪২ জন ছাত্রকে শিক্ষা দিত।

(ঙ) বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স ছিল ৮ বছর এবং পরিত্যাগের বয়স ১৪ বছর।

(চ) নারী শিক্ষার কোন প্রচলন ছিল না।

(ছ) সংস্কৃতি অধ্যয়নের জন্য টোলের সংখ্যা ছিল ৩৮ এবং ছাত্রসংখ্যা ৩৯৭ জন।

৮.২.৩ অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট ঃ

১৮৩৮ খ্রিঃ ২৮ শে এপ্রিল তৃতীয় রিপোর্টটি পেশ করা হয়। তিনটি রিপোর্টের মধ্যে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য সমৃদ্ধ। এই বিবরণীর প্রথম অংশে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিশৃত এবং দক্ষিণ বিহার এই পাঁচটি জেলার পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেন। এই জেলাগুলির প্রতিটিতে একটি করে থানার তথ্য তিনি নিজে সংগ্রহ করেছিলেন এবং বাকিগুলিতে তাঁর নিযুক্ত সহকর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। রিপোর্টের মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ।

(ক) পাঁচটি জেলায় মোট ২৫৬৭টি বিদ্যালয়ে ৩০,৯১৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা পেত।

(খ) মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় মোট ৬টি বালিকা বিদ্যালয়ে ২১৪ জন ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করত।

(গ) জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি অঞ্চলে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৭৩ ঃ ১।

(ঘ) সাক্ষরতার হার ছিল ৮ — ১২ শতাংশ।

(ঙ) উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯০টি টোল (সংস্কৃত পাঠের জন্য) ছিল এবং ২৯টি মাদ্রাসা (মুসলিম উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র) ছিল। টোলগুলিতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শণ, পুরাণ, কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতির অনুশীলন হত। অপর দিকে মাদ্রাসায় আরবি ও ফারসি ভাষার শিক্ষা দেওয়া হত।

রিপোর্টের শেষ অংশে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে তুলে কীভাবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলি নিচে আলোচিত হল।

(১) নির্বাচিত জেলায় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(২) শিক্ষক ও ছাত্রদের উপযোগী ভারতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার প্রচার করতে হবে।

(৩) প্রতি জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য একজন পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তিনি সামগ্রীকভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবেন।

(৪) শিক্ষকদের বই পড়তে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকেরা বিদ্যালয় ছুটির সময় একমাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত একাধিকক্রমে চার বছরের মধ্যে তাঁদের শিক্ষণ শিক্ষা সমাপ্ত করবেন।

(৫) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেরা ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান প্রদান করবেন। ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবেন।

(৬) শিক্ষকদের গ্রামে থেকে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করার জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

অ্যাডামের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বলা যায় যে দেশজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নানা ধরনের ত্রুটি ও সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বহুকাল ধরে এগুলি জনসাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে। তাই প্রগতিশীল স্থায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এই শিক্ষাব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই তা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শাসকদের দূরদৃষ্টির অভাব ও উদাসীনভাবে ফলে দেশীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে অগ্রসর হল। উপনিবেশিক ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে গণশিক্ষার প্রসারের পরিবর্তে কাজ চালানোর জন্য কেরানি তৈরিতেই বেশি মনোযোগী হয়েছিলেন।

৮.৩ ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য (১৮৩৫) ঃ

৮.৩.১ সূচনা ঃ

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেও ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্বকে তারা স্বীকার করেননি। ফলে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার নিদর্শন থাকলেও শিক্ষা বিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সরকারি নীতি ছিল না। ক্রমাগত জনমতের চাপে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সনদ আইনের ৪৩ নং ধারায় ভারতে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে একটি শর্ত যুক্ত হয়।

এই ধারার দুটি অংশ ছিল। প্রথম অংশে বলা হয় ব্রিটিশ ভারতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বিধান, পন্ডিতদের উৎসাহদান এবং দ্বিতীয় অংশে বলা হয় ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য কোম্পানি অন্য সব খরচ মিটিয়ে বছরে এক লক্ষ টাকা খরচ করবে।

১৮১৩ খ্রিঃ সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে সরকারিভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়।

১৮২৩ খ্রিঃ ৩১শে জুলাই সপরিষদ বড়লাট দশজন সভ্য নিয়ে General Committee for Public Instruction (G C P I) নামে একটি শিক্ষা সংসদ গঠন করেন ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তনকল্পে।

৮.৩.২ প্রেক্ষাপট ঃ

১৮৩১ খ্রিঃ বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ১৮১৩ খ্রিঃ সনদ আইনের ৪৩ নং ধারার ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে। শিক্ষাসভায় দুটি ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) জন্য আগ্রহ দানা বাঁধতে থাকে। প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থকদের মতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকেই বোঝানো হয়েছে এবং পণ্ডিত বলতে প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিতদের বোঝানো হয়েছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থকদের মতে ইংরাজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকেই বোঝানো হয়েছে ওই শিক্ষা ধারায়। ঐ সময় শিক্ষা সভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের সমান হওয়ার ফলে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং কাজকর্মে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে ১৮৩৩ খ্রিঃ সনদ নবীকরণ হয় এবং শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ দশ হাজার পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে এক লক্ষ করা হয়। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের মীমাংসা না হওয়ায় শিক্ষা সভা বাধ্য হয়ে সরকারের দ্বারস্থ হল। দুই দলই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা নিয়ে সরকারি মধ্যস্থতার দাবি জানায়। বড়লাট লর্ড বেন্টিক তখন তাঁর আইন পরিষদের সদস্য ও শিক্ষা সভার সদস্য মেকলের অভিমত চেয়ে পাঠান।

মেকলে এই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তাঁর বিখ্যাত মিনিট বা মন্তব্য পেশ করেন।

৮.৩.৩ মেকলের মন্তব্য ঃ

(১) মেকলে ১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনের বিতর্কিত বিষয়টির উল্লেখ করে যুক্তি দেখালেন সাহিত্যের উন্নয়ন বলতে শুধু সংস্কৃত ও আরবি সাহিত্যকে বোঝায় না। এর দ্বারা ইংরেজি সাহিত্যকেও বোঝায়।

(২) পণ্ডিত বলতে শুধু প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের বোঝায় না। মিল্টনের কাব্য, লক্‌ এর দর্শন এবং নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতিতে শিক্ষিত ভারতীয়গণ ও একই শ্রেণিভুক্ত।

(৩) সনদে বরাদ্দ অর্থ সম্পর্কে বলা হল যে শুধু প্রাচ্য সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও ভারতীয় পণ্ডিতদের উৎসাহদানের জন্যে এই অর্থ খরচ করা হবে তা নয়, ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য ও ওই অর্থ খরচ করা হবে।

(৪) শিক্ষার বিষয়বস্তু ও ভাষাগত দাবি সম্পর্কেও মেকলে আলোচনা করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি মত ছিল। দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও আরবি ভাষা এবং ইংরেজি ভাষা। ওই সময়ে ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলি ছিল দুর্বল ও উচ্চতর জ্ঞানচর্চার পক্ষে অনুপযুক্ত। মেকলের মতে গ্রিক্ ও ল্যাটিন ভাষা যেমন

ইংরেজি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল তেমনি মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে ইংরেজি ভাষাচর্চার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

সংস্কৃত ও আরবি ভাষা প্রসঙ্গে মেকলে প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে অসহিষ্ণু ও ঘৃণ্য মন্তব্য ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার অসংগতি, কুসংস্কার ও রহস্যবাদের বেড়াজালে আচ্ছন্ন। সমগ্র ভারত ও আরবের গ্রন্থরাজির জ্ঞান ইংল্যান্ডের গ্রন্থাগারের একটি ক্ষুদ্র অংশে রক্ষিত পুস্তকাদির সমান। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান ইংল্যান্ডের অশ্ব চিকিৎসকের অনুপযুক্ত। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ইংল্যান্ডের বোডিং স্কুলের মেয়েদের হাসির খোরাক ইত্যাদি।

তিনি ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে যুক্তি স্থাপন করলেন। তাঁর মতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি হল ইংরেজি, ভারতের শাসকশ্রেণির ভাষা ইংরেজি এবং বাণিজ্যিক ভাষা হিসাবেও ইংরাজি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতীয়রা সংস্কৃত ও আরবি অপেক্ষা ইংরাজিকে বেশি পছন্দ করে এবং ইংরেজি ভাষাই ভারতীয়কে ইংরেজি রুচি, মতধারা, নৈতিকতা ও বুদ্ধির দ্বারা প্রাণবন্ত ও কর্মক্ষম করে তুলবে।

এইভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে সেই শিক্ষাধারা স্বাভাবিকভাবে নিম্নস্তরে নেমে আসবে। তাই জনসাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তে চুঁইয়ে নামার নীতি অনুসারে সমাজের উচ্চস্তরের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

আসলে মেকলে চেয়েছিলেন ইংরাজি শিক্ষার ফলে এমন এক শ্রেণির লোক তৈরি হবে যারা বর্ণে ও রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।

৮.৩.৪ ফলাফল ঃ

বড়লাট লর্ড বেন্টিক মেকলের মন্তব্যের অনুকূলে ১৮৩৫ খ্রিঃ সরকারি নীতি ঘোষণা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটালেন। এর ফলে নীতিগতভাবে ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জয়যাত্রা শুরু হল ভারতের শিক্ষা বিস্তারে।

৮.৩.৫ সমালোচনা ঃ

ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে বিখ্যাত মন্তব্য করে মেকলে সমভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। তবে অতি নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটিই তাঁর কাম্য নয়।

(১) মেকলে এ দেশে আসার অনেক আগে থেকেই এ দেশের জনসাধারণ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তাই কালের অনিবার্য গতিতে যা কিছুদিন পরে সংঘটিত হত, মেকলের মন্তব্যে তা শুধুমাত্র ত্বরান্বিত হয়েছিল।

(২) আধুনিক শিক্ষার বিকাশে মেকলের মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলেই আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের সরকারি নীতি ঘোষিত হয় এবং ভারতে আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

(৩) মেকলে দেশীয় ভাষাগুলিকে দুর্বল ও অনুপযুক্ত বললেও মাতৃভাষাকে নিজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য সর্বশক্তি নিয়োগের কথাও তাঁর মন্তব্যে স্থান পেয়েছে।

(৪) মেকলের সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ হচ্ছে ভারতীয় সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞাতপ্রসূত অশ্রদ্ধেয় উক্তি। অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তাই তাঁকে ক্ষমা করা চলে না। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি অর্ধসত্য বিবরণ দিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করতে চেয়েছেন — এটাই তাঁর ধৃষ্টতা।

(গ) উডের ডেস্‌প্যাচ (১৮৫৪)

৮. প্রেক্ষাপট ঃ

মেকলের মন্তব্যে দেশীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে গণশিক্ষার বদলে চুঁইয়ে নামার নীতি গৃহীত হওয়ায় বিদ্যাসাগর, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসি প্রভৃতি ব্যক্তিরা দেশীয় প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হওয়ায় মিশনারিরা ক্ষুব্ধ হলেন। প্রশাসনিক কাজে ও শিল্প ও কলকারখানায় শিক্ষিত ভারতীয় কর্মচারী প্রয়োজন হল। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হল নতুন চাহিদা ও সমস্যা। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা ও নারী শিক্ষার দাবি বৃদ্ধি পেতে লাগল। পুরাতনের জের এবং নতুন সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ সুবিখ্যাত উডের ডেস্‌প্যাচ। ১৮৫৩ সালে কোম্পানির সনদ নবীকরণের সুযোগে ভারতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পার্লামেন্টে অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটলো। এই অনুসন্ধানের ফলে নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি চার্লস উডের নামে রচিত শিক্ষা দলিল ভারতবর্ষে এল ১৮৫৪ সালে।

৮.৪.১ ডেস্‌প্যাচের বর্ণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

(১) ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসার ঘটানো।

(২) পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য নৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন বিশ্বাসী কর্মচারী সৃষ্টি করা।

(৩) এইসব কর্মচারীদের ইউরোপীয় ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যাতে ইংল্যান্ডের কারখানাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এদেশ থেকে সরবরাহ নিশ্চিত হয় এবং ইংল্যান্ডে উৎপন্ন পণ্যের যাতে ভারতের বাজারে অফুরন্ত চাহিদা সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থা করা।

তাই ডেস্‌প্যাচে ঘোষণা করা হল ভারতে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তার করা হবে সেখানে থাকবে ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য।

৮.৪.২ শিক্ষার মাধ্যম ঃ

ডেস্‌প্যাচে বলা হয় উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি ভাষা। তবে মাতৃভাষার ঐতিহ্য এবং সামাজিক মূল্যের স্বীকৃতি হিসাবে এবং গণশিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষাকে উৎসাহিত করা হবে। প্রয়োজনবোধে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ-বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেশজ বিদ্যালয়কে উৎসাহ দেওয়া হবে।

৮.৪.৩ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঃ

ডেস্‌প্যাচে ঘোষিত হল যে সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাই চলবে। বেসরকারি বিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্বে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তা স্বীকার করা হবে না।

৮.৪.৪ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ঃ

সমগ্র দেশের শিক্ষার আয়োজনকে সুষ্ঠুরূপ দেওয়ার জন্য একটি সুচিন্তিত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার সুপারিশ করা হয়।

সুপারিশ ১ ঃ ডেস্‌প্যাচে কোম্পানি অধিকৃত বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব — এই পাঁচটি প্রদেশে একটি করে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত হবে জনশিক্ষা অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণে। তাঁর অধীনে থাকবে একদল পরিদর্শক। তাঁরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে পরামর্শদান করবেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

সুপারিশ ২ ঃ ডেস্‌প্যাচে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপরিশ করা হয়। তৎকালীন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। তবে ক্রমশ পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টিরও উল্লেখ করা হয়।

সুপারিশ ৩ ঃ ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার জাল বিস্তারের পরিকল্পনা রচিত হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজগুলির মাধ্যমে প্রসারিত হবে। এই স্তরের নীচের দিকে থাকবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর সকলের নীচের দিকে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করা হবে। সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য তাই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

দেশব্যাপী এই পরিকল্পনা সরকারের পক্ষে এককভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে ডেস্‌প্যাচে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে কিছু শর্তসাপেক্ষে অনুদান প্রদানের দ্বারা উৎসাহিত করার সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষক শিক্ষণ ঃ শিক্ষকদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সরকারি বৃত্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

বৃত্তি শিক্ষা ঃ শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ডেস্‌প্যাচে বৃত্তি শিক্ষার জন্য আইন। চিকিৎসা বিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করার সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য সুপারিশ ঃ ডেস্‌প্যাচে নারী শিক্ষা, অনগ্রসর মুসলিমদের শিক্ষার ও বিশেষ ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।

৮.৪.৫ সমালোচনা ঃ

ঐতিহাসিক জেমস্ বলেছেন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে, উডের ডেস্‌প্যাচে তা পরিণতি লাভ করেছে; পরে যা হয়েছে তার উৎসও এখানে। শিক্ষার সর্বনিম্ন ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। তবে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কিত দলিল রচনায় রচয়িতারা বণিক সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে নিন্দনীয় কাজ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ডেস্‌প্যাচ রচয়িতারা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। ঐতিহাসিক জেমস্ এই ডেস্‌প্যাচকে ম্যাগনা কার্টা বলে অভিনন্দিত করেছেন ঠিকই কিন্তু এতখানি প্রশংসা এর প্রাপ্য নয়। ম্যাগনা কার্টা বললে জনগণের কতগুলি অধিকারের সরকারী স্বীকৃতি বোঝায় কিন্তু উডের ডেস্‌প্যাচে শিক্ষা প্রসারের সদিচ্ছা থাকলেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হয় নি।

৮.৫ (ঘ) প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন (১৮৮২)

৮.৫.১ প্রেক্ষাপট ঃ

১৮৫৪ সালের ডেস্‌প্যাচের সুপারিশগুলি অবহেলা করে প্রাথমিক ও দেশজ শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করে শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষা ও সরকারি স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষা প্রসারিত হল। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন ঘটেনি। বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহদানের কথা ডেস্‌প্যাচে উল্লেখিত হলেও কার্যক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে। এছাড়াও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকগুলিই সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিল। এরকম পরিবেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮৫৪ খ্রিঃ থেকে সরকারি নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

তাই ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপন প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করলেন। বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়াম হান্টার এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন 'হান্টার কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করে।

৮.৫.২ কমিশনের বিচার্য বিষয় ঃ

১) ১৮৫৪ খ্রিঃ উডের ডেস্‌প্যাচের শিক্ষানীতি কার্যকর হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়।

২) বিশেষতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে সরকার কতটা অবহেলা করেছেন সে সম্পর্কে মতামত প্রদান করা।

৩) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান কি হবে তা নির্দিষ্ট করা। এবং

৪) বেসরকারি প্রচেষ্টার প্রতি সরকারি নীতি কি হবে তা স্থির করা।

৮.৫.৩ কমিশনের সুপারিশ ঃ

ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলির অবস্থা পরীক্ষা করে রিপোর্টে বলা হয় যে মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ১৮৫৪ খ্রিঃ ডেস্‌প্যাচে নির্দেশিত শিক্ষানীতির বিপরীত কাজ করেছে সরকারী প্রচেষ্টা/বাংলা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে এই নীতি কার্যকারী করার ক্ষেত্রে উন্নতি বা অবনতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় নি। স্থানীয় সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেনি। কমিশন তাই নতুন করে পরামর্শ দিলেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রটি বেসরকারি প্রচেষ্টার কাছে পুরোপুরি হস্তান্তরের জন্য ধীরে ধীরে সরকারকে সরে আসতে হবে এবং সরকারি অনুদান নীতিকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন বেসরকারি প্রচেষ্টা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসাহিত, সম্প্রসারিত ও বাস্তবায়িত হয়। এরপর কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সর্ম্পকে সুপারিশ করলেন।

৮.৫.৪ দেশীয় শিক্ষা ঃ

দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য দেশীয় লোকেদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করার সুপারিশ করা হয়। এই বিদ্যালয়গুলিকে উপেক্ষা না করে যতদূর সম্ভব সংস্কার সাধন করে শিক্ষা প্রসারে কাজে লাগাতে হবে। এই সব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন এবং পরিদর্শনের দায়িত্ব অর্পিত হবে মিউনিসিপ্যালিটি বা স্থানীয় বোর্ডের উপর। শিক্ষা-বিভাগও এই ধরনের বিদ্যালয়ের একটি তালিকা রাখবে। পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্যদানের রীতি প্রবর্তন করে দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।

৮.৫.৫ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

হান্টার কমিশনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা।

১। প্রশাসন ঃ ক) এক একটি জেলা বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড নিজ নিজ এলাকার বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

খ) এই স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বও ধীরে ধীরে অর্পণ করতে হবে।

গ) জেলা এবং মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক তহবিল গঠন করবেন।

ঘ) স্থানীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্বের মোট অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে।

ঙ) সরকার শিক্ষাখাতের তিন ভাগের এক ভাগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনুদান মঞ্জুর করবেন।

২। পাঠ্যসূচি ঃ ক) পাঠ্যসূচি হবে প্রয়োজন ভিত্তিক।

খ) পাঠ্যক্রমে থাকবে গণিত, হিসাব শিক্ষা, পরিমিতি প্রকৃতি বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, জমি জরীপ, শিল্প কলা, কৃষি ইত্যাদি।

গ) প্রাথমিক শিক্ষা হবে জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষায়।

ঘ) দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যায়ম, ড্রিল, দেশীয় খেলাধূলা ইত্যাদি।

৩। বিবিধ ঃ ক) শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার থাকবে।
খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বেতন গ্রহণ করা হবে। তবে কিছু দরিদ্র ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

৮.৫.৬ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপে ঃ

১। প্রশাসন ঃ ক) মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব কিছু আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে (গ্রান্ট-ইন-এড) ধীরে ধীরে বেসরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া।

খ) তবে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চমান সংরক্ষণের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে উচ্চমানের সরকারি আদর্শ বিদ্যালয় থাকবে।

গ) অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য সরকার নিজ নিয়ন্ত্রাধীণে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারে।

২। পাঠ্যক্রম ঃ ক) এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে তত্ত্বগত পঠন পাঠন। যুগের দাবি ছিল ব্যবহারিক শিক্ষা। কমিশন তাই পাঠ্যক্রমকে দুটি অংশে ভাগ করার পরামর্শ দেন। এ-কোর্স এবং বি-কোর্স। এ-কোর্সে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় এবং বি-কোর্সে থাকবে সাহিত্য বহির্ভূত কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয়।

খ) অষ্টম শ্রেণির পর শিক্ষার্থীরা নিজ ইচ্ছানুসারে এ অথবা বি-কোর্স বেছে নেবে।

৮.৫.৭ শিক্ষার মাধ্যম ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কমিশন কোন আলোচনা করেন নি। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে কমিশন ইংরেজি ভাষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন।

৮.৫.৮ শিক্ষক-শিক্ষণ ঃ

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কমিশন শিক্ষক শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য প্রতি মহকুমার একটি করে নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে। নর্মাল স্কুলে অন্যদের অপেক্ষা গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষাকাল হবে স্বল্পতর। শিক্ষকদের শিক্ষানীতি জানার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে শিক্ষানীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ শেখবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৮.৫.৯ উচ্চশিক্ষা ঃ

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়টি কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল না। তবুও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছিল।

ক) কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা।

খ) বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উদারভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

গ) কলেজগুলিতে সাহায্য করবার ক্ষেত্রে অধ্যাপক, পরিচালনার ব্যয়, কলেজে শিক্ষার মান, স্থানীয় উপযোগিতা, গ্রন্থাগার, ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি বিচার করা হবে।

ঘ) নির্দিষ্ট সংখ্যক দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হবে।

৮.৫.১০ বিশেষ শিক্ষা ঃ

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। তাদের জন্য অধিক সংখ্যক মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন ও মুসলমান পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

৮.৫.১১ নারী শিক্ষা ঃ

নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে উদারভাবে সাহায্য করার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক নর্মাল স্কুল স্থাপন এবং মহিলা পরিদর্শিকা নিয়োগের সুপারিশ করেন।

৮.৫.১২ সমালোচনা ঃ

প্রশ্ন ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ মূলত উড ও স্ট্যানলির শিক্ষা গীতিকেই সমর্থন করেছেন। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার অগ্রগতিকে সম্ভাবনাময় করেছিলেন সন্দেহ নেই।

কমিশনের দ্বিমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা (এ ও বি.কোর্স) ত্রুটিহীন করে বাস্তবায়িত হলে তার ফল সুদূর প্রসারী হতে পারত।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও এই শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কোন সুপারিশ করেননি।

জাতীয় শিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়রাই গ্রহণ করবে বলে কমিশন দেশীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেছিলেন।

৮.৬ (ঙ) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২)

৮.৬.১ প্রেক্ষাপট ঃ

১) উডের ডেস্‌প্যাচের নির্দেশ অনুসারে ১৮৫৭ খ্রিঃ তিনটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোন সংস্কার সাধিত হয়নি। হান্টার কমিশনে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের কোনও সুপারিশও করা হয়নি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের আওতার মধ্যে ছিল না।

২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না।

৩) বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেনেটের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে একটা বিরাট সংখ্যায় পরিণত হয়।

৪) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার ও পুণর্বিন্যাস জরুরি হয়ে ওঠে কারণ ইতিমধ্যেই লন্ডন রিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও পুনর্গঠন হয়ে গেছে।

৫) এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল পরীক্ষা গ্রহণ এবং কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষার মানোন্নয়ণ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সম্পূর্ণ অক্ষম এবং উদাসীন।

এই পরিস্থিতিতে ১৯০২ খ্রিঃ ২৭শে জানুয়ারি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয় লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে।

৮.৬.২ কমিশনের সুপারিশ ঃ

১) কমিশন মনে করেন দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত তখনও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী হয়নি।

২) কমিশন ভারতে বর্তমান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার বিরুদ্ধে সুপারিশ করেন। ওই সময়ে অনুমোদিত কলেজগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে দূরদূরান্তে অবস্থিত ছিল। কমিশন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সীমা নির্ধারণ করার সুপারিশ করেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব কমিশনের রিপোর্টে ছিল। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার দৃষ্টিভঙ্গি এতে নিহিত ছিল।

৩) কমিশন সুপারিশ করেন যে স্নাতক শিক্ষার দায়িত্ব অনুমোদিত কলেজগুলি গ্রহণ করবে এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার দায়িত্ব পালন করবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজে।

৪) বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়। সদস্যদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর এবং প্রতি বছর পাঁচভাগের এক ভাগ সদস্যের অবসর গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। কৃতবিদ্যা পণ্ডিত,

উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সিনেটে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সিন্ডিকেটে থাকবেন নয় থেকে পনেরো জন সভ্য। এরা সিনেটের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

৫) কমিশন কলেজের অনুমোদনের জন্য কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেবার সুপারিশ করেন। যেমন কলেজ সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা, শিক্ষার মান অক্ষুন্ন রাখা, কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা, নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত পরিচালন সমিতি ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিচার করে অনুমোদন দিতে হবে।

৬) দ্বিতীয় কোন কলেজকে অনুমোদন দেওয়া চলবে না। তবে অনুমোদিত দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজকে সামগ্রিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করতে হবে।

৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রভৃতি গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়।

৮) ইংরেজি ভাষায় এম. এ পরীক্ষার্থীকে মাতৃভাষা বা অন্য একটি প্রাচীন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভাষা পাঠ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৯) প্রবেশিকা পরীক্ষার মানোন্নয়ন করে ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষার বিলোপ এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

৮.৬.৩ সমালোচনা ঃ

১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের সদস্যরা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আইনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাঁদের স্বাধীন চিন্তার কোন প্রতিফলন কমিশনের রিপোর্টে ছিল না।

২) বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলি সংকীর্ণতাদুষ্ট। সামগ্রীকভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতি কমিশন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি।

৩) কার্জন চেয়েছিলেন শিক্ষা প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

৪) দক্ষ প্রশাসক হলেও কার্জন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। এদেশের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে অসহিষ্ণুতা নিয়ে তিনি শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা করে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন নি।

৫) তবে কলেজীয় শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের সুপারিশগুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

৮.৭ (চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৯)

৮.৭.১ প্রেক্ষাপট ঃ

লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংস্কারের পর দশ বছরের মধ্যে পুনরায় শিক্ষা কাঠামোর পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাস অনুভূত হল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নবরূপ পরিগ্রহ

করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দ্রুত প্রসারের ফলেই নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হয়। ইতিমধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধিত হওয়ায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের প্রয়োজন তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ জরুরি হয়ে ওঠে। তাই সরকার ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করলেন।

নতুন কমিশনে লিড্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি করে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নিয়োগ করলেন। এই কমিশন স্যাডলার কমিশন নামে সমধিক পরিচিত।

১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর সব স্তরের শিক্ষার বিস্তৃত আলোচনা সুদীর্ঘ এই রিপোর্টে স্থান পেয়েছে।

৮.৭.২ কমিশনের সুপারিশ ঃ

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে এই রিপোর্টে। সমসাময়িক মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করে কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশগুলি উপস্থাপন করেন।

(১) যেহেতু কলেজের প্রথম দু'বছরের পাঠ মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ তাই এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি পর্যায়ে হবে। প্রথমটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠের স্তর (ম্যাট্রিকুলেশন) এবং দ্বিতীয়টি হবে দু'বছরের ইন্টারমিডিয়েট স্তর। কলেজ প্রবেশের মাপকাঠি হবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।

(৩) ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকবে না। এর জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হবে।

(৪) মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথক বোর্ড গঠিত হবে। এতে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

(৫) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিতে ইংরেজি ও গণিত ছাড়া অন্য সব বিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পরিচালিত হবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি অনুধাবন করে কমিশনের সুচিন্তিত সুপারিশগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রকৃত শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে।

(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে কাজের চাপ কমানোর জন্য ঢাকায় একটি শিক্ষণধর্মী আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(৩) ইন্টারমিডিয়েটের পর স্নাতকশ্রেণীর পাঠ্যসূচী হবে তিন বছর ব্যাপী।

(৪) স্নাতকস্তরের পাশাপাশি অনার্স কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

(৫) স্নাতক ও ইন্টারমিডিয়েট স্তরে 'এডুকেশন' বিষয়টি পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) শিক্ষাকে কেবলমাত্র বক্তৃতাকেন্দ্রিক না করে টিউটোরিয়াল প্রভৃতির ব্যবস্থা করে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে ঘনিষ্ট করে তুলতে হবে।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে।

(৮) প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস করার জন্য সিনেট ও সিন্ডিকেটের পরিবর্তে কোর্ট এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (ছোট আয়তনের কার্যকরী সমিতি) গঠন করতে হবে।

(৯) সব সময়ের জন্য সচেতন উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে।

(১০) পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি কাজের জন্য একাডেমিক কাউন্সিল, বিভিন্ন বিষয়ের ফ্যাকাল্টি ও বোর্ড অফ স্টাডিজ সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(১১) শিক্ষক শিক্ষণের জন্য শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করতে হবে।

(১২) ছাত্র কল্যাণের জন্য একটি ছাত্র কল্যাণ পরিষদ স্থাপন করতে হবে।

(১৩) শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একজন শারীর শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

(গ) নারী শিক্ষা ঃ নারী শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের অভিমত।

(১) ১৫/১৬ বছরের হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের জন্য পর্দা স্কুল করা দরকার।

(২) মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ বোর্ড ও বিশেষ ধরণের পাঠ্যক্রম গঠন করতে হবে।

(ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কমিশন ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে স্থান দেবার নির্দেশ দেন।

৮.৭.৩ সমালোচনা ঃ

স্যাডলার কমিশনের বিবরণী এক মূল্যবান দলিল। ইতিপূর্বে এরকমভাবে কোনো শিক্ষা দলিল প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে শিক্ষার ক্রমবিকাশের উপর এর প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিল, তিন বছরের ডিগ্রীকোর্স, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বশাসিত করা, একাডেমিক কাউন্সিল, বোর্ড অফ স্টাডিজ, কোর্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, বৃত্তি শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের অভিমত আধুনিক কালের শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টাকে প্রভাবিত করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রিপোর্টটি তৈরি হলেও এর মূল্য সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল অপরিসীম। এই কারণে মেহিউ এই কমিশনের সুপারিশগুলিকে তথ্য ও পরামর্শের অফুরন্ত ভাণ্ডার বলে অভিহিত করেছেন।

৮.৮ (ছ) যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনা বা সার্জেন্ট রিপোর্ট (১৯৪৪)

৮.৮.১ প্রেক্ষাপট ঃ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৪ সালে ইংল্যান্ডে বাটলার আইন শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তাই ভারতবর্ষেও শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য যুদ্ধোত্তরকালের পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুকূল হতে থাকে। এই সময়ে স্যার জন সার্জেন্ট ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা। তাঁকে চেয়ারম্যান করে যুদ্ধোত্তর ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা এবং পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি সার্জেন্টের সক্রিয় ভূমিকায় ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এটি সার্জেন্ট রিপোর্ট হিসাবে প্রসিদ্ধ।

সার্জেন্ট রিপোর্ট কোন নতুন পরিকল্পনা নয় এবং ১৯১৭ সালের স্যাডলার কমিশনের সময় থেকে যে সব কমিটি গঠিত হয়েছিল তাদের সুপারিশ এবং তদানীন্তন বিভিন্ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনাটি রচিত হয়। লক্ষ্য ছিল ৪০ বছরের চেষ্টায় ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিক্ষামানের সমান করা।

৮.৮.২ সুপারিশ ঃ

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বহুমুখী দিক সম্পর্কে কমিটি বিভিন্ন সুপারিশ করেন।

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

(১) ৩ - ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য পৃথক নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নার্সারী শ্রেণিও খোলা হবে।

(২) এই শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হবে কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।

(৩) এই স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাভাবিক উপায়ে সামাজিক আচরণ বিধির সঙ্গে পরিচিতি।

(৪) ৬ - ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। এই শিক্ষাস্তর দুটি পর্যায়ে বিভক্ত হবে। ছয় থেকে এগারো বছর শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্ন বুনিয়াদী এবং এগারো থেকে চোদ্দ বছর শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ বুনিয়াদী স্তর। এই স্তরে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতি গৃহীত হলেও শিশুর শিল্প থেকে শিক্ষার ব্যয় বহনের নীতি স্বীকৃত হয়নি।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

(১) এই শিক্ষা হবে ছয় বছর ব্যাপী। ছাত্রদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে।

(২) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং ইংরাজিকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা হবে দুরকমের — বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একাডেমিক হাইস্কুল এবং ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল হাইস্কুল।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব নয় এবং ত্রুটি হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। এই শিক্ষার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এমন ব্যবস্থার কথা বলা হয়। এজন্য দুই ধরনের শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যসূচিও নির্ধারিত হয়।

(গ) উচ্চ শিক্ষা ঃ

(১) কেবল মেধাবী যোগ্য শিক্ষার্থীরাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।

(২) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজে থাকবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স।

(৩) স্নাতকোত্তর স্তরে থাকবে উচ্চমানের গবেষণাধর্মী শিক্ষা।

(৪) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিটির অনুকরণে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(ঘ) বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা ঃ এই শিক্ষাকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(১) কারিগরি ও শিল্প বাণিজ্যস্তরে স্নাতকোত্তর কোর্স। এখানে জাতীয় প্রতিনিধি স্থানীয় পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য মেধাবী ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষালাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষার কারিগরি কলেজে এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

(২) হায়ার টেকনিক্যাল স্কুল। এখানে ফোরম্যান, চার্জম্যান ও অন্যান্য অফিসাররা পড়াশুনা করে বিশেষ ডিপ্লোমা লাভ করবেন।

(৩) ছয় বছরের টেকনিক্যাল হাইস্কুল। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের পর শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হতে পারবে।

(৪) নিম্ন কারিগরি বা ট্রেড স্কুল। এখানে দু'বছরের কোর্স-এ উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে।

(ঙ) বয়স্ক শিক্ষা ঃ বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্য হবে দেশের প্রত্যেককে সুযোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তোলা। ১০-৪০ বছর বয়স্ক ব্যক্তিরা শিক্ষার সুযোগ পাবেন। ১০-১৬ বছর বয়স্কদের দিনের বেলায় পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষাকে মনোগ্রাহী করার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন, গ্রামোফোন, রেডিও, লোকসংগীত, নৃত্য ইত্যাদির সাহায্যে পাঠগ্রহণ ও পরিবেশন পরিচালিত হবে।

(চ) শিক্ষক শিক্ষণ ঃ এই পরিকল্পনায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রশিক্ষণের সুপারিশ ছিল। স্নাতক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ এবং নতুন শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। স্নাতক নন এমন শিক্ষকদের জন্য তিন ধরনের শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এগুলিতে প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং হাইস্কুলে স্নাতক নন এমন শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ লাভ করবেন।

(ছ) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ঃ সার্জেন্ট রিপোর্টে কালা, বোবা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনের সুপারিশ করা হয়।

(জ) **কর্মসংস্থা ঃ** সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষান্তে কর্মলাভের সুযোগ পায় সে জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

(ঝ) **প্রশাসন ঃ** শিক্ষার এই নতুন পরিকল্পনাকে কার্যকর করে তোলার জন্য কেন্দ্রে একটি সুদৃঢ় শিক্ষা বিভাগ খুলতে হবে। প্রদেশগুলিতেও তার নিজস্ব স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ থাকবে। জাতীয় শিক্ষার সুষ্ঠু রূপায়ণে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৮.৮.৩ সমালোচনা ঃ

এই পরিকল্পনাটির কঠোর সমালোচনা হয়। যদিও স্বাধীনতার উত্তরকালে সব শিক্ষা প্রয়াসই এই পরিকল্পনার কাছে ঋণী। নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ৪০ বছরের মেয়াদ অত্যন্ত দীর্ঘ।

(২) ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা অসম্ভব।

(৩) এই পরিকল্পনা শুধু আদর্শকে তুলে ধরেছে। লক্ষ্যে পৌঁছবার বিস্তৃত কর্মসূচি এতে নেই।

(৪) এই পরিকল্পনায় ইংল্যান্ডকে আদর্শ ধরে সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু ইংল্যান্ড ভারতের আদর্শ হতে পারে না। আর্থ-সামাজিক দিকে যে বড় প্রভেদ রয়েছে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

তবুও বলা যায় সার্জেন্ট রিপোর্ট জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসে অতি মূল্যবান দলিল।

৮.৯ প্রশ্নাবলী

১। বাংলা ও বিহারে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে রেভারেন্ড অ্যাডামের সমীক্ষা ও সুপারিশগুলি বর্ণনা করুন।

২। অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৩। চুঁইয়ে পড়া নীতি কী?

৪। অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টে কোন কোন অঞ্চলের সমীক্ষা করা হয়েছিল?

৫। মেকলের মন্তব্য বলতে কী বোঝায়? কীভাবে মেকলের মন্তব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়?

৬। শিক্ষার বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের প্রধান বিরোধগুলি চিহ্নিত কর।

৭। উডের ডেস্‌প্যাচের প্রধান সুপারিশগুলি আলোচনা কর। এই দলিলকে কি ম্যাগনা কার্টার সঙ্গে তুলনা করা যায়?

৮। ১৮৫৪ সালের ডেস্‌প্যাচের পটভূমি কী ছিল?

৯। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে হান্টার কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি বিবৃত কর। এগুলি কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছিল?

১০। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি এবং তার বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১১। কার্জনের শিক্ষা সংস্কারগুলি বিচার কর এবং ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান আলোচনা করুন।

১২। স্যাডলার কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১৩। ইন্টারমিডিয়েট কোর্স শুরু করার ক্ষেত্রে স্যাডলার কমিশনের অভিমতগুলির উল্লেখ করুন।

১৪। যুদ্ধোত্তর ভারতে শিক্ষার বিকাশ প্রসঙ্গে সার্জেন্ট পরিকল্পনাটির মূল্যায়ণ করুন।

১৫। সার্জেন্ট রিপোর্ট-এ উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলি বিবৃত করুন।

৮.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

- বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ (১৯৯৫), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, সেন্ট্রল লাইব্রেরি, কলিকাতা-৭৩
- ঘোষ, রণজিৎ (২০০০), আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা- ৯
- Naik, J.P and Nurullah, S., History of Education in India.
- Rawat, P.L, History of Indian Education.

একক ৯ ❑ স্বাধীন ভারতবর্ষে বিশেষভাবে শিক্ষা প্রচেষ্টা

গঠন ঃ

৯.১ সূচনা

৯.২ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা রাধাকৃষ্ণ কমিশন (১৯৪০-১৯৪৯)

৯.২.১ প্রেক্ষাপট

৯.২.২ শিক্ষার উদ্দেশ্য

৯.২.৩ শিক্ষার পাঠক্রম

৯.২.৪ শিক্ষার মান

৯.২.৫ ধর্ম শিক্ষা

৯.২.৬ ছাত্র কল্যাণ

৯.২.৭ নারী শিক্ষা

৯.২.৮ শিক্ষার মাধ্যম

৯.২.৯ শিক্ষক

৯.২.১০ মূল্যায়ণ

৯.২.১১ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

৯.২.১২ ব্যয় নির্বাহ

৯.২.১৩ সমালোচনা

৯.৩ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-১৯৫৩)

৯.৩.১ প্রেক্ষাপট

৯.৩.২ সুপারিশ

৯.৩.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

৯.৩.৪ কারিগরি শিক্ষা

৯.৩.৫ নারীশিক্ষা ও সহশিক্ষা

৯.৩.৬ ভাষা শিক্ষা

৯.৩.৭ পাঠক্রম

৯.৩.৮ শিক্ষাদান পদ্ধতি

৯.৩.৯ চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষা

৯.৩.১০ নির্দেশনা ও পরামর্শদান

৯.৩.১১ ছাত্র কল্যাণ

৯.৩.১২ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

৯.৩.১৩ শিক্ষকের উন্নতি

৯.৩.১৪ প্রশাসন

৯.৩.১৫ সমালোচনা

৯.৪ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন (১৯৪৬-১৯৬৬)
৯.৪.১ প্রেক্ষাপট
৯.৪.২ সুপারিশ
৯.৪.৩ প্রাক্-প্রাথমিক স্তর
৯.৪.৪ প্রাথমিক স্তর
৯.৪.৫ নিম্ন প্রাথমিক স্তর (১থ-৪র্থ শ্রেণি)
৯.৪.৬ নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম
৯.৪.৭ উচ্চ প্রাথমিক স্তর (৫ম-৭ম শ্রেণি)
৯.৪.৮ উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম
৯.৪.৯ মাধ্যমিক স্তর
৯.৪.১০ নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (৮ম-১০ম শ্রেণি)
৯.৪.১১ নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম
৯.৪.১২ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর
৯.৪.১৩ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম
৯.৪.১৪ উচ্চ শিক্ষা
৯.৪.১৫ শিক্ষক প্রশিক্ষণ
৯.৪.১৬ উচ্চশিক্ষাস্তরের শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতি
৯.৪.১৭ বিদ্যালয় গুচ্ছ
৯.৪.১৮ বয়স্ক শিক্ষা
৯.৪.১৯ মূল্যায়ন
৯.৪.২০ প্রশাসন
৯.৪.২১ সমালোচনা
৯.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং পরবর্তী অগ্রগতি
৯.৫.১ সমালোচনা
৯.৬ জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) পরবর্তী অগ্রগতি
৯.৬.১ অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড
৯.৭ প্রশ্নাবলী

৯.১ সূচনা ঃ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ব্রিটিশের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেল। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে শুরু হল নতুন তৎপরতা। এমন এক শিক্ষা ধারার কথা ভাবা হল যা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং আগামী দিনের জন্য সক্ষমতা দান করতে পারে। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ বাতিল করা সম্ভব হল না। স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতীয় ভিত্তিতে সেই ব্যবস্থারই পুনর্গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এজন্য ভারত সরকার বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠন করলেন।

৯.২ (ক) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-১৯৪৯)

৯.২.১ প্রেক্ষাপট ঃ

স্বাধীনতা লাভের পর সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তিত নতুন পটভূমিতে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি সাধনের উপলব্ধি করেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়। ভারত সরকারের কাছে কমিশন তার সুপারিশ পেশ করেন ১৯৪৯ সালে। ভারতের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে কমিশনের সুপারিশগুলি একখানি মূল্যবান দলিল।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার মান, ধর্ম শিক্ষা, ছাত্র কল্যাণ, নারী শিক্ষা, মূল্যায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে সব সুপারিশ করেন তা নিচে বর্ণিত হল।

৯.২.২ শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি কমিশন চিহ্নিত করেছেন।
- নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা কর— স্বাধীন ভারতের রাজনীতি, প্রশাসন, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব প্রদান করবে। নেতৃত্বদানের জন্য যোগ্য ব্যক্তি সৃষ্টি হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
- ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করা— ভারতবর্ষের মতো দেশে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মূল্য বেশি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মূল্যবোধ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জ্ঞানের চর্চা ও নতুন জ্ঞান-সৃষ্টিতে সহায়তা করা— বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু উন্নত জ্ঞান চর্চাই হবে না। প্রয়োজনীয় নতুন জ্ঞানের উন্মোচনের ব্যবস্থা থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে।
- গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার— বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া। গণতন্ত্রের মূল কথা হল স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায় বিচার ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বাধীন ও স্বশাসিত। এখানে অধ্যাপকদের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকবে। সকলের শিক্ষার সমান অধিকার থাকবে। সৌভ্রাতৃত্ববাধ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীকে অন্য রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। দারিদ্র, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা দূরীকরণের যোগ্য মানুষ তৈরি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে।
- কৃষ্টির সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জ্ঞানের সংরক্ষণ ও প্রসারের কাজ হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ই সভ্যতার বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানব জাতির বৌদ্ধ ও নৈতিক জ্ঞান সঞ্চারণ হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ।

৯.২.৩ শিক্ষার পাঠক্রম ঃ

কমিশন সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেছেন।

সাধারণ শিক্ষা ঃ

- ১২ বছর বিদ্যালয় বা সমতুল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবেন।
- পাশ ও অনার্স উভয় ও শ্রেণির জন্য ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স থাকবে। পাশ কোর্সের ছাত্ররা দু বছর পর এবং অনার্স কোর্সের ছাত্ররা ১ বছর পরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ কমিশন পেশাগত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরত্ব দিয়েছেন। পেশাগত মনোভাব নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তুতিতেই পেশাগত শিক্ষা বলা হয়েছে। মোট ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

- **কৃষি**— কৃষি শিক্ষাকে কার্যকরী করার জন্য নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। কৃষি উন্নতির জন্য গবেষণাগার ও কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- **বাণিজ্য**— বাণিজ্যের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফার্মে হাতে কলমে কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। বাণিজ্যে স্নাতক হবার পর শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। এম. কম পাঠ্যক্রম হবে ব্যবহারিক।
- **শিক্ষাতত্ত্ব**— শিক্ষা বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষার তাত্ত্বিক বিষয়গুলি হবে নমনীয় এবং আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ব্যবহারিক শিক্ষণ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। অধ্যাপকদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- **ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান**— ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উন্নতির জন্য উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ছাত্ররা যাতে হাতে কলমে কারখানার কাজ শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ফোরম্যান, ড্রাফ্টম্যান, ওভারসিয়ার তৈরির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কারিগরি ফ্যাকাল্টি থাকবে।
- **আইন**— আইন বিষয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু হবে। এখানে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স পাশ করতে হবে। আইন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।
- **চিকিৎসা বিদ্যা**— মেডিকেল কলেজগুলির সর্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা হবে ১০০। মেডিকেল কলেজ হবে হাসপাতাল সংলগ্ন। প্রতি ছাত্রের জন্য ১০টি রোগীর শয্যা নির্দিষ্ট থাকবে। গ্রামীণ কেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। দেশজ পদ্ধতির উপর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থা থাকবে।

৯.২.৪ শিক্ষার মান ঃ

- শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে।
- উচ্চবিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উজ্জীবনী কোর্স এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে ৩০০ এর বেশি শিক্ষার্থী নেওয়া চলবে না। কলেজগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে ১৫০০ এর মধ্যে।
- পরীক্ষার দিনগুলি ছাড়া সারা বছর কাজের দিন হবে ১৮০।
- গ্রন্থাগারের সুব্যবস্থা থাকবে। গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে।

৯.২.৫ ধর্ম শিক্ষা ঃ

কমিশনের মতে ভারতে ধর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষা হতে পারে না। এজন্য কমিশনের সুপারিশগুলি ছিল নিম্নরূপ—

- দৈনন্দিন কাজ শুরুর আগে নীরবে ধ্যান করে চিত্ত সংযত করতে হবে।
- ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছরে ধর্মগুরুদের জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে।
- ডিগ্রি কোর্সের দ্বিতীয় বছরে শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে সর্বজননী আবেদনপূর্ণ বাণী আলোচিত হবে।
- ডিগ্রি কোর্সের তৃতীয় বছরে ধর্মতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা থাকবে।

৯.২.৬ ছাত্র কল্যাণ ঃ

- ছাত্রদের কল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে।
- ছাত্রদের সমাজ কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে।
- বছরে অন্তত একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শরীর শিক্ষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকবে।

৯.২.৭ নারী শিক্ষা ঃ

- নারী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সুযোগ, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিতে হবে।
- গার্হস্থ অর্থনীতি ও পরিবার পরিচালনা বিষয় পড়ার ব্যবস্থা থাকবে।
- অধ্যাপিকাদের বেতন অধ্যাপকদের সমান হবে।

৯.২.৮ শিক্ষার মাধ্যম ঃ

- আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হবে।
- সর্বভারতীয় ভাষা হবে হিন্দী।
- উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তিনটি ভাষা জানতে হবে— আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং ইংরাজি।
- বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজির পরিবর্তে একটি ভারতীয় ভাষাকে (সংস্কৃত বাদে) গ্রহণ করতে হবে।

৯.২.৯ শিক্ষক ঃ

- শিক্ষক হবেন উন্নত চরিত্র,জ্ঞানী এবং দক্ষ।
- তিনি তাঁর আদর্শ ও কতর্ব্য সম্পর্কে সচেতন হবেন।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার কমিশন শিক্ষকদের প্রফেসর, রীডার, লেকচারার, ইনস্ট্রাকটর এই চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেন।
- শিক্ষকদের পদোন্নতি নির্ভর করবে তাঁদের দক্ষতা ও পান্ডিত্যের উপর।
- শিক্ষকদের সাধারণ অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৬০ বছর। কর্মক্ষমতা বিচার করে আরও ৪ বছর বৃদ্ধি কার যেতে পারে।

৯.২.১০ মূল্যায়ন ঃ

- রচনাধর্মী প্রশ্নের বদলে বস্তুধর্মী প্রশ্নকে শ্রেয় মনে করা হয়েছে।
- এক তৃতীয়াংশ নম্বর দিতে হবে সম্বৎসরের আভ্যন্তরীণ কাজের ভিত্তিতে।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সমতা রাখতে হবে।
- মৌখিক পরীক্ষা চালু করতে হবে।
- অনুগ্রহ নম্বর প্রথা তুলে দিতে হবে।
- ১ম, ২য়, ৩য় বিভাগে পাশ নম্বর হবে যথাক্রমে শতকরা ৭০, ৫৫ ও ৪০ নম্বর।

৯.২.১১ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঃ

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয়কেই নিতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করেব না। এখানে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকবে।

- বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য থাকবে— পরিদর্শক, আচার্য, উপাচার্য, সিনেট বা কোর্ট, সিন্ডিকেট বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাল্টিস, বোর্ড অফ স্টাডিজ, ফিনান্স কমিটি, সিলেকসন কমিটি।

৯.২.১২ ব্যয় নির্বাহ ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করেন যে সরকারকেই ব্যয়ভার বহন করতে হবে। বেসরকারি কলেজগুলিকে সরকারি কলেজের সমান অর্থ সাহায্য করতে হবে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ঃ রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের একটি বিশেষ দিক ছিল গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। কমিশনের মতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রাম জীবনের সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়। তাই শিক্ষায় সর্বজনীনতা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম-জীবনের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষা যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করেন।

সংগঠন ঃ গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক রূপটি নিম্নরূপ।

- প্রাথমিক স্তরে ৮ বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা।
- পরবর্তী ৩ বছর কলেজীয় শিক্ষা।
- সবশেষে ২ বছর উত্তর কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

প্রাথমিক স্তর ঃ কমিশন নতুন করে প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। কারণ ইতিপূর্বে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তর ঃ
- বিদ্যালয় শিক্ষা হবে আবাসিক।
- আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩০-৬০ একর জমি নির্দিষ্ট থাকবে। এর মধ্যে বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষকদের বাসগৃহ, খেলার মাঠ, কর্মশালা, কৃষিক্ষেত্র, পশুচারণ ক্ষেত্র, ছাত্রাবাস ইত্যাদি থাকবে।
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি হবে না।
- শতকরা ৫০ ভাগ আলোচনা হবে তাত্ত্বিক এবং বাকি ৫০ ভাগ হবে হাতে কলমে শিক্ষা।
- বিদ্যালয়-এলাকাটি একটি আদর্শ-পল্লীর মত পরিকল্পিত হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর ঃ
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।
- গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কয়েকটি গ্রামীণ কলেজ থাকবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে যার সঙ্গে গ্রামের যোগ আছে।
- প্রত্যেক কলেজে ৩০০-র বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না।

- পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়গুলি হবে দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্বঃ, অর্থশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি।
- গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ভারাক্রান্ত হবে না।

৯.২.১৩ সমালোচনা ঃ

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের প্রতিবেদনটি স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে এক ঐতিহ্যপূর্ণ তথ্যবহুল যুগান্তকারী দলিল। কমিশন উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে নব ভারত গঠনের মৌলিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষে উন্নত কৃষিবিদ্যার অনুশীলনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাকে সুদৃঢ় করা হয়েছে কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে। কমিশন সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করে উচ্চ শিক্ষার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানকল্পে সুপারিশগুলি সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে ধর্মশিক্ষা, নারী শিক্ষা, টোল-মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল না।

তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ভারতের উচ্চ শিক্ষার রূপান্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।

৯.৩ সমালোচনা ঃ (খ) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-১৯৫৩)

৯.৩.১ প্রেক্ষাপট ঃ

১৯৪৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্বশর্ত হল মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন। স্বাধীনতার পর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা বিচারের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন।

এই প্রস্তাব অনুসারে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৫২ সালে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সবদিক বিচার করে এই কমিশন ১৯৫৩ সালে তার রিপোর্ট পেশ করে।

৯.৩.২ সুপারিশ ঃ

১। শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে।

- প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি।
- ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ।
- যুব সমাজের চরিত্র গঠন।

- উৎপাদনী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা।
- নেতৃত্বের শিক্ষণ দান।

৯.৩.৩ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কার সাধনের জন্য নিম্নলিখিত সংস্কার সাধনের সুপারিশ করে।

- ৪/৫ বছরের প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষাগ্রহণ করার পর শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতে পারবে।

- মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি স্তরে বিভক্ত থাকবে। (ক) নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তর হবে ৩ বছরের জন্য এবং (খ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হবে চার বছরের জন্য। অর্থাৎ কমিশনের প্রস্তাব ছিল মোট ১২ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা। কিন্তু পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে কমিশন ১২ বছরের পরিবর্তে ১১ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার সুপারিশ করেন।

(I + II + III + IV + V)	=	৫ বছরের প্রাথমিক বা নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষা।
(VI + VII + VIII)	=	৩ বছরের নিম্নমাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা।
(IX + X + XI)	=	৩ বছরের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা।
		১১ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা।

- ইন্টারমিডিয়েট কোর্স বিলোপ করে এই কোর্সের ১ বছর উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যুক্ত হবে এবং অপর ১টি বছর যুক্ত হবে ডিগ্রী কোর্সের সঙ্গে ডিগ্রী।
- ডিগ্রী কোর্সের সময়কাল হবে ৩ বছরের।
- শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- বৃত্তিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১ বছরের প্রাক্-বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করতে হবে।
- প্রতিটি রাজ্য সরকারকে গ্রামীণ বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে কৃষি, পশুপালন, কুটির শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৯.৩.৪ কারিগরি শিক্ষা ঃ

- বহুমুখী বিদ্যালয়ের সঙ্গে অথবা আলাদাভাবে বেশি সংখ্যায় কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলির পাশাপাশি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রযুক্তিতে নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সংস্থার সহায়তা নিতে হবে।

৯.৩.৫ নারীশিক্ষা ও সহশিক্ষা ঃ

মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন না করে ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে সবরকম শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। কমিশনের মত হল অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষা পেলে মেয়েরা পরিবার ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

৯.৩.৬ ভাষা শিক্ষা ঃ

- ভারতের সর্বত্র মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যমে হবে আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা।
- নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অন্তত দুটি ভাষা শিখতে হবে। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের পর ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা শিখবে। কিন্তু এক বছরে দুটি ভাষা শেখানো যাবে না।
- উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে অন্তত দুটি ভাষা পাঠ্য হবে। এর মধ্যে একটি হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তিনটি ভাষা (আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, ইংরেজি বা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা এবং হিন্দি ভাষা বা অন্য একটি ভারতীয় ভাষা হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলের জন্য) শিক্ষা করতে হবে।

৯.৩.৭ পাঠ্যক্রম ঃ

- কমিশন সুপারিশ করেন যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম হবে সকল শিক্ষার্থীর জন্য অভিন্ন।
- উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম রচিত হবে বিশেষীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে।
- উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম হবে দুই ভাগে বিভক্ত। আবশ্যিক পাঠ ও ঐচ্ছিক পাঠ। ঐচ্ছিক পাঠ। ঐচ্ছিক বিষয় থেকে শিক্ষার্থী যে কোন একটি বিষয় বেছে নিতে পারে।
- নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) যে বিষয়গুলির সুপারিশ করা হয় সেগুলি হল—ক) মাতৃভাষা, হিন্দি ও ইংরেজি, খ) সমাজবিদ্যা, গ) সাধারণ বিজ্ঞান, ঘ) অংক, ঙ) শিল্প ও সঙ্গীত, চ) হাতের কাজ এবং ছ) শারীর শিক্ষা।
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয়গুলি হল—ক) তিনটি ভাষা (মাতৃভাষা, হিন্দি ও ইংরেজি), খ) সমাজবিদ্যা, গ) সাধারণ বিজ্ঞান, ঘ) অঙ্ক, ঙ) হস্তশিল্প।
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি হল—ক) মানবিক বিদ্যা, খ) বিজ্ঞান, গ) কারিগরি বিদ্যা, ঘ) বাণিজ্য, ঙ) কৃষিবিদ্যা, চ) চারুকলা এবং ছ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

৯৩.৮ শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ

- গতানুগতিক মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সক্রিয়ভাবে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের সুযোগ প্রদান করা।
- গতিশীল শিক্ষাদান পদ্ধতির সাহায্যে সকল রকম মেধার ছাত্রছাত্রীদের পাঠগ্রহণে সহায়তা করা।

৯.৩.৯ চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষা ঃ

শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশের জন্য কমিশন যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল—শৃঙ্খলা, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি।

৯.৩.১০ নির্দেশনা ও পরামর্শদান ঃ

কমিশন শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ব্যবস্থার জন্য যে সব সুপারিশ করেন তা হল—

- কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা ও পরামর্শের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- বিভিন্ন শিক্ষাধারার ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেখাতে হবে যাতে প্রত্যেকে বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।
- প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড্যান্স অফিসার ও কেরিয়ার মাস্টার নিয়োগ করতে হবে।

৯.৩.১১ ছাত্র কল্যাণ ঃ

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি উল্লেখযোগ্য।

- বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।
- বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।
- বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে 'ফার্স্ট এইড' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে খেলাধূলা বিশেষত দলগত খেলাধূলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৯.৩.১২ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়।

- বহিঃ পরীক্ষা কমিয়ে দিয়ে রচনাধর্মী পরীক্ষার পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রচলন করতে হবে।

- পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা নির্ভরযোগ্য করে তুলতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নতির জন্য বহিঃপরীক্ষার সঙ্গে স্কুল রেকর্ড (ধারাবাহিক বিবরণী পত্রে সংরক্ষিত) ও আন্ত পরীক্ষার ফলাফলকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে।
- স্কুল রেকর্ডে সাংখ্যমানের পরিবর্তে A B C D ইত্যাদি প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে গ্রেডিং ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।
- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষে একটি মাত্র বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৯.৩.১৩ শিক্ষকের উন্নতি ঃ

কমিশন শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি পেশ করেন।

- শিক্ষক নিয়োগের নীতি সর্বক্ষেত্রে একইরকম হবে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পরীক্ষাধীন সময় হবে ১ বছর।
- শিক্ষকদের জন্য পেনসন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, জীবনবিমা প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- শিক্ষকদের অবসরগ্রহণের বয়স হবে ৬০ বছর।
- শিক্ষকদের সন্তানসন্ততিরা বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে।
- মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণকাল হবে ২ বছর এবং স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষকদের জন্য এই সময়কাল হবে ১ বছর।

৯.৩.১৪ প্রশাসন ঃ

সুপরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি পেশ করেন।

- মাধ্যমিক শিক্ষার যাবতীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করবে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ যার সদস্যসংখ্যা হবে অনধিক ২৫ জন। শিক্ষা অধিকর্তা এর সভাপতি হবেন।
- পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতিটি রাজ্যে রাজ্য শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।
- বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে।
- কোন শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০-৪০-এর বেশি হবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫০০-৭৫০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
- প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ৬ দিন পড়াশোনা হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ের একটি পরিচালন সমিতি থাকবে।

৯.৩.১৫ সমালোচনা ঃ

মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশগুলি তদানীন্তন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন মাল্টিপারপাস বা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়েছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুধুমাত্র পরবর্তী শিক্ষা স্তরে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসাবে না দেখে কমিশন একে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করেছেন, এটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কৃষি, বাণিজ্য, যন্ত্রশিল্প শিক্ষার সুপারিশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল।

কিন্তু আদর্শগত বিচারে কমিশনের সুপারিশগুলি সুষ্ঠু হলেও ব্যবহারিক বিচারে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

- সুপারিশগুলির মধ্যে সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি ছিল অতি সাধারণ ধরণের।
- বহুমুখী পাঠ্যক্রমের জন্য যে অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত জরুরী একথা কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে যে এটা অসম্ভব ছিল তা স্বীকার করা হয়নি।
- অতি দ্রুত বিশেষীকরণের ফলে অষ্টম শ্রেণি পাশ করা শিক্ষার্থীরা নিজস্ব চাহিদা ও ক্ষমতা অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়।
- কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য যে বিশালসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক প্রয়োজন ছিল তা যোগানের কোন সুস্পষ্ট সুপারিশ কমিশন করেননি।

যাই হোক, মুদালিয়ার কমিশনের সুসংহত রিপোর্ট স্বাধীন ভারতে পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৯.৪ (গ) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-১৯৬৬)

৯.৪.১ প্রেক্ষাপট ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ভারতবর্ষে দেখা দেয় আদর্শের সংকট। যেহেতু শিক্ষাই জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতির মূল অস্ত্র সেহেতু জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল উদ্দেশ্যমুখী, উন্নতমানের সহজলভ্য শিক্ষা। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি সকল স্তরকে একসঙ্গে সুবিবেচনা ও পর্যালোচনার জন্য কোন কমিশন গঠিত হয়নি।

তাই শিক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পুনর্গঠনের জন্য সরকারি প্রস্তাবে ১৭ জন সদস্য নিয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪ সালের ১৪ই জুলাই গঠিত হয়। অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারী কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন কোঠারী কমিশন নামে পরিচিত। ২১ মাস দীর্ঘ পরিশ্রমের পর ১৯৬৬ সালের জুন মাসে কমিশন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলার কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ গবেষণার স্তর এবং সমস্ত ধরনের শিক্ষার কথা স্থান পেয়েছে।

৯.৪.২ সুপারিশ ঃ

শিক্ষা কাঠামো ঃ কমিশন শিক্ষার নতুন কাঠামোর প্রস্তাব করেন।

১। ১-৩ বছরের প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা।

২। ৭ বা ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। ৪ বা ৫ বছরের নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৩ বা ২ বছরের উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা।

৩। ৩ বা ২ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা।

৪। ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা অথবা ১ বছরের থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা।

৫। উচ্চশিক্ষার স্তরে ৩ বছরের বা তার চেয়ে বেশী সময়ের শিক্ষান্তে প্রথম ডিগ্রী লাভের শিক্ষা।

৬। দ্বিতীয় ডিগ্রী লাভের জন্য শিক্ষাকাল ভিন্নতর হবে।

৭। সার্বিক শিক্ষা কাঠামোটি হবে ১০+২+৩+২

৯.৪.৩ প্রাক্-প্রাথমিক স্তর ঃ

১। প্রাক্ প্রাথমিক স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব বা অঙ্গ হিসাবে ধরা চলে।

২। প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অধীন একটি করে রাজ্যস্তরের উন্নয়ন সংস্থা থাকবে।

৩। এই স্তরের জন্য বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হবে।

৪। শিক্ষকদের যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য সরকারকেই চেষ্টা করতে হবে।

৫। শিক্ষার উপকরণ ও পুস্তকাদি এবং অনুদান সরকারকে দিতে হবে।

৯.৪.৪ প্রাথমিক স্তর ঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর ভর্তির বয়স সাধারণত ৬+ বছরের কম হবে না।

৯.৪.৫ নিম্ন প্রাথমিক স্তর (১থ-৪র্থ শ্রেণি) ঃ

১। এই স্তরে কেবল মাতৃভাষার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২। ভাষা ছাড়া প্রাথমিক গণিত ও প্রকৃতিপাঠও যুক্ত হবে।

৩। শিশুকে সমাজচেতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমাজ সেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই স্তরে কর্মপরিচিতির জন্য কাগজের কাজ, মাটির কাজ, সুতোকাটা প্রভৃতি নানা ধরণের কাজকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

৪। প্রতি শ্রেণির শেষে বাৎসরিক পরীক্ষার বদলে ১ম ও ২য় শ্রেণিকে একটি চক্র হিসাবে বিবেচনা করে দু বছরের শেষে একটি পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিকেও একটা চক্র হিসাবে ধরা যেতে পারে।

৫। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক।

৯.৪.৬ নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম ঃ

১। একটি ভাষা (মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা), ২। গণিত, ৩। পরিবেশ পরিচিতি, ৪। সৃজনশীল কাজ, ৫। কর্মঅভিজ্ঞতা এবং সমাজ সেবা, ৬। স্বাস্থ্য শিক্ষা। ক্রস্থস্কন্ত বক্র অন্তস্থ কৃষ্ম উক্ত

৯.৪.৭ উচ্চ প্রাথমিক স্তর (৫ম-৭ম শ্রেণি) ঃ

১। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বিষয় হবে অপেক্ষাকৃত গভীর।

২। পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে থাকবে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দী কিম্বা সহযোগী ভাষা ইংরাজি।

৩। তৃতীয় একটি ভাষাকে ঐচ্ছিকভাবে নেওয়া চলবে।

৪। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে পৃথক পৃথক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫। মিশ্রিত সমাজবিদ্যার পরিবর্তে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতিও পাঠ্যক্রমে থাকবে।

৬। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ও সমাজ সেবা ও কর্মপরিচিতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭। উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা হবে আভ্যন্তরীণ।

৯.৪.৮ উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম ঃ

১। দুটি ভাষা—(ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

খ) হিন্দী অথবা ইংরাজি (একটি তৃতীয় ভাষা-ঐচ্ছিক)

২। গণিত, ৩। বিজ্ঞান (ভৌত বিজ্ঞান ও জীরন বিজ্ঞান), ৪। সমাজবিদ্যা (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান), ৫। কলা, ৬। কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা, ৭। শারীর শিক্ষা, ৮। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

৯.৪.৯ মাধ্যমিক স্তর ঃ

কমিশনের রিপোর্টে পরস্পর সংযুক্ত দুটি স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

৯.৪.১০ নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (৮ম-১০ম শ্রেণি) ঃ

১। উচ্চ প্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে আরও গভীরভাবে পড়তে হবে।

২। পাঠ্যক্রমে থাকবে ৩টি ভাষা—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় অথবা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

৩। গণিত ও বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা এবং ভূমিবিজ্ঞান হবে আবশ্যিক পাঠ্য।

৪। ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান আলাদা আলাদাভাবে পড়ানো হবে।

৫। শারীর শিক্ষা, কলা ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬। সমাজসেবার জন্য এই স্তরে উন্নয়নমূলক কর্ম বাধ্যতামূলক।

৭। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে বিশেষীকরণের সুযোগ থাকবে না। পাঠ্যক্রম হবে অভিন্ন সাধারণ চরিত্রের।

৮। দশম শ্রেণির সাধারণ পাঠ সমাপ্তির পর হবে সাধারণ বহিঃপরীক্ষা।

৯.৪.১১ নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম ঃ

১। তিনটি ভাষা (মাতৃভাষা, হিন্দী, ইংরাজি এবং একটি প্রাচীন ভাষা অতিরিক্ত ঐচ্ছিক হিসাবে), ২। অংক, ৩। বিজ্ঞান (ভৌত ও প্রাণিবিজ্ঞান), ৪। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, ৫। কারুশিল্প, ৬। কর্ম অভিজ্ঞতা, ৭। সমাজসেবা, ৮। শারীর শিক্ষা, ৯। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা।

৯.৪.১২ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ঃ

১। পূর্বের সাধারণধর্মী শিক্ষাকে দৃঢ়তর ও প্রসারিত করা এবং ঐচ্ছিক পাঠের মাধ্যমে বিশেষীকরণের সূচনা করাই হবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ২ বছরের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

২। এই স্তরের পাঠ্যক্রমে থাকবে ২টি ভাষা ও ৩টি ঐচ্ছিক বিষয়।

৩। ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকবে। মিশ্র বিষয় নেওয়া যাবে।

৪। কৃষি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে স্থান দিতে হবে।

৫। মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম থাকবে না। তবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সংগীত, কলা প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় পাঠের সুযোগ থাকবে।

৬। সমাজ সেবার জন্য থাকবে শ্রম ও সমাজসেবা শিবির।

৭। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ২ বছরের শিক্ষান্তে বহিঃপরীক্ষা হবে। শংসাপত্র দেবে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

৮। নিম্নমাধ্যমিক উন্নীত সব শিক্ষার্থীই সাধারণ শিক্ষা পাবে না। আশা করা হয় ৫০% শিক্ষার্থী বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৯। বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হবে কলকারখানার আংশিক সময়ে, পলিটেকনিকে পূর্ণ সময়ে এবং আই-আই-টিতে স্যান্ডউইচ কোর্সের সাহায্যে।

৯.৪.১৩ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম ঃ

১। যে কোন দুটি ভাষা, ২। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি থেকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যে কোন ৩টি বিষয় ঃ একটি অতিরিক্ত ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, শিল্প, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, প্রাণীবিদ্যা, ভূমিবিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। ৩। কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজ সেবা, ৪। শারীর শিক্ষা, ৫। কলা অথবা শিল্প, ৬। নৈতিক ও অধ্যাত্মিক শিক্ষা।

৯.৪.১৪ উচ্চ শিক্ষা ঃ

কমিশন উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

ক) **উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ঃ** ১। জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।

২। বয়স্ক শিক্ষা, আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং পত্রযোগে শিক্ষার প্রবর্তন করা।

৩। বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মানোন্নয়নে সাহায্য করা।

৪। শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন। এবং

৫। কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্ন্তজাতিক শিক্ষা মানের স্তরে উন্নীত করা।

খ) প্রথম ডিগ্রি প্রাপ্তির শিক্ষাকাল ৩ বছরের কম হবে না। পরবর্তী ডিগ্রির শিক্ষাকাল ২ বা ৩ বছরের হবে।

গ) ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছরের শেষে নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে কিছু কিছু বিষয়ে ৩ বছরের বিশেষ ডিগ্রি কোর্সের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে প্রথম ডিগ্রি পেতে হলে ৪ বছরে পড়তে হবে।

ঘ) প্রচলিত কোর্স ও দীর্ঘতর নতুন কোর্সের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা হবে।

ঙ) কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য নির্বাচিত বিষয়ে উন্নত স্নাতক কোর্স খোলা যেতে পারে।

চ) স্নাতক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হিন্দি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে মাধ্যম হবে ইংরেজি।

ছ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গ্রন্থ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে সহায়তা করতে হবে।

জ) অধ্যাপক সংখ্যা না বাড়িয়ে, খরচা না বাড়িয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের জন্য গবেষক-শিক্ষার্থীদের দিয়ে আংশিকভাবে অধ্যাপনার কাজ পরিচালনা করার সুপারিশ করা হয়।

৯.৪.১৫ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের মতে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। সেজন্য কমিশনে সুপারিশ হল—

১। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাল ১ বছরের পরিবর্তে ২ বছর করতে হবে।

২। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি হবে অবৈতনিক এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। প্রত্যেকটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন ডেমনস্ট্রেশন বিদ্যালয় থাকবে।

৪। শিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাস এবং অধ্যাপকদের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা থাকবে।

৫। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, কর্মশালার ব্যবস্থা থাকবে।

৬। শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। শিক্ষণ চর্চাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়িত করতে হবে।

৯.৪.১৬ উচ্চশিক্ষাস্তরের শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতি ঃ

উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সদ্যনিযুক্ত অধ্যাপকদের জন্য অরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করে প্রখ্যাত শিক্ষকদের বক্তৃতা শোনার সুযোগ করে দিতে হবে।

৯.৪.১৭ বিদ্যালয় গুচ্ছ ঃ

কমিশন বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়গুচ্ছের সুপারিশ করেন। বিদ্যালয়গুচ্ছ গড়ে উঠবে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তার পার্শ্বস্থ এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক, বুনিয়াদী ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুচ্ছটি যুক্ত থাকবে পর্যায়ক্রমে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। বিদ্যালয় গুচ্ছের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি পঠন পাঠনের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে বলে কমিশন মনে করেন। শিক্ষক সহযোগিতা, শিক্ষা উপকরণের কার্যকরী ব্যবহার, দ্রুত সমস্যা সমাধান ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিদ্যালয়গুচ্ছের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলি পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি করতে পারবে।

৯.৪.১৮ বয়স্ক শিক্ষা ঃ

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি উল্লেখযোগ্য।

১। ৫-১১ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচ বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২। ১১-১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের যারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি বা শিক্ষা সমাপ্তির আগেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছে তাদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩। ১৫-৩০ বছরের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য আংশিক সময়ের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৯.৪.১৯ মূল্যায়ন ঃ

কমিশন বিদ্যালয় শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য বহিঃপরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উন্নতির জন্য বিশেষ কয়েকটি সুপারিশ করেন।

১। প্রাথমিক স্তরে অনুন্নয়ন ও অপচয় রোধের জন্য ১ম ও ২য় শ্রেণিকে একটি একক ধরে পঠন পাঠন চালাতে হবে। প্রয়োজনে ধীর শিক্ষার্থী ও দ্রুত শিক্ষার্থীদের ভাগ করে কাজ চালাতে হবে। ধীরে ধীরে ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে একটি অবিভক্ত স্তর রূপে গণ্য করতে হবে।

২। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা শেষে একটি জাতীয় মান অর্জনের সীমারেখা বেঁধে দেওয়ার পক্ষপাতী তবে বাধ্যতামূলক বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে নয়। শিক্ষার এই মান রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা নেওয়া চলতে পারে।

৩। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মৌখিক পরীক্ষাকে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া নির্ণায়ক অভীক্ষা, সর্বাত্মক বিবরণী পত্র, বৃদ্ধি ও বিকাশের রেকর্ড, আগ্রহের অভীক্ষা ইত্যাদিও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের অঙ্গ হবে।

৪। সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াও বৃত্তি দেবার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বহিঃপরীক্ষার উন্নতিকল্পে প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্ন নির্মাণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ভিতর দিয়ে উন্নত করে তুলতে হবে।

৬। উত্তরপত্রের পরীক্ষা ও নম্বর দান পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরশীল করে তুলতে হবে।

৯.৪.২০ প্রশাসন ঃ

১। কমন স্কুল সিস্টেমে দেশের সকল মানুষ যাতে স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই উন্নতমানের বিদ্যালয়ে অভিভাবকরা শিক্ষার্থী পাঠানোর প্রয়োজন যেন উপলব্ধি করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

২। সরকারি ও বেসরকারি উভয় শ্রেণির শিক্ষকই সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন।

৩। সমান যোগ্যতা ও দায়িত্বসম্পন্ন শিক্ষক একই রকম বেতন পাবেন।

৪। বিদ্যালয় শিক্ষাকে ধীরে ধীরে অবৈতনিক করে তুলতে হবে।

৫। কমিশন জেলা স্কুল বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করেন।

৬। সরকার পরিচালিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত উভয়শ্রেণির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন স্থানীয় প্রতিনিধিযুক্ত কার্যকরী সমিতি।

৭। শিক্ষক বদলীর সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে হবে।

৯.৪.২১ সমালোচনা ঃ

কোঠারী কমিশনই প্রথম প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সবরকম শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সুচিন্তিত সুপারিশ করেছেন। শুধুমাত্র আইন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রটি কমিশনের আলোচনার বাইরে ছিল। শিক্ষার কাঠামো, পাঠ্যক্রম,

মানোন্নয়ণ, পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, বিদ্যালয়গুচ্ছ, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ থাকলেও কোথাও কোথাও দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

ক) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার জন্য অধিকতর বলিষ্ঠ নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল।

খ) ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সূত্র শিক্ষার্থীদের উপর অধিক মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে।

গ) কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠনকালের মধ্যে স্থানীয় কলকারখানা এবং কৃষিখামারে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয়।

ঘ) ডিগ্রী কোর্সকে ৩ ও ৪ বছরের সাধারণ ও অগ্রবর্তী দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার স্নাতকোত্তর কোর্সকে ২ ও ৩ বছরে ভাগ করা হয়েছে। এই বৈষম্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে।

যাই হোক সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৯.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং পরবর্তী অগ্রগতি ঃ

প্রেক্ষাপট ঃ ১৯৬৮ সালে ভারতবর্ষে যে শিক্ষানীতি রচিত হয়েছিল নানা কারণে তার সবগুলি বাস্তবায়িত হয়নি। অভাবনীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রাম-শহর বৈষম্য, মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতীয় শিক্ষানীতির রূপায়ণের প্রধান অন্তরায়। ফলে নতুন করে জাতীয় শিক্ষানীতি গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের শিক্ষার চিত্র ও ভবিষ্যৎ রূপের আভাষ দিয়ে Challenge of Education–A Policy Perspective নামে একটি খসড়া শিক্ষানীতি দেশব্যাপী আলোচনা ও বিতর্কের জন্য প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ এই খসড়া অনুমোদন করার পর ১৯৮৬ সালের মে মাসে বিলটি সংসদের উভয় সভায় অনুমোদিত হয়।

ভারত সরকারের ঘোষিত এই শিক্ষানীতি বারটি অংশে বিভক্ত। প্রথমে মুখবন্ধ ও শেষ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ। বাকী দশটি অধ্যায়ে দেশের শিক্ষার গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ নিয়ে গঠিত।

অনেক উপধারায় সজ্জিত এই শিক্ষা দলিলে বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপিত করে উল্লেখযোগ্য দিকগুলি আলোচনা করা হল।

১। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের প্রতিটি নরনারী শিক্ষার সুযোগ পাবে। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত হবে—১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে পরিবর্তনযোগ্য পাঠ্যক্রম থাকবে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সাংবিধানিক কর্তব্য, জাতীয় ভাবধারার বিকাশ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গণতন্ত্র, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারী পুরুষের সমান অধিকার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের সহায়ক বিষয় থাকবে।

২। সাম্যের জন্য শিক্ষা ঃ শিক্ষায় অসাম্য দূর করতে হবে। এতদিন যারা বঞ্চিত হয়ে এসেছেন তাদের সবাইকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ সুবিধা প্রধান করতে হবে। নারীদের প্রতি বৈষম্য, নিরক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষালাভের বাধা প্রভৃতি অসাম্য দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩। **তফশিলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষা ঃ** গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত করা হবে। চর্মকার, হরিজন পরিবারের ছেলেমেয়েদের ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হবে। তফশিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য জেলা সদরে ছাত্রাবাস নির্মাণ, আদিবাসী অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা, নিজস্ব সংস্কৃতির রক্ষণ প্রভৃতিকে বাস্তবায়িত করা।

৪। **প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ঃ** প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রাবাস তৈরি, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা প্রভৃতি কল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৫। **বয়স্ক শিক্ষা ঃ** ১৪ থেকে ৩৪ বছর বয়স্কদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা আশু কর্তব্য। এজন্য গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, পুস্তক প্রকাশনা, রেডিও, দূরদর্শন ও সিনেমার মত গণমাধ্যমের ব্যবহার প্রভৃতির সুপারিশ করা হয়।

৬। **প্রাথমিক শিক্ষা ঃ** ১৪ বছর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে ভর্তি এবং পাঠ সমাপ্তিকরণ, এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের অনুন্নয়ন ব্যবস্থা বাতিল—এই দুটি বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এজন্য প্রতি বিদ্যালয়ে দুটি শ্রেণি কক্ষ, দুজন শিক্ষক (একজন পুরুষ ও একজন নারী), মসিফলক, চার্ট, মানচিত্র, শিক্ষার অন্যান্য সরঞ্জাম, খেলাধূলার সামগ্রী এসবের ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করা হয়।

৭। **মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** এই স্তরে অতি বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে যেন বিজ্ঞান, মানবীয় বিষয়, সমাজবিজ্ঞান, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক বিষয় পাঠ্যক্রমে সংযোজিত হয়।

৮। **নবোদয় বিদ্যালয় ঃ** প্রতিভাবান শিশুদের জন্য খরচের কথা না ভেবে উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সারা দেশে নির্দিষ্ট আদর্শে নবোদয় নামাঙ্কিত বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে নবোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। এই বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ১২ দশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠন পাঠন চলবে। ৭ম বা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় এবং ৮ম ও ৯ম শ্রেণি শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দি বা ইংরাজি। নবোদয় বিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি শ্রেণিতে দুটি বিভাগ থাকবে। প্রতি বিভাগে ৪০ জনের বেশী শিক্ষার্থী থাকবে না। বিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরিচালনাধীন থাকবে। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে যাওয়ার খরচ, বেশভূষা,খাওয়া, বইপত্র ইত্যাদির সমস্ত খরচ সরকার বহন করবে।

৯। **বৃত্তিমুখী শিক্ষা ঃ** বৃত্তি শিক্ষার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তি শিক্ষার কেন্দ্র খোলা হবে। শিল্প শিক্ষণকেন্দ্রগুলিকে বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। বৃত্তি শিক্ষাকে উৎসাহদানের জন্য সরকার কর্মদান নীতির পুর্নবিবেচনা করবেন।

১০। **উচ্চ শিক্ষা ঃ** নতুন কলেজ না খুলে বর্তমান কলেজগুলিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, স্ব-শাসিত কলেজ স্থাপন, উচ্চ শিক্ষায় গবেষণাকে উৎসাহিত করা প্রভৃতির সুপারিশ করা হয়।

১১। **মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** শিক্ষাকে আরও বেশি জনমুখী করে তোলার জন্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা হয় যে ইতিমধ্যে স্থাপিত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নয়নে সার্বিক প্রযত্ন গ্রহণ করতে হবে।

১২। চাকুরি ডিগ্রীতে বিচ্ছেদ ঃ প্রস্তাব করা হয় কারিগরী, আইন ও চিকিৎসার মতো বিষয় ছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রে ডিগ্রীকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হবে না। চাকুরিদাতারা প্রয়োজন অনুসারে নিজেরাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করবে।

১৩। ভাষা ঃ ভাষার ক্ষেত্রে ১৯৬৮ সালের প্রস্তাবিত নীতিকেই রূপায়িত করা হবে। অর্থাৎ ত্রিভাষা সূত্রই চালু থাকবে।

১৪। বিজ্ঞান শিক্ষা ঃ পাঠ্যক্রম সংগঠন এমনভাবে করতে হবে যা শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়গুলি বাধ্যতামূলক হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবহারিক জ্ঞান সরবরাহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

১৫। মূল্যায়ন ঃ পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রচলনকে স্বীকার করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ ঃ পরীক্ষা হবে নৈর্ব্যক্তিক, মুখস্থ জ্ঞানের প্রতি কম গুরুত্ব, সেমিস্টার প্রথা চালু, নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা চালু, শিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, বহিঃ পরীক্ষার প্রাধান্য কমিয়ে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি।

১৬। শিক্ষক ঃ শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করা, নিয়োগ পদ্ধতি নিরূপণ, প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীরা যাতে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হতে পারেন সেজন্য বেতন ও চাকুরির শর্তকে আকর্ষণীয় করে তোলা, শিক্ষকদের আচরণবিধি প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সুপারিশ করা হয়।

১৭। ভবিষ্যৎ ঃ ভারতীয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে গেছে। সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দিক নির্দেশনা না রেখে জাতীয় শিক্ষানীতিতে শুধুমাত্র মজবুত শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৯.৫.১ সমালোচনা ঃ

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম কেন্দ্রীয় নীতি ঘোষিত হয় ১৯৬৮ সালে, তারপর ১৯৭৯ সালে এবং সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে। কুড়ি বছরের কম সময়ে তিনটি শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু মূল নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য সূচিত হয়নি। সব কয়টি ঘোষিত নীতিই পূর্ববর্তী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

- বিশ্বের সর্বাধিক নিরক্ষর মানুষের বাস এই ভারতবর্ষে। ১৯৮৬-র শিক্ষানীতিতে এই অভিশাপ দূরীকরণের জন্য আর্থিক দায়ভার বহনের কোন স্পষ্ট সুপারিশ করা হয়নি।
- চমকপ্রদ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অবাস্তবধর্মী। এই ধরনের বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে কুলীন ও অকুলীন সম্প্রদায় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কোনভাবেই এ জাতীয় বিদ্যালয় শিক্ষায় গতিবৃদ্ধি করবে না।
- স্বশাসিত কলেজ প্রতিষ্ঠায় যে নিষ্ঠা, সততা, নিরপেক্ষতা ও কঠোর শৃঙ্খলার প্রয়োজন তা সুনিশ্চিত করণের কোন প্রক্রিয়া শিক্ষানীতিতে বিধৃত হয় নি।
- চাকুরি থেকে ডিগ্রীকে বিচ্ছিন্ন করার যে প্রস্তাব শিক্ষানীতিতে ব্যক্ত হয়েছে তা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে এই ধরনের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক চেতনা ও ঐক্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে।

যাই হোক যে কোন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেই ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে। তবুও শিক্ষানীতি প্রণয়নের এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ চিন্তা ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট সাহায্য করবে এ আশা করা যায়।

৯.৬ জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) পরবর্তী অগ্রগতি ঃ

চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন প্রকাশিত হওয়ার পরে দেশ জুড়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (১৯৯২) নামে একটি প্রয়োগসংক্রান্ত দলিল প্রকাশিত হয়। এই দলিলে যে সব কর্ম পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে বিবৃত হল।

৯.৬.১ অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড ঃ

এই পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রচিত হয়। এখানে বলা হয়—

ক) প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকবে দুই কক্ষের পাকা বাড়ি,

খ) দুইজন শিক্ষক (একজন মহিলা শিক্ষিকাসহ)

গ) ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার, ম্যাপ, চার্ট, শিশুদের উপযোগী খেলার সামগ্রী, ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার প্রভৃতি সরঞ্জাম থাকবে।

ঘ) এই কাজের জন্য প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় হবে ১ লক্ষ টাকা।

ঙ) অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডের জন্য ব্যয় ভার রাজ্যসরকারগুলিকে বহন করতে হবে।

২। শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সারা দেশে ৪৮টি অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজে স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়।

৪। সীমিত সংখ্যক বিদ্যালয়ে কম্প্যুটার সরবরাহ করা হয়েছে এবং তিনজন করে শিক্ষককে কম্প্যুটার সাক্ষর করে তোলার কথা ঘোষণা করা হয়।

৫। প্রথামুক্ত শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও বর্তমান কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন সাধন।

৬। দূর শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা চ্যানেল এর মাধ্যমে দূরদর্শনে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলা হয়।

৭। বেশ কয়েকটি গতি নির্ধারক বিদ্যালয় বা নবোদয় স্থাপিত হয়েছে।

৮। উৎকর্ষ কলেজ প্রতিষ্ঠার উপর গুরত্ব আরোপ করা হয়।

কিন্তু এইসব প্রচেষ্টাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক সংকটের কারণে ফলপ্রসু হয়ে উঠতে পারে নি। এছাড়াও পরিকল্পানার মধ্যে শিথিলতার জন্যও অনেক প্রচেষ্টা শুরুতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবুও বলা যায় জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার পরবর্তী পদক্ষেপগুলিকে কিছু ত্রুটি থাকলেও আগামী দিনের শিক্ষা সংস্কারকে এগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে।

৯.৭ প্রশ্নাবলী ঃ

১। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় কী? রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিশেষ সুপারিশগুলি বিবৃত করুন।

৩। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে সব সুপারিশ করেছেন তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরুপণ করুন।

৪। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে মুদালিয়া কমিশনের সুপারিশগুলির যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৫। মুদালিয়া কমিশন প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো আলোচনা করুন।

৬। মুদালিয়া কমিশনে উল্লিখিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাতটি প্রবাহের নাম করুন।

৭। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।

৮। কোঠারী কমিশন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমটি বিবৃত কর। কোন কোন দিক থেকে এই পাঠ্যক্রম মুদালিয়ার কমিশনের প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম থেকে আলাদা?

৯। বিদ্যালয় গুচ্ছ কী ?

১০। বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষায় ভাষা মাধ্যম সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের প্রস্তাবগুলি কী ছিল?

১১। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

১২। অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড বলতে কী বোঝন?

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

- বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ (১৯৫৫), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কলি-৭৩।
- হালদার, গৌর দাস (১৯৯৮), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলি-৯।

একক ১০ ❑ ভারতীয় শিক্ষার কয়েকটি দিক — (ক) নারী শিক্ষা, (খ) বয়স্ক শিক্ষা, (গ) প্রথামুক্ত শিক্ষা, (ঘ) বৃত্তিমুখী শিক্ষা, (ঙ) শিক্ষক শিক্ষা এবং (চ) সকলের জন্য শিক্ষা।

গঠন ঃ

১০.১ নারী শিক্ষা
- ১০.১.১ সূচনা
- ১০.১.২ স্বাধীনোত্তর পর্ব
- ১০.১.৩ পশ্চিমবঙ্গের চিত্র

১০.২ বয়স্ক শিক্ষা
- ১০.২.১ সূচনা
- ১০.২.২ বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
- ১০.২.৩ ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষার প্রচেষ্টা
- ১০.২.৪ পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক/বয়স্ক শিক্ষার প্রসার
- ১০.২.৫ উপসংহার

১০.৩ প্রথামুক্ত শিক্ষা
- ১০.৩.১ প্রথামুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য
- ১০.৩.২ ভারতে প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রসার
- ১০.৩.৩ পশ্চিমবঙ্গে প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রসার
- ১০.৩.৪ উপসংহার

১০.৪ বৃত্তিমুখী শিক্ষা
- ১০.৪.১ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে বৃত্তিশিক্ষা
- ১০.৪.২ স্বাধীনতার পর ভারতে বৃত্তিশিক্ষা
- ১০.৪.৩ বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সমস্যা

১০.৫ শিক্ষক শিক্ষা
- ১০.৫.১ সূচনা
- ১০.৫.২ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে শিক্ষক শিক্ষা
- ১০.৫.৩ স্বাধীন ভারতে শিক্ষক শিক্ষা
- ১০.৫.৪ শিক্ষক শিক্ষার লক্ষ্য
- ১০.৫.৫ শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থা
- ১০.৫.৬ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ১০.৫.৭ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণের সমস্যা
- ১০.৫.৮ উপসংহার

১০.৬ সকলের জন্য শিক্ষা
১০.৬.১ লক্ষ্য
১০.৬.২ ভারতবর্ষে গৃহীত কর্মসূচি
১০.৬.৩ 'সকলের জন্য শিক্ষা' তথা সর্বশিক্ষা অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ
১০.৬.৪ উপসংহার
১০.৭ প্রশ্নাবলী

১০.১ নারী শিক্ষা

১০.১.১ সূচনা ঃ

ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য। নারীদের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের ছিল সামাজিক স্বীকৃতি। বৌদ্ধযুগেও মঠে নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল তবে নারীশিক্ষার তেমন কোন বিস্তার ঘটেনি। ব্রিটিশ ভারতে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল বেশ কয়েকটি বেশ কয়েকটি নারীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এই উদ্যোগে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ।

১০.১.২ স্বাধীনোত্তর পর্ব ঃ

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে যে কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল সেগুলির প্রত্যেকটি কমিশনই নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার সুপারিশ করেন। রাধাকৃষ্ণ কমিশনে নারীরা যাতে শিক্ষাকর্মে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তার ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করেন। মুদালিয়ার কমিশনের মতে ছেলে ও মেয়েদের একইরকম শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করা, মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠ্যসূচিতে সংগীত, কলা ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি একান্ত আবশ্যিক। এসবের ফলে ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার নারীশিক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিটি (ন্যাশনাল কমিটি অন উইমেনস এডুকেশন) নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশের দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে জাতীয় নারীশিক্ষা পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর উইমেনস্ এডুকেশন) গঠন করলেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে স্থাপিত হয় নারীশিক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর উইমেনস্ এডুকেশন। পরবর্তীকালে নারীশিক্ষার জাতীয় পরিষদ ১৯৬১ সালে বালিকাদের পৃথক পাঠ্যক্রমের সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীমতী হংস মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম হল — বালক ও বালিকার সংখ্যাগত পার্থক্য দূর করার জন্য বালিকার শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান, শিক্ষক ও শিক্ষিকা উভয়কেই নিয়োগ করা, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে উভয়ের জন্য একই পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের সামর্থ অনুযায়ী বহুমুখী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, গণিত, বিজ্ঞান ও কারিগরি পাঠে মেয়েদের উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি। কিন্তু এইসব সুপারিশ সত্ত্বেও নারীশিক্ষার তেমন কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি।

আবার গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রতি উদাসীনতার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারকল্পে করলেন জাতীয় নারীশিক্ষা পরিষদ মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম-এর নেতৃত্বে একটি সাব কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ করেন।

১। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ—বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপন, বেসরকারি প্রচেষ্টায় গৃহনির্মাণ, ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের থাকার ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষার প্রবর্তন, নারী শিক্ষার প্রবর্তন, নারী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কুসংস্কার দূরীকরণ, দিবা আহারের ব্যবস্থা, পুস্তক ও পোষাক বিতরণ।

২। বিদ্যালয়ে সম্মেলন, আলোচনা সভা, ছাত্রী সংগ্রহ, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণের ভিতর দিয়ে নারী শিক্ষার জয়যাত্রাকে সফল করে তোলা।

৩। বসতিবহুল অঞ্চলে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি প্রাথমিক, তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি করে মিডল্ স্কুল ও পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৪। শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উপযুক্ত বেতন ও ভাতা প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

৫। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিকাদের ট্রেনিং কলেজ বা বিদ্যালয়ে ভর্তির অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। নারী শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে।

৭। নারী শিক্ষা হবে অবৈজ্ঞানিক ও বাধ্যতামূলক।

১০.১.৩ পশ্চিমবঙ্গের চিত্র ঃ

এই রাজ্যের নারী শিক্ষার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। নারী সমাজের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা ও প্রথাযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান। মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা এবং এককভাবে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। শিক্ষকদের মতো শিক্ষিকারাও চাকুরির সমান সুযোগসুবিধা, বেতন, ভাতা, পেনসন প্রভৃতির সমান সুযোগ পান।

১০.২ বয়স্ক শিক্ষা ঃ

১০.২.১ সূচনা ঃ

বিধিবন্ধ আনুষ্ঠানিক অথবা বিধিযুক্ত যে কোন উপায়ে বিশিষ্ট প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষাকে বয়স্ক শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ যে শিক্ষা বয়স্কদের জীবিকা অর্জন ও জীবন সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে তাকে বলা হয় বয়স্ক শিক্ষা। বয়স্ক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

- বয়স্ক নিরক্ষরদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তার ও শিক্ষাগত মানসিকতা সৃষ্টি করা,
- বয়স্কদের মধ্যে স্বাস্থ্যজ্ঞান সরবরাহ করা,
- বয়স্কদের ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতিগত জীবনে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করা,

- বয়স্কদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য কার্যকরী শিক্ষা দান করা।
- বয়স্কদের জন্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা।

বর্তমানে প্রতিটি ব্যক্তিকে শুধুমাত্র সাক্ষর করে তোলাই নয়, বরং তাদের সামাজিক করে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই অর্থে আধুনিককালে বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলা হয়ে থাকে।

১০.২.২ বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিচার করা যায়—

- রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা—রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্য, দুর্নীতি, অজ্ঞতা, ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থ, কুসংস্কারের হাত থেকে অব্যহতি পেতে হলে জনগণকে সাক্ষর, সচেতন ও কর্মদক্ষ করে তোলা দরকার। তবেই সুস্থ রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব।
- সামাজিক প্রয়োজনীয়তা—স্বাধীনতার পর ভারতে শুরু হয়েছে ক্রমবর্ধমান আধুনিকীকরণ। ফলে বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি যেমন কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, উগ্র প্রাদেশিকতা, অর্থহীন দ্বন্দ্ব প্রভৃতি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সংস্কারের পাশাপাশি সমাজের বৃহত্তর নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর, সচেতন ও কর্মক্ষম করে তোলা।
- অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা—জনশক্তিই হল দেশের মূলধন। এই জনশক্তিরূপী মূলধনকে সচেতন ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হলে জনশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে গতিশীল করা সম্ভব নয়।
- শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা—গণতান্ত্রিক আদর্শগুলিকে (ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয় সংহতি, দারিদ্রদূরীকরণ)শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাক্ষর ও সচেতন বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। এছাড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠী সাক্ষর ও সচেতন হয়ে উঠলে তাদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষায় কোন বাধা সৃষ্টি হবে না। এজন্য বয়স্ক শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়।

১০.২.৩. ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষার প্রচেষ্টা ঃ

স্বাধীনতার পর ১৯৪৮-৪৯ সালে বয়স্ক তথা সমাজশিক্ষার কর্মসূচি ঘোষিত হয়। এই কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি ছিল নিম্নরূপ—

- প্রশাসন—এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরিকল্পনা কমিশন সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় কাজ শুরু করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের কাজ ছিল সমন্বয়, পরিচালন ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা। কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সমাজশিক্ষার স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব শিক্ষাবিভাগ এবং সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের সাহায্যে এই কর্মসূচি রূপায়ণ করবেন। বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

- প্রতিষ্ঠান—যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সেগুলি হল নৈশ বিদ্যালয়, সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্র, নানা ধরনের ক্লাব, মহিলা সমিতি, লাইব্রেরি, পাঠচক্র, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কৃষক সমিতি, গ্রামীণ বেতার, দূরদর্শন, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প ইত্যাদি।
- কার্যাবলী ঃ ক) শিক্ষামূলক কাজ—অক্ষর জ্ঞানের পাঠ, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশন, যৌথ আলোচনা, বিতর্ক, চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি।

  খ) সংস্কৃতিমূলক কাজ—অভিনয়, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, সমবেত ভজন, মেলা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি।

  গ) অবসর বিনোদনমূলক কাজ—গৃহভ্যন্তরীণ ও গৃহবহির্ভূত খেলাধূলা, শিক্ষা, ভ্রমণ ও পারস্পরিক মেলামেশা ইত্যাদি।

  ঘ) হস্তশিল্পমূলক কাজ—সেলাই, চামড়ার কাজ, কাপড় কাটা ও বুনন, রন্ধন, ধোলাই, সাবান, দেশলাই ও মোমবাতি প্রস্তুতি, শোলার ও মাটির কাজ, সৌখিন সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি।

  ঙ) সমাজসেবামূলক কাজ—পৌর কর্ম, জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি, আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কাজ।
- সমাজকর্মীদের শিক্ষণ ঃ সমাজশিক্ষা কর্মীদের যথাযথ শিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রশাসক ও গবেষণারত কর্মীদের জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করতে হয়। পরিদর্শক, গ্রামসেবক, আঞ্চলিক কর্মীদের 'জনতা কলেজে' শিক্ষণ (চার মাসের) গ্রহণ করতে হয়।
- আলোচনা সভা পরিচালনা ঃ সর্বভারতীয়, রাজ্য, জেলা ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমাজশিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা সভা পরিচালনা করা।

বয়স্ক শিক্ষার খাতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে কিন্তু যথাযথ উৎসাহের অভাবে বয়স্ক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম জাতীয় সাক্ষরতা কর্মসূচি। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটি জাতীয় সাক্ষরতা মিশন গঠন করেন। এই কর্মসূচিতে ১৯টি রাজ্যের ৪০টি নির্বাচিত জেলায় সাক্ষরতার অভিযান চালানোর কথা স্থির হয়। এই কাজে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নেওয়া হবে এরূপ স্থির হয়। নির্বাচিত জেলাগুলিতে জনশিক্ষা নিলয় স্থাপন করে ১৫-৩৫ বছর বয়স্ক সব মানুষকে সাক্ষর করে তোলা হবে। প্রতিটি নিলয়ের অধীনে কয়েকটি সাক্ষরতা কেন্দ্র থাকবে।

১০.২.৪ পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক/বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঃ

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা ও ব্লক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সামাজিক শিক্ষাকে সামুদায়িক উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে আনা হয়।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দু হাজারের বেশি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় আছে। পাঁচশতাধিক গণ সাক্ষরতা কেন্দ্র এবং শিক্ষা সহকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য কালিম্পং ও বাণীপুরে দুটি জনতা কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং আরও কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই কাজে যুক্ত আছেন।

১৯৯১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জেলায় জেলায় সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়েছে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আশানুরূপ অগ্রগতি এই রাজ্যে চিহ্নিত হয়েছে।

১০.২.৫ উপসংহার ঃ

১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতি ও তার পরবর্তী দুটি শিক্ষানীতিতে (১৯৭৯ ও ১৯৮৬) বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রশ্নে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাস্তবে কিন্তু তার প্রতিফলন ঘটেনি। তবে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জাতীয় স্তরে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা আগামীদিনে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

১০.৩ প্রথামুক্ত শিক্ষা ঃ

প্রথাগত বা নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় প্রথাযুক্ত শিক্ষা। এই ধরনের শিক্ষার সময়, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, ভর্তির বয়স ও যোগ্যতা, মূল্যায়ন নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো কঠোর বা নির্দিষ্ট নয়।

১০.৩.১ প্রথামুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ

- প্রথাগত শিক্ষালাভে অসমর্থ বা সুযোগ না পাওয়া অথবা পশ্চাদপদ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান।
- উপার্জন করা কালীন শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বিধিমুক্ত শিক্ষার পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, বিদ্যালয় ইত্যাদি চাহিদাভিত্তিক ও নমনীয় হয়ে থাকে।
- শিক্ষার জন্য দিনে বা রাতে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ।
- শিক্ষাগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বয়সের বাধ্যবাধকতা থাকে না।
- এই ধরনের শিক্ষায় উপস্থিতির কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই।
- এই ধরনের শিক্ষা সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে।
- বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত দক্ষ ব্যক্তি, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, বেকার শিক্ষিত, শিক্ষিত গৃহিনী ও তরুণীরা শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।
- ভারতের নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রথামুক্ত শিক্ষার শিক্ষার্থীরা প্রথাগত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষাগুলিতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারে।

১০.৩.২ ভারতে প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রসার ঃ

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) ঘোষণা করে যে ১১ বছর বয়স্ক সব শিশুকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের প্রথামুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা হয় যেসব শিশু বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, যাদের গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই,

যারা কর্মরত এবং যে সব মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না তাদের জন্য সুশৃঙ্খল প্রথামুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ যে প্রথামুক্ত শিক্ষার সুপারিশ করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত হবে—

- ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যারা মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে।
- ৬-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যারা প্রথাগত শিক্ষায় সামিল হতে পারেনি।
- ১০-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যারা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ শেষ করেনি।
- ১৫-২৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি।
- কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত উন্নতি সহায়ক কর্মসূচি।

এককথায় প্রথামুক্ত শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে গড়ে উঠেছে।

১০.৩.৩ পশ্চিমবঙ্গে প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রসার ঃ

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার তিন বছরের। প্রথামুক্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছেন প্রাথমিক স্তরের উপযোগি করে। এই শিক্ষা পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি বর্তমান।

- মানবিক মূল্যবোধ অর্জন।
- ব্যবহারিক সাক্ষরতা অর্জন।
- ব্যবহারিক গণিতে দক্ষতা অর্জন।
- ব্যক্তি স্বাস্থ্য সচেতনতা অর্জন।
- পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন।
- কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।
- উৎপাদনমুখী কাজে আগ্রহ ও যোগ্যতা অর্জন।

এ রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু প্রথামুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গণশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তবে ব্যাপক সাক্ষরতা কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এইসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সবকটি চালু নেই যদিও সাক্ষরতার কর্মসূচি এবং প্রথামুক্ত শিক্ষা পরিকল্পনা এক নয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টির একটি অংশমাত্র।

১০.৩.৪ উপসংহার ঃ

প্রথামুক্ত শিক্ষার বাস্তবায়নে শিথিলতা থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রথামুক্ত শিক্ষা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ যেমন সহজ হবে তেমনি প্রাথমিক শিক্ষাও সর্বজনীনতা লাভ করবে।

১০.৪ বৃত্তিমুখী শিক্ষা ঃ

বৃত্তিশিক্ষা হল এমন এক ধরনের শিক্ষা যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের এমন কতগুলি সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা হয় যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবিকা অর্জন ঠিক মতো করতে পারে। হার্টগ্রোন-এর মতে বৃত্তিশিক্ষা এমন একটি প্রয়োজনীয় বিষয় যার অভাবে শিক্ষার্থীরা সারাজীবন অস্বস্তি ভোগ করে। আসলে বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে। বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা স্বনির্ভর হয়ে উঠলে শিক্ষালাভ তার কাছে প্রয়োজনীয় ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। এর ফলে সে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য দায়িত্ব পালন করার সক্ষমতা অর্জন করে।

শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী কোন বৃত্তির জন্য প্রস্তুত করে তোলার দায়িত্ব অভিভাবক ও বিদ্যালয়কে নিতে হবে।

১০.৪.১ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে বৃত্তিশিক্ষা ঃ

ব্রিটিশ সরকার তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম দিকে এদেশে কোন শিল্পনীতি বা বৃত্তিশিক্ষার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। অবশ্য পরবর্তীকালে তারা রাজত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। রুরকী (১৮৪৭), কলকাতা (১৮৫৭) এবং মাদ্রাজে (১৮৫৮) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমসাময়িককালে কয়েকটি মেডিকেল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন কলিকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫), বোম্বাই গ্রান্ট মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) এবং মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ। ১৮৫৪ সালে উডের ডেস্‌প্যাচে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন মাধ্যমিক স্তরে এ কোর্স (সাধারণ শিক্ষা) এবং বি কোর্স (বৃত্তি বা ব্যবহারিক শিক্ষা) প্রবর্তন করার সুপারিশ করেন। কিন্তু বি কোর্স তখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের যুগে কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রসারের জন্য কলিকাতার যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি মধ্যশিক্ষা স্তর পার হবার পর অধিক সংখ্যক ছাত্রকে শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার সুপারিশ করে বৃত্তিশিক্ষার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে সপ্রু কমিটিও (১৯৩৪) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন যেমন নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পর সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যন্ত্র প্রভৃতি বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করা। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় (১৯৪৫) নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষে কারিগরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০.৪.২ স্বাধীনতার পর ভারতে বৃত্তিশিক্ষা ঃ

স্বাধীনভাবে মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩) এর লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, প্রয়োজনীয় ও জীবনমুখী করা। বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসারে কমিশনের সুপারিশ ছিল ঃ

(১) বৃত্তি শিক্ষার কলেজগুলিতে ১ বছরের প্রাক্‌বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করা।

(২) শিক্ষার্থীদের রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা। স্বতন্ত্রভাবে বা বহুমুখী বিদ্যালয়ের সঙ্গে বহুসংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং কলকারখানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে কারিগরি বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করা।

(৩) শিল্পকেন্দ্রগুলিতে যাতে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করা যায় তার ব্যবস্থা করা।

১৯৬৪-৬৬ সালে কোঠারী কমিশন ও বৃত্তিশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশনের মতে শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব। কমিশন সুপারিশ করেন যে—

(১) বিজ্ঞানকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

(২) কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৩) শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের চাহিদা মেটাতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করে তুলতে হবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার উন্নয়ন ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাই স্বাধীনতা লাভের পর কারিগরি শিক্ষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে তিন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয় — সাধারণ কারিগরি শিক্ষা, ডিপ্লোমা কোর্স এবং ডিগ্রী কোর্স। সাধারণ কারিগরি স্তরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নামে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা। ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানোর জন্য তৈরি হয় পলিটেকনিক বিদ্যালয়। এখানে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং গণিতে উপযুক্ত দক্ষতা। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি বিদ্যালয় — ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল এবং অন্যটি বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। উচ্চকারিগরি শিক্ষার জন্য পরাধীন ভারতে যে কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উচ্চ-কারিগরী শিক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়। যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে সর্বমোট আটটি বিষয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ হয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে এখানে ভর্তি হওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত পঃ বঙ্গেও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় দুর্গাপুর রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। খড়গপুরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পঃবঙ্গ ছাড়া কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং গৌহাটিতে একটি করে আই আই টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছর শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে বি. টেক ডিগ্রী এবং এরপর আরও দু'বছর শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে এম. টেক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এছাড়াও কলকাতায় জাহাজ চালনার শিক্ষার জন্য মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে একটি স্বয়ং শাসিত প্রতিষ্ঠান আছে। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এইসব কারিগরি শিক্ষা ছাড়াও শ্রীরামপুরে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলেজ বহরমপুরে টেক্সটাইল টেকনোলজিক্যাল কলেজ, ট্যাংরায় লেদার টেকনোলজি কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে।

১০.৪.৩ বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার সমস্যা ঃ

কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার দেশব্যাপী প্রসার ঘটলেও কতগুলি সমস্যার সৃষ্টিও হয়েছে।

(১) শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরদের কর্মসংস্থানের অভাব।

(২) কারিগরি শিক্ষায় আশানুরূপ যোগ্য শিক্ষকের অপ্রতুলতা।

(৩) কারিগরি সংস্থাগুলিতে উন্নতমানের পরীক্ষাগার ও কর্মশালার অভাব।

(৪) কারিগরি কর্মীদের গ্রামোন্নয়নের জন্য উপযুক্ত রিফ্রেসার কোর্সের অভাব।

(৫) বিভিন্ন প্রচার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন, পরিচালন ব্যবস্থায় বিস্তর প্রভেদ।

(৬) বিদ্যুতের ঘাটতি, কাঁচামালের অভাব, সরকারি নীতির দুর্বলতা শ্রমিক-মালিক বোঝাপড়ার অভাব ইত্যাদি।

এসব সত্ত্বেও বলা যায় বৃত্তিমুখী ও কারিগরি শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের জন্য অনতিবিলম্বে এই শিক্ষার দোষ ত্রুটি কাটিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের বৃত্তিশিক্ষা ও কর্মনিয়োগ আশানুরূপ গতি লাভ করবে।

১০.৫ শিক্ষক শিক্ষা ঃ

১০.৫.১ সূচনা ঃ

যে কোন আধুনিক পেশার জন্য শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন। শিক্ষকতা একাধারে শিল্প, বিজ্ঞান ও পেশা। সুতরাং ভাবী শিক্ষকদের পাঠদান তত্ত্ব ও পদ্ধতিতে উপযুক্ত করে তোলার জন্য যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকতা বৃত্তির উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা শিক্ষার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

১০.৫.২ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে শিক্ষক শিক্ষা ঃ

১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের সুপারিশ থেকে শিক্ষক শিক্ষা যুগের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। এই কমিশন রিপোর্ট শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদানের ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষণের প্রস্তাব ছিল। এর ফলে ঊনবিংশ শতকের শেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে (মাদ্রাজ, লাহোর, রাজমুন্ডি, জব্বলপুর, এলাহাবাদ এবং কার্শিয়াং) ৬টি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ ও ৫০টি শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা প্রস্তাবে বলা হয়

(১) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য ব্যক্তিরাই হবেন ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের সদস্য।

(২) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের ট্রেনিং কলেজ সাধারণ স্নাতক কলেজের মর্যাদা পাবে।

(৩) স্নাতকদের জন্য ১ বছরের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা কোর্স এবং অবস্নাতকদের জন্য ২ বছরের কোর্স চালু হবে।

(৪) শিক্ষাতত্ত্ব ও ব্যবহারিক টিচিং শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হবে।

এর ফলে নতুন কতগুলি কলেজ স্থাপিত হল। বোম্বাই-এর এস. টি. কলেজ (১৯০৬), কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ (১৯০৮), পাটনা ট্রেনিং কলেজ (১৯০৮), ঢাকা ট্রেনিং কলেজ (১৯১০), জব্বলপুর ট্রেনিং কলেজ (১৯১১)। এরপর স্যাডলার শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিভাগ খোলার সুপারিশ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালে হার্টগ কমিটিও শিক্ষক শিক্ষকের সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১০.৫.৩ স্বাধীন ভারতে শিক্ষক শিক্ষা ঃ

স্বাধীন ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণ কমিশন এবং মুদালিয়ার কমিশন, কোঠারী কমিশন এবং জাতীয় শিক্ষা নীতির (১৯৮৬) সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ভারতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষা পরিচালিত হতে শুরু করে। এগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) **প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষণ কেন্দ্র ঃ** এই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি নানা ধরনের পাঠ্যক্রম (নার্শারি, কিন্ডারগার্টেন, মন্তেসরী, প্রাক্ বুনিয়াদী) অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

(২) **নর্মাল বা প্রাথমিক শিক্ষণ বিদ্যালয় ঃ** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ দানের এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ কেন্দ্র নামে পরিচিত হয়।

(৩) **প্রাক্ স্নাতকদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় ঃ** নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের (যারা স্নাতক নন) জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

(৪) **স্নাতক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ঃ** সাধারণতঃ ১ বছরকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এইসব কলেজে। শিক্ষান্তে শিক্ষকরা বি.টি., বি.এড, এল.টি প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন। শুধু বুনিয়াদী কলেজ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষকরা পি.জি.বি.টি. ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন।

(৫) **বিশেষজ্ঞদের শিক্ষণ বিদ্যালয় ঃ** শিক্ষকদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে (যেমন গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, নন্দন তত্ত্ব, শিল্প ইত্যাদি) শিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৬) **শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় ঃ** শিক্ষিকারা শিক্ষকদের সঙ্গে একই সাথে প্রশিক্ষণ পেতে পারেন। তবুও শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক শিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়।

১০.৫.৪ শিক্ষক শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

(১) আধুনিক শিখন নীতির ভিত্তিতে শিক্ষকদের শিখন সামর্থ্য বিকশিত করা।

(২) শিক্ষণীয় বিষয়গুলির আধুনিকতম জ্ঞান ও শিখন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করা।

(৩) শিক্ষা সম্পর্কীত অনুসন্ধান ও স্বল্পকালীন গবেষণা।

(৪) সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষকের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে তা বুঝতে সাহায্য করা।

(৫) শিক্ষক শুধু যে শ্রেণিকক্ষের নেতা নন বরং একজন পরামর্শদাতা ও পরিচালক তা অনুধাবনে সহায়তা করা।

(৬) সমাজ ও বিদ্যালয়ের যোগসূত্র রক্ষার কারিগর হিসাবে দক্ষ করে তোলা।

(৭) গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

১০.৫.৫ শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থা ঃ

(১) **জাতীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ (এন. সি. আর. টি.) ঃ** ১৯৬১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই পরিষদের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার সর্বস্তরে গবেষণার ব্যবস্থা করা, উন্নত পর্যায়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষাদানের উন্নত পদ্ধতির জ্ঞান বিস্তার, শিক্ষা সম্পর্কীত আলোচনা সভা, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এই পরিষদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি হল জাতীয় শিক্ষা সংস্থা (এন. আই. ই), শিক্ষামূলক কারিগরী কেন্দ্র (সেন্টার ফর এডুকেশনাল টেকনোলজি), চারটি রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন (এন. আই. ই)।

(২) **রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ (এস. সি. ই. আর. টি.) ঃ** জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্যদের আদর্শে বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই পর্ষদ গঠিত হয়। পর্ষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকা, ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক/অধ্যাপিকা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(৩) **শিক্ষার আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় (আর, আই, ই) ঃ** ভারতবর্ষে বিজ্ঞান, কারিগরি, কলা, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৬৫ সালে আজমীর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর এবং মহীশূরে শিক্ষার আঞ্চলিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কলেজগুলি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পেশাদারী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছে। এখানে চার বছরের একীভূত বি.এড কোর্স, দু'বছরের বিজ্ঞান শিক্ষার স্নাতকোত্তর কোর্স ইত্যাদি পরিচালিত হয়।

(৪) **শিক্ষা বিষয়ে উন্নত শিক্ষা কেন্দ্র (সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডি) ঃ** গবেষণা ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

(৫) **শিক্ষক শিক্ষার জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন) ঃ** শিক্ষক শিক্ষণের মানোন্নয়ণের জন্য ভারতীয় পার্লামেন্টের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় স্তরে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রধান কাজ হল নিম্নরূপ ঃ

- সর্বস্তরে শিক্ষক শিক্ষণের মানোন্নয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- সর্বস্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যসূচি, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকের যোগ্যতা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্যের শিক্ষা বিভাগকে পরামর্শদান।
- শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগগুলি পরিদর্শন।
- শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্ধারণ।

- শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতিদানের শর্ত ঠিক করা এবং অনুমোদন প্রদান করা।
- শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত ও সংখ্যাগত উন্নতি বিষয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

(৬) **সম্পূর্ণ শিক্ষা মহাবিদ্যালয় (কম্প্রিহেনসিভ কলেজেস অফ এডুকেশন) ঃ** প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য কোঠারী কমিশন সম্পূর্ণ শিক্ষা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। এই কলেজগুলিতে শিক্ষার কাল বিভিন্ন কোর্সের জন্য এক বছর, দুবছর অথবা চার বছর হয়ে থাকে।

১০.৫.৬ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

স্বাধীনতা লাভের আগে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক শিক্ষার জন্য কয়েকটি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং স্কুল ও বি.টি. কলেজ ছিল। বুনিয়াদী শিক্ষা শুরুর পর বুনিয়াদী শিক্ষকদের জন্য কয়েকটি জুনিয়ার বেসিক কলেজ ও কয়েকটি সিনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। বর্তমানে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজগুলির নাম পরিবর্তিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা (পি.টি.টি.আই) হয়েছে। সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজের বর্তমান অস্তিত্ব নেই। স্বাধীনতার পর বানীপুর ও রহড়ায় স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটায় এই প্রতিষ্ঠাগুলি বি.এড কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এবং এন.সি.টি.ই স্বীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বি.এড ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

১০.৫.৭ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণের সমস্যা ঃ

(১) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঃ বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যেমন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা।

(২) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম বিভিন্নতার জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে বৈষম্য রচিত হচ্ছে।

(৩) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সিংহভাগ পুস্তককেন্দ্রীক, ব্যবহারিক অংশ কম হওয়ায় এই প্রশিক্ষণের প্রয়োগধর্মীতা হ্রাস পেয়েছে।

(৪) সর্বস্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের সময়কালের (মোটামুটি ১০ মাস) পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচী সুদীর্ঘ হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে তা আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়।

(৫) অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় নেই। ফলে শিক্ষণ অভ্যাস সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না।

(৬) ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি।

১০.৫.৮ উপসংহার ঃ

ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক শিক্ষার ত্রুটিগুলি নির্মূল করতে পারলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

১০.৬ সকলের জন্য শিক্ষা ঃ

১০.৬.১ লক্ষ্য ঃ

২০০০ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগাল এর ডাকার শহরে ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরাম 'সকলের জন্য শিক্ষার' একটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি রূপায়ণের পরিকল্পনা রচনা করেন। এই সভায় আন্তর্জাতিক স্তরে সহমতের ভিত্তিতে স্থির হয় আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন। ডাকার সম্মেলনে ছয়টি মূল লক্ষ্যের কথা ঘোষিত হয়।

(১) পৃথিবীর সকল শিশুদের, বিশেষত অবহেলিত শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ প্রাক্ শৈশবকালীন প্রযত্নকে সম্প্রসারিত ও উন্নত করা।

(২) পৃথিবীর সকল শিশুদের, বিশেষতঃ বিভিন্ন স্তরের সামাজিক সংখ্যালঘু মেয়েদের ২০১৫ সালের মধ্যে উন্নতমানের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশ ও শিক্ষা সম্পূর্ণকরণকে সুনিশ্চিত করা।

(৩) যথাযথ শিখন এবং জীবন শৈলী কর্মসূচীর মাধ্যমে সকল যুবসম্প্রদায় ও বয়স্কদের শিখন চাহিদা পূরণকে সুনিশ্চিত করা।

(৪) ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক বিশেষত মহিলাদের সাক্ষরতার স্তরে ৫০ শতাংশ উন্নয়ন সাধন করা এবং বয়স্কদের জন্য প্রবাহমান শিক্ষা ও ভিত্তি শিক্ষায় এদের সামিল করা।

(৫) ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য মেয়েদের উন্নত মানের শিক্ষায় সম্পূর্ণ এবং সমান অধিকার প্রদান করা।

(৬) উন্নত মানের শিক্ষার বিভিন্ন দিক বিশেষত সাক্ষরতা, সংখ্যা গণনা এবং প্রয়োজনীয় জীবন শৈলীতে নির্ধারিত ও পরিমাপযোগ্য শিখন ফলশ্রুতির মাধ্যমে সকলের উৎকর্ষতা অর্জনকে সুনিশ্চিত করা।

১০.৬.২ ভারতবর্ষে গৃহীত কর্মসূচি ঃ

সকলের জন্য শিক্ষার আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে ভারতবর্ষও অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারতবর্ষে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' নামে এক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ভারতবর্ষে সর্বশিক্ষা অভিযানের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি স্থির করা হয়।

(১) ভারতবর্ষের সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়, শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণ কেন্দ্র (এডুকেশন গ্যারান্টী সেন্টার), বিকল্প বিদ্যালয় (অলটারনেটিভ স্কুল), কিম্বা ব্যাক-টু-স্কুল ক্যাম্পে ২০০৩ সালের মধ্যে আনতে হবে।

(২) ২০০৭ সালের মধ্যে সকল শিশুকে পাঁচ বছরের নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে।

(৩) সকল শিশুদের ২০১০ সালের মধ্যে আট বছরের উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষায় জীবনধর্মী শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সন্তোষজনক গুণগত মান অর্জন করা।

(৫) ২০০৭ সালের মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক স্তরে এবং ২০১০ সালের মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সকল লিঙ্গ বৈষম্য ও সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যকে দূরীকরণ।

(৬) ২০১০ সালের মধ্যে সর্বজনীনভাবে সকলকে শিক্ষালয়ে ধরে রাখা।

এক কথায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে সমাজের অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুনিশ্চিতকরণ প্রচেষ্টাকে সর্বশিক্ষা অভিযান বলা যেতে পারে।

১০.৬.৩ 'সকলের জন্য শিক্ষা' তথা সর্বশিক্ষা অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ ঃ

সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রথম যৌথ রিভিউ মিশন-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রিপোর্ট (২০০৫) থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(১) **বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের সংখ্যা কমিয়ে আনা ঃ** এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৬০৪৯টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ১২ লক্ষ শিশুর শিক্ষাগ্রহণের জন্য কাজ করছে। এছাড়া শহরের পিছিয়ে থাকা ও অবহেলিত শিশুদের শিক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে শিশু শিক্ষা প্রকল্প। কলকাতায় ডি পি ই পি-র মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টায় ৩৯৫টি শিশু প্রকল্প কেন্দ্র প্রায় ২৩০০০ শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। এর পাশাপাশি রয়েছে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রায় ৯০৩টি শিক্ষণ কেন্দ্র।

(২) **সামাজিক, লিঙ্গ ও অক্ষমতা বৈষম্য কমিয়ে আনা ঃ** সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে মেয়েদের এবং সামাজিক দিকে অবহেলিত শ্রেণিদের শিক্ষায় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে যেমন সকল মেয়েদের, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিশুদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ একটি প্রধান সহায়তা। দেখা গেছে এর ফলে বার্ষিক ০.১১ শতাংশ মেয়েদের ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য অক্ষমতা অতিক্রম করার জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৩) **শিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়ন ঃ** পশ্চিমবঙ্গে ২০০৪-০৫ সালে ২৫৬৮ জন প্যারা শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে এবং ৮৪০৭ জন প্যারা শিক্ষক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রণীত নতুন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে পরিচিতির জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ১০ দিন করে বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন

বিদ্যালয়ে এন. সি. ই. আর. টি. নির্ধারিত কম্প্রিহেনসিভ অ্যান্ড কনটিনিউয়াস ইভ্যালুয়েশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(৪) **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা সৃষ্টি ঃ** পশ্চিমবঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযানকে কার্যকরী করে তোলার জন্য ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করছে। স্থানীয় প্রতিনিধিদের সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচিতে সামিল করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি জেলার কর্মসূচিকে পরিদর্শন করছেন এবং জেলা প্রকল্প আধিকারিক এবং অন্যান্য পদাধিকারীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছেন। প্রতিটি ব্লকে ব্লক উন্নয়ন আধিকারীক এই কর্মসূচীতে যুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও রাজ্যের কয়েকটি পি.টি.টি.আই-কে D I E T-এ রূপান্তরিত করে প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধীয় গবেষণা, আলোচনা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যে বহু সংখ্যক বেসরকারি সংস্থা সর্বশিক্ষা অভিযানকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১০.৬.৪ উপসংহার ঃ

'সকলের জন্য শিক্ষা' সর্বস্তরের মানুষ তথা রাষ্ট্রের এক নৈতিক দায়। তাই সকলের শুভ ইচ্ছা ও উদ্যোগ এবং সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই মহাযজ্ঞের সুষ্ঠু রূপায়ণ সম্ভব নয়। আশা করা যায় নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ভারতবর্ষে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সূচিত হবে।

১০.৭ প্রশ্নাবলী ঃ

১। স্বাধীন ভারতে নারী শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারাটি আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভক্তবৎসলম কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলি উল্লেখ করুন।

২। নারী শিক্ষার বিকাশে নারী-শিক্ষা জাতীয় পরিষদের কী কী সুপারিশ ছিল?

৩। বয়স্ক শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? বয়স্ক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী?

৪। বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত কর। পশ্চিমবঙ্গে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার কতদূর হয়েছে?

৫। বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন কার্যাবলীর উল্লেখ করুন।

৬। কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের উদাহরণ দিন।

৭। প্রথাযুক্ত শিক্ষা বলতে কী বোঝেন? প্রথাগত শিক্ষা ও প্রথাযুক্ত শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

৮। প্রথাযুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী বিবৃত করুন।

৯। পশ্চিমবঙ্গে প্রথাযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কী?

১০। স্বাধীন ভারতে বৃত্তিমুখী এবং কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১। ভারতবর্ষে বৃত্তিশিক্ষার গুরুত্ব ও সমস্যা সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

১২। ভারতবর্ষে শিক্ষক শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কী? শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করুন।

১৩। শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থাগুলির বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

১৪। এন. সি. টি. ই-র প্রধান কাজগুলি কী? পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক শিক্ষার সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

১৫। 'সকলের জন্য শিক্ষা' বলতে কী বোঝায়? এর উদ্দেশ্যগুলি কী?

১৬। ভারতবর্ষে 'সকলের জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যগুলি বিবৃত করুন। পশ্চিমবঙ্গে এই লক্ষ্য রূপায়ণের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

- হালদার, গৌরদাস (১৯৯৮), ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা - ৯
- Singh, R. P. (1970), Professional Education in Ancient and Mediaeval India, Arya Book Depot.
- Mukherjee, S. N. (1968), Education of Teachers in India
- Popal, B. F (1972), Women's Education in India, S. N. D. T. University
- Kochhar, S. K. (1981), Pivotal Issues in Indian Education.